চন্দন-বহ্নি

শ্রীকালীপদ ঘটক

মিত্র ও ঘোষ
১০ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

—পাঁচ টাকা—

প্রচ্ছদপট :

অঙ্কন—শ্রীঅজিত গুপ্ত

মুদ্রণ—স্ট্যাণ্ডার্ড ফোটো-এনগ্রেভিং কোং

১৩৫৩

মিত্র ও ঘোষ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ হইতে ভানু রায় কর্তৃক প্রকাশিত ও শ্রীঅবনীরঞ্জন রায় কর্তৃক নিউ মহামায়া প্রেস, ৬৫।৭ কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ হইতে মুদ্রিত।

উৎসর্গ

গোপা স্মরণে

"মাটি আর সোনা, সোনা আর মাটি, এক হয়ে গেল মিশে।
সোনার গরবে গরবিনী মাটি, ও সোনা থুইলি কিসে।"

এই লেখকের অন্য গ্রন্থ

অরণ্য-কুহেলী

রহিতে নারিনু ঘরে

এক

খাস ইংরেজ আমলে বিদেশী ফার্মে কাজে ঢুকে জীবনে যাঁরা সগৌরবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন, তাঁদের সংখ্যা একেবারে নগণ্য না হলেও খুব বেশি বলা যায় না। তৎকালীন বিলেত ফেরৎ দেশীসাহেবদের মধ্যে উগ্র পাশ্চাত্য-প্রীতির মূল্যবান খেলাত-স্বরূপ কেউ কেউ হয়ত বিজাতীয় কর্তৃপক্ষের বিশেষ অনুগ্রহ লাভ ক'রে কিছু কিছু সুখসৌভাগ্যের অধিকারী হয়েছিলেন। কিন্তু এতদ্দেশীয় অ-সাহেব পর্যায়ভুক্ত নির্ভেজাল চাটুজ্যে-বাঁড়ুজ্যে-দাশ-চৌধুরী-রায়মহাশয়দের পক্ষে অনুরূপ উচ্চতর পদমর্যাদা বা প্রতিষ্ঠান-গত নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব অর্জনের পন্থাটা কারো কাছেই বিশেষ তেমন সুগম ছিল না। ওরই মধ্যে কেউ কেউ যে এ নিয়মের ব্যতিক্রম একেবারেই ছিলেন না, সে কথাও অবশ্য জোর ক'রে বলা চলে না। ছিলেন কেউ কেউ করিতকর্মা ভাগ্যবান পুরুষ, যাঁরা নিজের অনন্যসুলভ প্রতিভা ও অবিচল কর্মনিষ্ঠার জোরে বিশেষ এবং বিশেষজ্ঞদের মধ্যে সসম্মানে ঠাঁই পেয়েছিলেন। ম্যাক্‌ফারসন কোল কোম্পানীর গৌরাংডি অফিসের জমিদারী ম্যানেজার শ্রীভবেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় সেই ভাগ্যবান কৃতীপুরুষদের একজন। জমিদারী বিভাগের সর্বময় কর্তা তিনি। কোম্পানীর দক্ষিণহস্ত-স্বরূপ। খনি অঞ্চলে বিশেষ একজন নামকরা লোক, সর্বজনশ্রদ্ধেয় ব্যক্তি।

কোম্পানীর প্রকাণ্ড বাংলো। প্রশস্ত ঘরবাড়ী উঠান আঙিনা, মনোরম বাগবাগিচা, বয়, বেয়ারা, দারোয়ান, অভাব কিছু নাই। একজন উচ্চপদস্থ গণ্যমান্য ব্যক্তির বসবাস ও আরাম বিরামের জন্য যত রকম ব্যবস্থাদি থাকা দরকার, তার কোনটারই অভাব নাই এখানে। খোদ বিলিতী কোম্পানীর বন্দোবস্ত কিনা। এর ভিতটা অবশ্য বাংলাদেশের মাটির উপর। বর্ধমান জেলার পরগণে শেড়গড় চাকলের অধীন গৌরাংডি মৌজার অন্তর্ভুক্ত। আর এই বিরাট বাংলোর বর্তমান যিনি অধিবাসী এই দেশেরই জল মাটি আর

আলো হাওয়ায় মানুষ তিনি। মনে-প্রাণে খাঁটি বাঙালী। বাংলা দেশের শিক্ষা ও সংস্কৃতির ধারা পুরোপুরি বজায় রেখেছেন আজো। তাই আজ এই সরকারী খাস কুঠিতে বড় দিনের খানাপিনা বা ইষ্টারের আমোদ প্রমোদের পরিবর্তে লক্ষ্মী ষষ্ঠী কালীপুজোর দিন তিন সন্ধ্যা শাঁখ বাজে। দোল দুর্গোৎসব নববর্ষ উপলক্ষে পূর্ণঘট আর আম্রপল্লব দিয়ে বাড়ী সাজানো হয় নতুন ক'রে। ভবেশবাবু বিদেশী কোম্পানীর চাকুরির সুবাদে সাহেবী বাংলোয় বাস করলে হবে কি, মনে-প্রাণে তিনি এই দেশেরই খাঁটি মানুষ।

সংসারে মাত্র তিনটি প্রাণী। গৃহিণী শশীমুখী দেবী, কন্যা সরযু ও ভবেশবাবু নিজে। অপুত্রক ভবেশ দম্পতীর একমাত্র সন্তান ওই সরযু। বাপ মায়ের অজস্র স্নেহধারায় পুষ্ট হয়ে দেখতে দেখতে এত বড়টি হয়ে উঠলো। বিয়ের বয়স প্রায় হয়ে এলো সরযুর। গৃহিণী শশীমুখী দেবী কর্তা মশায়কে মাঝে মাঝে সে কথা স্মরণ করিয়ে দেন। এবার একটি পাত্র দেখা দরকার, বিয়ে ত এবার দিতেই হবে মেয়ের।

ভবেশবাবু সায় দিয়ে বলে উঠেন,—বেশ ত, পিট-সাহেবকে জানিয়ে দেব, খোঁজ-খবর একটু করুন তাঁরা।

শশীমুখী দেবী হেসে বলেন,—তোমার হলো মেয়ের বিয়ে, আর কাজকর্ম কামাই ক'রে পাত্র খুঁজে বেড়াবেন পিট-সাহেব! তুমি নিজে একটু চেষ্টা ক'রে দেখ না।

ভবেশবাবু হালকা ভাবে মন্তব্য করেন,—কিন্তু পিট-সাহেবের মেয়ের বিয়েও ত হতে পারে একদিন। আমি যে সেদিন কাজ কর্ম কামাই ক'রে তাঁর মেয়ের জন্য পাত্র খুঁজে বেড়াব না, এমন কোন কথা আছে কি?

শশীমুখী দেবী এইখানেই থেমে যান। এই নিশ্চিন্ত নিরুদ্বেগ আত্মভোলা মানুষটিকে দিয়ে সহজে কিছু যে হবার নয়, সে কথা তাঁর ভাল রকমই জানা আছে। কোথায় তিনি মেয়ের বিয়ের প্রসঙ্গ নিয়ে কর্তার সঙ্গে একটু কাজের কথা কইছেন, আর কোত্থেকে হঠাৎ এসে পড়লো পিট-সাহেব; এর কোনো মানে হয়!

মানে অবশ্য এর হয় একটা। শুধু পিট নিয়েই যার কারবার—পিট-সাহেব তাকে বলা যেতে পারে। ভবেশবাবু কথাটা প্রায় চালু ক'রে ফেলেছেন।

গৌরাংডি কলিয়ারির ফার্স্ট ক্লাস ম্যানেজার বনমালী চৌধুরী মশায় ভবেশবাবুর অন্তরঙ্গ বন্ধু। বহু দিনের মেলামেশা। সরযূর বয়স যখন সবে আড়াই বৎসর তখন থেকেই এঁদের আলাপ-পরিচয়ের সূত্রপাত। সে আজ প্রায় বছর-পনের আগের কথা। এক সঙ্গেই এঁরা কাজে ঢুকেছিলেন, এক কোম্পানীর অধীন; বিভাগ দু'টো শুধু আলাদা। রয়ালটি রেভেনিউ, এলটমেণ্ট আর ল্যাণ্ড একুইজিশনের ফাইল নিয়ে ভবেশবাবু রয়ে গেলেন সারফেসে। মাইনিং এক্সপার্ট বনমালী চৌধুরী মশায় সেফটি ল্যাম্প হাতে ঝুলিয়ে ডুলি বেয়ে সিধে একেবারে নেমে গেলেন আণ্ডার গ্রাউণ্ডে। অর্থাৎ ভবেশবাবু কোম্পানীর কেতাদুরস্ত জমিদারী অফিসঘরে হাতের কাছে কলিং বেল নিয়ে চেপে বসলেন। আর প্রথম শ্রেণীর ডিগ্রীধারী খনি-বিশারদ চৌধুরী সাহেব হয়ে এলেন অন্ধকার পাতালপুরীর হর্তা কর্তা বিধাতা, অর্থাৎ কিনা কলিয়ারির ভারপ্রাপ্ত ম্যানেজার। এই দুই বিশিষ্ট পদাধিকারীর নিরবচ্ছিন্ন সাহচর্য বন্ধুত্বের সুড়ঙ্গপথ বেয়ে কখন যে তাঁদের নিবিড়তম আত্মীতার কোঠায় এনে পৌঁছে দিয়ে গেছে, সে কথা আজ আর মনেই নাই কারো। মর্ত্যের সঙ্গে গর্তের অপূর্ব এক রাখী বন্ধন। ভবেশবাবু রসিকতা ক'রে চৌধুরী সাহেবের নাম দিয়েছেন 'পিট-সাহেব'। বিনিময়ে তিনি চৌধুরী সাহেবের কাছ থেকে তকমা পেয়েছেন 'সারফেস'। নাম দু'টো আর নতুন ঠেকে না পরস্পরের কাছে, অভ্যস্থ হয়ে পড়েছেন দু'জনেই।

সারফেস বনাম পিট। এঁদের বিশেষ প্রতিভার পরিচয় পেতে হলে ভবেশবাবুর দাবার আড্ডায় গিয়ে বসতে হয় একটুখানি। বাস্তিকটা এঁদের কারো চেয়ে কারো কম নয়। কাজ কর্মের অবকাশে মাঝে মাঝে এঁরা বসে যান দাবা-বড়ে নিয়ে। সন্ধ্যার দিকে প্রায়ই বসেন। কিন্তু বসেন বললে একটু ভুল করা হয়। আভিধানিক অর্থে যাকে উপবেশন বলা হয় এ বস্তু ঠিক তা নয়। এ যেন ক্ষীর-সমুদ্রে অনন্ত শয়ন। দুই বন্ধু হেঁটমুণ্ডে ধ্যানস্থ হয়ে দাবাবড়ের চালের কথা ভাবছেন ত ভাবছেনই। যে কেউ একজন

মাত হয়ে গেলে সঙ্গে সঙ্গে বুঝি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে খণ্ড একটা প্রলয় ঘটে যাবে। মুখে চোখে ঠিক এমনি একটা দুশ্চিন্তার ভাব। শব্দরূপী ব্রহ্ম এখানে কদাচিৎ প্রকট, প্রায় অনাহত বললেই চলে। মাঝে মাঝে শুধু ছিটে-ফোঁটা এক-আধটু বাক বিনিময়, সেও অতি সংক্ষেপে। চৌধুরী সাহেব দাবায় একটা চাল দিয়ে বলেন,—সারফেস এবার সামলাও। সঙ্গে সঙ্গে ভবেশবাবু ঘোড়া টিপে জবাব দেন,—এই পিটের পিঠে কিস্তি। এই নিয়ে চলতে থাকে রীতিমত স্নায়ুযুদ্ধ।

আজ একটু সকাল সকাল ছক পেতে বসে পড়েছেন দুই বন্ধু। সন্ধ্যার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে। উঠবার আর নাম নাই। মাঝখানে ভবেশবাবুর কন্যা সরযূ এসে বার-দুইয়েক চা দিয়ে গেছে। পানের ডিবে খোলাই আছে টেবিলের উপর। ভৃত্য বাণেশ্বর তাম্রকূট প্রস্তুতির আদেশ প্রতীক্ষায় বারান্দার একপাশে দেওয়াল ঠেস দিয়ে ঢুলছে। রাত্রি ক্রমশঃ বেড়ে চললো। মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের গৃহিণী শশীমুখী দেবী দরজার সামনে এসে ঘোমটা টেনে সাড়া দিলেন,—খেলা কি আজ আর ভাঙ্গবে না তোমাদের, রাত বারোটা বেজে গেল যে।

কারণ-সমুদ্রে তরঙ্গ উঠলো। অনাহত ব্রহ্ম আহত হলেন কিঞ্চিৎ। রাত বারোটা বেজে গেছে কিনা। কিন্তু ও নিয়ে কারো মাথাব্যথা নাই, রাত বারোটা বেজেই থাকে। দুই বন্ধু যে দিন দাবার আড্ডায় জমে যান, সেদিন আর কারো ঘড়ি ঘণ্টার দরকার হয় না; বাজা না বাজা দুই সমান।

খেলা ওঁদের শেষ হয়ে গেছে। গৃহিণীর সঙ্গে মুখোমুখি হতেই ভবেশবাবু উৎসাহিত হয়ে বলে উঠলেন,—দেখেছো—দেখেছো গিন্নী, পিট-সাহেবকে আজ উঠোউঠি তিনটি বাজি মাত।

চৌধুরী সাহেব ডিসপিউট দিলেন,—সারফেসের কথা আপনি বিশ্বাস করবেন না বৌদি, হার জিত আবার হলো কখন। ওকে কি আর মাত করা বলে।

শশীমুখী দেবী একটু মৃদু হেসে বললেন,—আপনাদের হারলেও জিত, আর জিতলেও হার। এর কি আর শেষ মীমাংসা আছে? এখন

উঠুন ত, রাত হয়ে গেছে। আজ আপনাকে এইখানেই খেয়ে যেতে হবে ঠাকুরপো!

চৌধুরী সাহেব একটু ইতস্তত ক'রে বললেন,—সে কি, বাড়ীতে যে বলে আসা হয়নি; আপনার ভগ্নী হয়ত খাবার আগলে রাত জেগে বসে আছেন।

শশীমুখী দেবী বললেন,—রাত জেগে বসে থাকতে তার বয়ে গেছে, এতক্ষণ হয়ত নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্ছে। উঠুন আপনি, আমি সরযুকে ঠাঁই করতে বলে এসেছি।

মোটরের হেডলাইটের তীব্র আলোয় সদর ফটক ঝলকে উঠলো। ইলেকট্রিক ভেঁপুর শব্দ। সোফার এসে সামনে দাঁড়ালো,—মাইজী সেলাম দিয়া।

চৌধুরী সাহেব শশীমুখী দেবীকে লক্ষ্য ক'রে বলে উঠলেন,—দেখলেন—দেখলেন ত আপনার ভগ্নীর কাণ্ডখানা, এখান পর্যন্ত ধাওয়া ক'রে সেলাম দিয়ে তবে ছাড়লেন। গাড়ীখানা পর্যন্ত পাঠিয়ে দিয়েছেন, পাছে আপনার একটু পেট্রোল খরচা হয়ে যায়।

উঠতে হলো চৌধুরী সাহেবকে। বললেন,—কিছু মনে করবেন না বৌদি, আর একদিন এসে আপনার বাড়ী ভূরিভোজনটা সেরে যাব।

চৌধুরী সাহেব তাড়াতাড়ি গিয়ে গাড়ীতে উঠলেন। ভবেশবাবু পাশে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলেন,—আবার কবে আসছো হে, পিটি-সাহেব!

জানলার বাইরে মুখ বাড়িয়ে জবাব দিলেন চৌধুরী সাহেব,—সঠিক কিছু বলা যায় না ভাই, ব্যাপারখানা দেখছো ত। এবার থেকে গিন্নীর কাছে দস্তরমত ঘড়িঘণ্টা ধরে ছুটি নিয়ে আসতে হবে দেখছি। ফিরতে একটু দেরি হলেই উনি আবার অতিমাত্রায় চঞ্চল হয়ে ওঠেন কিনা, আমি যেন কোথায় লোপাট হয়ে গেলাম।

ভবেশ দম্পতি মৃদু একটু হাসলেন।

প্রায় সপ্তাহ দুই গড়িয়ে গেল, চৌধুরী সাহেবের দেখা নাই। এমনটা প্রায় ঘটে না। ভবেশবাবুর দাবাবড়ের আকর্ষণ কাটিয়ে একনাগাড়ে

এতগুলো দিন গরহাজরি, চৌধুরী সাহেবের পক্ষে এটা একটা ব্যতিক্রম। নিজে গিয়ে চাক্ষুষ একটু খোঁজ খবরটা নিয়ে আসা দরকার, ক'দিন থেকেই ভাবছেন ভবেশবাবু। আজ রবিবারের ছুটি, সকাল সকাল তৈরি হলেন বেরুবার জন্য। গৃহিণী শশীমুখী দেবী কর্তামশায়কে একটু সজাগ ক'রে দিয়ে বললেন,—গিয়ে যেন আবার দাবা খেলতে বসে যেয়ো না ঠাকুরপোর সঙ্গে। আজ একটু তাড়াতাড়ি ফিরবে।

ভবেশবাবু বললেন,—ছুটির দিন সকাল থেকে এত তাড়া কিসের, গিন্নী! আজ না হয় একটু দেরিই হলো।

শশীমুখী দেবী জবাব দিলেন,—গ্রহাচার্যকে আজ একবার আসতে বলেছি, সরযূর কোষ্ঠিটা একবার দেখাতে হবে।

—কোষ্ঠি! কোষ্ঠি কেন, পাত্র ত এখনো ঠিক হয়নি।

শশীমুখী দেবী পুনরায় বললেন,—গ্রাহাচার্য মশায়কে দিয়ে আজ একটা ফর্দ করিয়ে নিতে হবে। কিছুদিন থেকে সরযূর শরীরটা বেশ ভাল যাচ্ছে না, ওর জন্যে একটা গ্রহশান্তি দরকার।

ভবেশবাবু চিন্তিত হয়ে উঠলেন,—অসুখ বিসুখ কিছু করলো নাকি! তা আগে আমায় বলনি কেন, ডাক্তারকে একটা খবর দিয়ে দিতাম। না—না—এ ত ভাল কথা নয়, সরযূর অসুখ অথচ—

ব্যস্ত হয়ে উঠলেন ভবেশবাবু। তাড়াতাড়ি একটা ডাক দিলেন,—ওরে ও সরযূ, এদিকে একবার আয় ত, মা!

কাপড়ের উপর রঙিন সুতো দিয়ে সরযূ একটা ফুল তুলছিলো। এমব্রয়-ডারিটা হাতে নিয়েই পাশের ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বললে,—আমায় ডাকছো, বাবা!

ভবেশবাবু বলে উঠলেন,—হাঁ—হাঁ—ডাকছি বৈকি, তোর নাকি অসুখ—আর আমি সে কথা জানতেই পারলাম না। কি অসুখ করেছে রে, মা!

সরযূ একটু অবাক হয়ে গেল, বললে,—অসুখ, আমার আবার কি অসুখ বাবা; আমি ত বেশ ভালই আছি।

শশীমুখী দেবী ঈষৎ তর্জন ক'রে বললেন,—ভাল আছি' বললেই হলো। আজ সর্দি, কাল গলাব্যথা, পরশু মাথাধরা, হামেশাই ত লেগে রয়েছে। কাল রাত্রেও তোমার একটু একটু মাথা ধরেছিলো না, এর মধ্যে ভুলে গেলে!

অতি সাবধানী মায়ের মন সব সময়ই অতিমাত্রায় সজাগ। শশীমুখী দেবীর এই আতিশয্যের ভাবটুকু সরযূর কাছে আজ নতুন নয়। এ বিষয়ে প্রতিবাদ ক'রেও যে কোন লাভ হবে না, সরযূর তা জানাই আছে। তাই মায়ের কথায় সায় দিয়ে তাকে বলতেই হলো যে গতরাত্রে সত্যই তার একটু-খানি মাথা ধরেছিলো। সেটা অবশ্য তক্ষুনি আবার সেরেও গেছে সঙ্গে সঙ্গে।

ভবেশবাবু বলে উঠলেন,—তবে যে এতক্ষণ আমার কাছে লুকোচ্ছিলি, মা। না—না—এ ত ভাল কথা নয়। ডাক্তার চক্রবর্তীকে একটা ফোন ক'রে দিই, দেখে শুনে যাহোক কিছু একটা ব্যবস্থা ক'রে যান তিনি।

বাইরের ঘরে গিয়ে সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তারকে টেলিফোন ক'রে দিয়ে এলেন ভবেশবাবু। ফিরে এসে শশীমুখী দেবীকে লক্ষ্য ক'রে বললেন,—ঘণ্টাখানেক পরেই এসে পড়বেন ডাক্তার। মেয়েটাকে একটু ভাল ক'রে দেখিয়ে নাও। আমি একটু ফিরে আসি ততক্ষণ।

ভবেশবাবু গরদের চাদরখানা কাঁধে ফেলে লাঠি হাতে তৈরি হলেন বেরুবার জন্য। শশীমুখী বললেন,—আর দেখ—আজ বৈশাখী পূর্ণিমা, লক্ষ্মী-পূজোর আয়োজন আছে সন্ধ্যার দিকে। ঠাকুরপোদের নিমন্ত্রণ ক'রে এসো, আজ রাত্রে ওঁরা এইখানেই খেয়ে যাবেন।

ভবেশবাবু সায় দিয়ে বললেন,—নিশ্চয় খেয়ে যাবেন। তুমি সব ব্যবস্থা ক'রে রাখো, আমি আজ ওদের বাড়ীসুদ্ধ ধরে নিয়ে আসছি।

বলতে বলতে বেরিয়ে গেলেন ভবেশবাবু। সরযূ একটু অনুযোগের সুরে বললে,—ডাঃ চক্রবর্তীকে তোমরা মিছেমিছি কেন আসতে বললে, মা! আমি কিন্তু আর ওষুধ-টষুধ খেতে পারবো না, এখন থেকেই বলে রাখছি।

শশীমুখী একটু চোখ তেড়ে বললেন,—ওষুধ যে তোকে খেতেই হবে এমন কোন কথা আছে কি। ডাক্তারবাবু আগে আসুন ত।

সরযূ একটু দুষ্টু হাসি হেসে বললে,—তাহলে একটু তাড়াতাড়ি আসতে বলে দিই, কি জানি যদি ভুলে যান।

বাইরের ঘরে ছুটে গিয়ে সরযূ হঠাৎ টেলিফোনের রিসিভারটা তুলে ধরলে,—টু জিরো ফাইভ প্লিজ। হ্যালো—কে জ্যেঠামশায়! আমি সরযূ কথা বলছি। অসুখ? ন—না—অসুখ আমার তেমন কিছু হয় নি, আমি ভাল আছি জ্যেঠামশায়, কষ্ট ক'রে আপনার না এলেও চলতে পারে।

শশীমুখী পিছু পিছু এসে পড়েছেন। চাপা গলায় মৃদু একটু তর্জন ক'রে বললেন,—আসতে বলে দে—ওঁকে আসতে বলে দে মুখপুড়ী, ডাক্তারবাবু কি মনে করবেন বল্ ত।

শশীমুখীর তাড়া খেয়ে রিসিভারটা আবার কানের কাছে তুলে ধরলে সরযূ,—হ্যালো—জেঠামশায়, আজ কিন্তু আপনাকে আসতে হবে একটিবার। বিকেল বেলা এখানে এসে চা খেয়ে যাবেন। না—না—সে বললে চলবে না, আসতেই হবে; আপনার জন্যে আমি ভেজিটেব্‌ল চপ তৈরি ক'রে রাখবো। কি বললেন—পাঁচটার পর? তাই আসুন। কিন্তু ওষুধপত্র যেন সঙ্গে আনবেন না জ্যেঠামশায়, সত্যিই আমি ভাল আছি।

রিসিভারটা নামিয়ে দিয়ে সরযূ এবার খিল খিল ক'রে হেসে উঠলো। শশীমুখী হন্ হন্ ক'রে বেরিয়ে গেলেন সরযূর সামনে থেকে। ঘরে গিয়ে একটা চৌকির উপর গুম্ হয়ে বসে পড়লেন। সরযূ ছুটতে ছুটতে গিয়ে তাঁর কোলের উপর মাথা রেখে ঝুপ ক'রে শুয়ে পড়লো একপাশে। দু'হাত দিয়ে তাঁকে জড়িয়ে ধরে বলে উঠলো,—মা বুঝি সত্যি সত্যি রাগ করলে!

শশীমুখী একটা ঝঙ্কার দিয়ে বলে উঠলেন,—রাগ করবো না, রাগ করবার কথাই ত! কেন তুই ডাক্তারবাবুকে ওসব কথা বলতে গেলি। ওকি, আবার মুখ টিপে টিপে হাসছিস যে!

মুখ টিপে টিপে হাসা কিন্তু আর চললো না সরযূর। খিল খিল ক'রে এবার হেসে উঠলো।

দুই

শাল পিয়াল আর মহুল বীথি ঘেরা চৌধুরী সাহেবের বাংলো। স্থানটি বড় মনোরম। খনি অঞ্চলে এমন চমৎকার প্রাকৃতিক পরিবেশটি সচরাচর দেখা যায় না। বিস্তীর্ণ শালবনানী ভেদ ক'রে রাঙা মাটির যে পাকা-সড়কটা বরাবর চলে গেছে অজয় নদীর কিনার পর্যন্ত, তার এপাশ ওপাশ দু'প্রাশ নিয়ে কয়েক প্রস্ত কুলি ধাওড়া, কয়লাখনির কুলি মজুরদের সরকারী আস্তানা। চৌধুরী সাহেবের বাংলো থেকে কুলিধাওড়ার মাদল বাদ্য আর ঝুমুর গানের সুর হামেশাই শুনতে পাওয়া যায়। মনে হয় যেন কানের কাছে। সেই সঙ্গে চলতে থাকে আড়বাঁশীর জংলী আলাপ। দূর থেকে বেশ ভালই লাগে। আজ রবিবারের ছুটির দিন, কলিয়ারির কাজকর্ম বন্ধ। সকাল থেকেই আখড়ার প্রস্তুতি চলছে মালকাটাদের ধাওড়ায়। ভেসে আসছে দিং দাহাতাং শব্দ, সাঁওতালী মাদলের চাঁটি। সাঁওতাল মালকাটাই এখানে বেশি। বাউরী বাগ্‌দী ধাঙড় কোঁড়া বিলাসপুরীও আছে কিছু কিছু।

সাপ্তাহিক হাটিয়ার দিন আজ। সকাল থেকেই লোক আমদানি শুরু হয়েছে নানান দিক থেকে। পণ্যবাহী বেপারীর দল কেউ কেউ বা গরুর গাড়ী ক'রে কেউ কেউ বা মাথার উপর ডালা সাজিয়ে সার দিয়ে সব এগিয়ে চলেছে হাটতলার পথ ধ'রে। খনি অঞ্চলের কুলিমজুর বাবুভেয়ে থেকে আরম্ভ ক'রে সর্বশ্রেণীর উপযোগী যাবতীয় দ্রব্যসম্ভার প্রচুর পরিমাণে আমদানি হয় গৌরাংডির হাটে। হাটতলার বাজারে এইদিন শুধু কেনাবেচাই হয় না। কলিয়ারির মালকাটাদের আনন্দের খোরাক হিসাবে কিছু কিছু চুটকি আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা পর্যন্ত করা হয় এই হাটিয়ার দিন।

হাতে একতারা, পায়ে নূপুর আর কোমরে বাঁধা ডুগি। এলোকেশী বাবাজীর বাউল গান চলছে কদমতলায়, হাটতলার একান্তে। সামনে একটি গেরুয়া রঙের গামছা পাতা। শ্রোতাদের মধ্যে অনেকেই দু'এক পয়সা ছুঁড়ে দিয়ে যাচ্ছে, বাবাজীর গাওনা শুনে। গান বাবাজী ভালই গায়। নাচে

গানে রঙে ঢঙে সকাল থেকেই আসর জমিয়ে রেখে দিয়েছে। গৌরাংডির হাটতলায় তার শ্রোতার অভাব হয় না। হাটিয়ার আর একপ্রান্তে মনোহারী-পটির পাশে মদনপুরের মগন ফকির সারেঙ্গী নিয়ে দরবেশী গান গায় বটে, কিন্তু এলোকেশীর মত এমন ভিড় জমাতে পারে না। এলোকেশী বাবাজীর লহরই এক আলাদা।

ন-কড়ি মুদীর চায়ের দোকানের পাশে সকাল থেকেই বিষমঢাকী বাজছে। সেই সঙ্গে মনসার গান। গোটাকয়েক গোখরো সাপ ফণা তুলে দুলছে সাপুড়ের সামনে। ওস্তাদের বৌ সাপে কাটার ওষুধ বেচছে, নামমাত্র মূল্যে। কত রকমের জড়িবুটি গাছগাছড়া একে একে বেরুচ্ছে তার থলে থেকে। কিনছে কেউ কেউ দু' চারটে পয়সা দিয়ে। কেউ কেউ বা ছেলেমেয়েদের ঘুনশিতে বেঁধে নিচ্ছে বেদেবৌয়ের জড়িসুদ্ধ মন্ত্রপূত মাদুলি। সাপে কাটার আর ভয় নাই। বস্তুটি সহজ নয়, মোক্ষম ফলপ্রদ। জরৎকার মুনির বাঘছালের লোম পর্যন্ত নাকি 'পাইল'-করা আছে জড়িবুটির সঙ্গে, বেদেবৌয়ের ওই মন্ত্রপূত মাদুলির মধ্যে। সাপের বাপের সাধ্য কি আর কামড়ায়।

আরও অনেক কিছু ব্যবস্থা আছে হাটিয়ার এই আনন্দ মেলায়। তার মধ্যে বিশেষ একটি হ'লো ভেড়া ঢুঁস বা মেড়ার লড়াই। শুরু হয়ে গেছে তামাসা। হৃষ্টপুষ্ট মজবুত চেহারা, আদ্যন্ত জটাবৃত বপু, পিছনের-দিকে-বাঁকা দু'টো শিং, আর গলায় বাঁধা ঘুঙুরের পেটি। প্রতিপক্ষ দুই মেষরাজ বাজি জয়ের কঠোর সংকল্প নিয়ে জীবন মরণ পণ ক'রে ঢুঁ খেলতে নেমেছেন। দুর্বার বেগে ক্রমাগত ঢুঁ বিনিময় চলছে ত চলছেই। শেষ পর্যন্ত ফাটাফাটি শিং ভাঙ্গাভাঙ্গি ব্যাপার। তবু কিন্তু পিছু হটবে না। চলতে থাকে ঢুঁ-এর পর ঢুঁ। চারদিক থেকে হৈ-হৈ আর হাততালির শব্দ এদের যেন ক্ষেপিয়ে তোলে অমৈষিক এক আসুরিক উন্মাদনায়। খুন চেপে যায় এদের মাথায়, ভাবটা যেন হয়ে উঠে—লড়েঙ্গে, ইয়ে মরেঙ্গে! কে বলে এদের ভেড়া।

মুরগীর লড়াই দেখেছেন? তাও চলছে পাশাপাশি। এ লড়াই কিন্তু পক্ষীসুলভ নখরাঘাত বা চঞ্চ্বাঘাত নয়, রীতিমত সশস্ত্র সংগ্রাম। তালিম করা লড়ুয়ে মুরগীর ঠ্যাং-এ মজবুত ক'রে বেঁধে দেওয়া হয় তীক্ষ্ণ ছুরির ফলা। ইশারা

ক'রে ছেড়ে দেওয়া হয় প্রতিপক্ষ রামপক্ষীর সামনে। চলতে থাকে পাঁয়তারা, ছুরি উঁচিয়ে তাক করতে থাকে পরস্পরকে লক্ষ্য ক'রে। তারপরই লেগে যায় হঠাৎ ঝাপটা-ঝাপটি। ঝটিতি কখন একটার বুকে বসে যায় অপরটার তীক্ষ্ন ছুরির ফলা। আর দেখতে হয় না, আহত রামপক্ষী রক্তাক্ত কলেবরে লটকে পড়ে মাটির উপর; অচিরাৎ সাধনোচিত কুক্কুটধামে প্রস্থান। বিজয়ী প্রতিপক্ষের পালক প্রভু সঙ্গে সঙ্গে কুড়িয়ে নেয় মরা মুরগীটি, ওরই ওটা প্রাপ্য। মদের সঙ্গে চাট ক'রে সাবাড় ক'রে দেয় মদ-দোকানে গিয়ে।

বেচারা গদাই মণ্ডল। কি কুক্ষণেই না হাট করতে বেরিয়েছিলো আজ মনিবের। মাথার উপর দেড় মন বোঝা নিয়ে সারা হাটতলা ক্রমাগত ঘুরপাক খাচ্ছে। কোলকাতী এক দাদাবাবুর পাল্লায় পড়ে গদাইয়ের অবস্থা কাহিল। কোত্থেকে যে হঠাৎ ইনি গদাই মণ্ডলের মনিব বাড়ীতে উড়ে এসে জুড়ে বসলেন, ঈশ্বর জানেন। হাট বাজারের খবরদারির ভারটা দাদাবাবু এসে ইচ্ছে ক'রেই লুফে নিয়েছেন। হাটিয়ায় এসে একবার ঢুকলে সহজে আর বেরুতেই চান না। কোথায় ভেড়া ঢুঁস আর মুরগীর লড়াই—এই ক'রে ক'রেই অর্ধেক বেলা কাবার। মর বেটা তুই গদাই মোড়ল পিছু পিছু তার দেড়মনী ঝাঁকা বয়ে। মাঝে মাঝে তাড়া দেয় গদাই—'দাদাবাবু, এবার চলুন গো।' কে কার কথায় কান দেয়। দাদাবাবু হঠাৎ ভিড়ে যান গিয়ে মেড়ার লড়াইয়ে। এন্তার হাততালি দিতে থাকেন আর পাঁচ জনের দেখাদেখি। অধিকন্তু মুখের মধ্যে দু'টো আঙ্গুল পুরে এমন এক লক্কড়ি কায়দায় সিটি মারতে থাকেন, যা একমাত্র ওই কোলকাতী দাদাবাবু ছাড়া আর কারো পক্ষে অসম্ভব।

হাট-বাজারের টুকরিটা মাথা থেকে নামিয়ে গদাই মণ্ডল হতাশ হয়ে বসে পড়ে একটা গাছতলায়। দাদাবাবু ফিরে এসে বলে উঠেন,—চুপচাপ হঠাৎ বসে পড়লি যে গদাই, চল্ চল্ এবার বাড়ী ফিরতে হবে।

সবিনয়ে নিবেদন করে গদাই মণ্ডল,—আজ্ঞে আমি ত পা তুলেই আছি, আপনার একটু দয়া হলেই হয়।

বাজার করা শেষ হয়ে গেছে, মাছটা শুধু কিনতে বাকি। সবুজ রঙের ঝকঝকে একটা র‍্যালে সাইকেল দু' হাত দিয়ে ঠেলতে ঠেলতে দাদাবাবু এগিয়ে চললেন মেছোপটির দিকে। টুকরি মাথায় পিছু পিছু তার পা চালিয়ে দিলে গদাই।

দাদাবাবু লোকটি কিন্তু বেশ শৌখিন। পরণে তার ধোপদস্ত ফরাসডাঙ্গা ধুতি, গায়ে গিলেকরা আদ্দির পাঞ্জাবী, পায়ে একজোড়া কিড লেদারের নিউকাট। চোখে একটা সোনালী রঙের চশমাও আছে। বয়স তার গোটা পঁচিশের মধ্যেই। চেহারাটি খুব চমৎকার, ফিটফাট কেতাদুরস্ত। দেখলেই মনে হয়—হ্যাঁ, এ একটা বাবু বটে, কোলকাতী বাবু যাকে বলতে হয়।

কিন্তু কে এই কোলকাতী বাবুটি, খাদমুলুকে নবাগত এই ভদ্র সন্তান? এর আগে ত এ অঞ্চলে এঁকে দেখা যায় নি।

চৌধুরী সাহেবের বাংলোর প্রশস্ত বারান্দায় দুই বন্ধু আরাম ক'রে বসে গল্পে গুজবে জমে উঠেছেন। পিট এবং সারফেস মুখোমুখী হলেই ওঁদের মজলিসটিও সঙ্গে সঙ্গে মুখর হয়ে উঠে। কথায় কথায় বহু কথাই এসে পড়লো। শ্রমিক মালিক বিরোধ, মাগ্‌গী ভাতা, ছুটি ছাঁটাই থেকে আরম্ভ ক'রে সাম্প্রতিক ট্রেড ইউনিয়ন মুভমেণ্ট, কন্‌সিলিয়েশন এওয়ার্ড, এবং আসন্ন ট্রিবিউনালের রোয়েদাদ পর্যন্ত বহু কিছুই আলোচনা হয়ে গেল সকাল থেকে বসে বসে। ভবেশবাবু বহুক্ষণ থেকেই উঠি উঠি করছেন। চৌধুরী সাহেব গড়গড়ার নলটা আর এক দফা এগিয়ে দিয়ে বললেন,—আরে বসো—বসো, ছুটির দিনে এত তাড়া কিসের? আর এক কাপ চা ত অন্তত খেয়ে যাও। ওরে ও গদাই, গদাই!

অন্দর থেকে চৌধুরী সাহেবের নাবালক পুত্র মণ্টু এসে খবর দিলে,—গদাই দা বাড়ী নেই, হাটিয়ায় গেছে।

চৌধুরী সাহেব বললেন,—রামধনীকে চা দিতে বল।

মণ্টু আবার পর্দা ঠেলে অন্দরের দিকে পা বাড়াতেই দূর থেকে তার নাম ধরে কে সাড়া দিয়ে উঠলো,—হ্যালো মণ্টু সাহেব, গেটটা একটু খোল ত ভাই।

মণ্টু গিয়ে তাড়াতাড়ি ফটকটা খুলে দিতেই সাইকেল ঠেলে ঢুকলো এসে কোলকাতী সেই ছোকরাটি, গদাই মণ্ডলের দাদাবাবু। সাইকেলের হ্যাণ্ডেলে ঝোলানো সের চারেক একটা রুই মাছ। মাছটা দেখেই শ্রীমান মণ্টু আনন্দে একেবারে লাফিয়ে উঠলো, বললে,—আরে বাপ্স, কোত্থেকে এটা পেলে ব্যোমকেশ দা!

ব্যোমকেশ বললে,—খাবি খাচ্ছে, একেবারে জ্যান্ত। নিয়ে চল বাড়ীর মধ্যে।

মণ্টুর ছোট বোন নীলিমাও এসে জুটে গেল সঙ্গে সঙ্গে। দুই ভাইবোনে রুই মাছটা ধরাধরি ক'রে হাতে ঝুলিয়ে হুল্লোড় করতে করতে ঢুকলো গিয়ে বাড়ীর মধ্যে। ব্যোমকেশ বারান্দার একপাশে সাইকেলটা দাঁড় করিয়ে দিয়ে পর্দা ঠেলে অন্দরে ঢুকলো।

ভবেশবাবু খোশ গল্পের মোড় ফিরিয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন,—কে এই ছেলেটি, তোমার কেউ আত্মীয় স্বজন নাকি?

চৌধুরী সাহেব জবাব দিলেন,—আমার নিজের কোন আত্মীয় নয়, আমার এক সহপাঠী বন্ধুর ভাইপো। কাজকর্মের ধান্দায় ঘুরতে ঘুরতে এসে পড়েছে আর কি।

—সহপাঠী বন্ধুর ভাইপো! কোথায় বাড়ী ছেলেটির, কি নাম?

—বাড়ী এই পশ্চিমবঙ্গেই, ভাটপাড়া। নামটি হচ্ছে শ্রীমান্ ব্যোমকেশ বন্দ্যোপাধ্যায়। ওর কাকা কুমারীশ বাঁড়ুজ্যের সঙ্গে কলকাতায় আমার আলাপ। এক হোস্টেলে একই রুমে থেকে এক কলেজেই পড়েছিলাম আমরা বি-এস-সি পর্যন্ত। কুমারীশ এখন কৃষ্ণনগরের উকিল, প্র্যাকটিশ খুব ভাল শুনেছি।

গদাই মণ্ডল হাটবাজার নিয়ে বাড়ী ঢুকলো। রামধনী এসে চা দিয়ে গেল আর এক দফা। ভবেশবাবু পিয়ালায় চুমুক দিতে দিতে পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন,—ছেলেটির আত্মীয় স্বজন কে আছেন বাড়ীতে?

চৌধুরী সাহেব জবাব দিলেন,—সে সৌভাগ্যের কথা আর বলো না। তিনকুলে প্রায় কা কস্ত পরিবেদনা। আছে বলতে একমাত্র ওই জ্ঞাতি

খুড়ো কুমারীশ, আর সামান্য কিছু পৈত্রিক বিষয়-সম্পত্তি। সেও এমন কিছু বাহুল্য না।

. ভবেশবাবু পুনরায় প্রশ্ন করলেন,—বাপ মা কি দু-ই মারা গেছেন ?

—হ্যাঁ—বহুদিন আগেই। তাই লেখা পড়াও এমন কিছু হলো না, বার দুই তিন ম্যাট্রিকুলেশন ফেল ক'রে বসে আছে বাড়ীতে। ভবঘুরের মত টো টো ক'রে ঘুরে বেড়াচ্ছিলো। কুমারীশ তাই দীর্ঘ একখানা পত্র লিখে আমার এখানে ডেসপ্যাচ ক'রে দিয়েছে। যাহোক কিছুতে লাগিয়ে দাও। কিন্তু মুশকিল হয়েছে কি জান, কুমারীশের মত অন্তরঙ্গ বন্ধু, তার হলো কিনা ভাইপো। তাকে কি আর একেবারে যাহোক কিছুতে লাগিয়ে দেওয়া যায় ? স্টোরেই ওকে ভর্তি করে দিতে হবে কোন রকমে। রায়বাবুর এসিস্ট্যাণ্ট হয়ে এখন ঢুকে পড়ুক ত।

ভবেশবাবু সায় দিয়ে বললেন,—খুব ভাল, প্রস্পেকটিভ ইয়ং চ্যাপ, একটু ব্যাকিং পেলেই দাঁড়িয়ে যেতে পারে।

বারান্দার একপাশে ব্যোমকেশকে দেখা গেল আর একটিবার। চৌধুরী সাহেব একটা ডাক দিয়ে বললেন,—এদিকে এসো, প্রণাম কর জ্যেঠামশায়কে।

ব্যোমকেশ এগিয়ে এসে ভবেশবাবুকে প্রণাম ক'রে দাঁড়ালো একপাশে। ছেলেটির বিনয়-নম্র ভাব দেখে খুশী হলেন ভবেশবাবু। কুশল প্রশ্নাদি বিনিময়ের পর জিজ্ঞাসা করলেন,—আমাদের এই কয়লাখনির দেশ কেমন লাগছে ?

ব্যোমকেশ সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলো,—খুব ভাল লাগছে জ্যেঠামশায়, চমৎকার। সেইজন্যই ত কাকাবাবুকে বলছি, শিগ্গীর একটা কাজকর্ম জুটিয়ে দিন কিছু, থেকে যাই এই কলিয়ারির দেশে।

ভবেশবাবু বললেন,- সে আর এমন বেশি কথা কি, সে ব্যবস্থা ত হচ্ছেই।

চৌধুরী সাহেব বললেন,— ভিতর থেকে দুটো পান পাঠিয়ে দিতে বল ত।

পর্দা ঠেলে অন্দরে ঢুকলো ব্যোমকেশ।

ভবেশবাবু এতক্ষণ ধরে নিরীক্ষণ করে দেখছিলেন ভাটপাড়ার কুমারীশবাবুর নবাগত ভ্রাতুষ্পুত্রটিকে। ব্যোমকেশ অন্তর্হিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভবেশবাবু বলে উঠলেন,—ছেলেটি ত বেশ হে, কথাবার্তায় বেশ চটপটে দেখছি।

চৌধুরী সাহেব মন্তব্য করলেন,—সে গুণ যথেষ্ট, আলাপ পরিচয় করতে ওস্তাদ। এই ক'দিনের মধ্যেই বাড়ীর লোকের সঙ্গে এমন জমিয়ে নিয়েছে যে কে বলবে বাইরের ছেলে। দেখতেই ত পাচ্ছো।

ভবেশবাবু খুশী হয়ে বললেন,—এ একটা গুণ, বাইরের লোকের সঙ্গে এই খোলা মেলা ভাবটি আজকাল তুমি বড় বেশি দেখতে পাবে না। আমার কি মনে হচ্ছে জানো!

চৌধুরী সাহেব তাকালেন একবার ভবেশবাবুর দিকে। ভবেশবাবু একটু চাপা কণ্ঠে বললেন,—এই ছেলেটিকে জামাই ক'রে নিলে কেমন হয়!

চৌধুরীসাহেব একটু বিস্মিত হয়ে বললেন,—জামাই, কিন্তু মেয়ের যে আমার বয়স মোটে সাত।

হো হো ক'রে এবার হেসে উঠলেন ভবেশবাবু, বললেন,—সে কি, এত বড় একটা ভুল ক'রে ফেললে হে পিট-সাহেব! তোমার ওই সপ্তমীর চাঁদের উপর আর একটি যে জলজ্যান্ত সপ্তদশী ঝুলছে, সে কথাটা একেবারে বেমালুম ভুলে গেলে!

চৌধুরী সাহেব কথাটা একটু সামলে নিয়ে বললেন,—আরে তাই বলো, মা সরযূর কথা বলছো। তা ছেলেটি অবশ্য মন্দ নয়, দেখতে শুনতে ভালই, বংশটাও বনিয়াদী। কিন্তু বিদ্যে কোথায়, একটা পাশ টাশ পর্যন্ত করতে পারলে না যে।

ভবেশবাবু জবাব দিলেন,—সেটা অবশ্য একটা কথা বটে। কিন্তু বি-এ এম-এ পাশ করলেই বা হতো কি, তাকে ত আমি নিজের ক'রে ধরে রাখতে পারতাম না। আমি চাই এমন একটা ছেলে যার হাতে আমার সব কিছু তুলে দিয়ে নিশ্চিন্তে আমি রিটায়ার করতে পারি। শুধু আমার কর্মক্ষেত্র থেকেই নয়, আমার সংসার থেকেও। আমার সে সংকল্পের কথা ত তুমি জান। তোমার ওই বন্ধুবরের যদি আপত্তি না থাকে, দেখ না একখানা চিঠি লিখে।

চৌধুরী সাহেব একটু ভেবে বললেন,—সেদিক থেকে কিছু আটকাবে বলে আমার মনে হয় না। কিন্তু সত্যই কি তুমি এটা মনস্থ করছো!

—তোমরা যদি সকলে সেটা সমর্থন কর, আমি ত কোন আপত্তির কারণ দেখি না। অবশ্য সরযুর মায়ের সঙ্গে এ বিষয়ে একটু পরামর্শ দরকার হবে, তিনি কি বলেন আগে দেখা যাক।

দেওয়াল-ঘড়িতে ঢং ঢং ক'রে এগারটা বাজলো। চেয়ার ছেড়ে তাড়াতাড়ি উঠে পড়লেন ভবেশবাবু, বললেন,—বেলা হলো, আমি এখন উঠলাম। তাহলে ওই কথা রইলো, সন্ধ্যার সময় আসছো।

চৌধুরী সাহেব সায় দিয়ে বললেন,—নিশ্চয়।

ভবেশবাবু যেতে যেতে থমকে একটু দাঁড়িয়ে পুনরায় ফিরে এসে বললেন,—আর দেখ, ব্যোমকেশ বাবাজীকেও ধরে নিয়ে যেতে ভুলো না যেন। তোমার বৌদি একবার ছেলেটিকে নিজের চোখে দেখুন ত। তারপর সব এক জায়গায় বসে বোঝাপড়া হবে এখন।

চৌধুরী সাহেব পুনরায় বলে উঠলেন,—নিশ্চয়।

তিন

কর্তামশায়ের কাছ থেকে নতুন এই খবরটুকু শোনা অবধি শশীমুখী দেবী উন্মুখ হয়ে আছেন, ছেলেটিকে একবার চাক্ষুষ দেখবার জন্য। সন্ধ্যার সময় চৌধুরীসাহেব সপরিবারে আসছেন শশীমুখীর নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে। তাই রান্নাবান্নারও বিশেষ একটু আয়োজন করা হয়েছে। চৌধুরী সাহেবের গৃহিণী সুরমাদেবীর সঙ্গেও একটু আলাপ-আলোচনার দরকার ছিলো শশীমুখীর। ভালই হলো, ওঁরা সব একসঙ্গেই আসছেন। ছেলেটি যদি সকলের পছন্দ হয়, তাহলে আর আপত্তি কি। মেয়ের বয়স বাড়ছে, যেখানেই হোক বিয়ে ত এবার দিতেই হবে।

বিকেল থেকেই শশীমুখী দেবী তাড়া দিচ্ছেন সরযূকে, ভাল ক'রে চুল বেঁধে শাড়ীখানা পাল্‌টে তৈরি হওয়ার জন্য। তার কাকীমারা আজ আসছেন কি না, একটু ছিমছাম হয়ে তৈরি থাকা দরকার। সরযূর কিন্তু কিছুমাত্র তাড়া নাই। কাকীমারা আসছেন ত আসছেন, মাঝে মাঝে ত এসেই থাকেন; তার জন্য বিশেষ কোন সাজগোজ করবার দরকার হয় না। এমনিতেই ওঁরা স্বচ্ছন্দে আসতে পারেন, সরযূ তাঁদের অভ্যর্থনা করবার জন্য কখন থেকে তৈরি হয়ে আছে।

রান্নাঘরের রকে বসে পাচকঠাকুরের সঙ্গে তরকারি কুটছিলো সরযূ। শশীমুখী দেবী জোর করে তাকে উঠিয়ে স্নানের ঘরে পাঠিয়ে দিলেন।

পুরোহিত মশায় লক্ষ্মীপূজায় বসেছেন। শশীমুখী দেবী পাচকঠাকুরকে রান্নার ফিরিস্তিগুলো আর এক দফা বাতলে দিয়ে পূজার ঘরে গিয়ে ঢুকলেন। সমাপ্ত হ'লো পূজা অনুষ্ঠান। পুরোহিতমশায় শান্তি পাঠ শেষ ক'রে আর একটিবার শঙ্খধ্বনি করলেন।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। সদর ফটকে চৌধুরী সাহেবের গাড়ীর আওয়াজ। ভবেশবাবু উঠানের একান্তে টেবিল ল্যাম্পের সামনে বসে সংবাদপত্র পাঠ করছিলেন। শশীমুখী দেবী কর্তামশায়কে তাড়া দিয়ে বললেন,—ওঁরা এসে পড়েছেন, যাও—যাও—এগিয়ে নিয়ে এসো।

ভবেশবাবু চৌধুরী সাহেব ও তাঁর পরিবারবর্গকে সঙ্গে নিয়ে ঢুকলেন এসে অন্দরে। উঠান থেকেই সাড়া দিলেন চৌধুরী সাহেব,—এসে পড়েছি বৌদি, আজ আর আমি একা নয়, বাড়ীসুদ্ধ বয়ে নিয়ে এসেছি।

শশীমুখী দেবী একটু প্রসন্ন হাসি হেসে বললেন,—আসবেন বৈকি ঠাকুরপো, আপনারা মাঝে মাঝে না এলে আমরা থাকবো কি নিয়ে।

চৌধুরী সাহেবের স্ত্রী সুরমাকে তিনি অভ্যর্থনা ক'রে বললেন,—এসো ভাই, কতদিন আজ দেখা হয়নি বল ত।

সরযূ এসে সুরমা দেবীর পায়ের ধূলো নিয়ে বললে,—ভাল আছেন কাকীমা?

সুরমা দেবী সস্নেহে বললেন,—হাঁ মা, ভালই আছি।

মণ্টু ও নীলিমা শশীমুখী দেবীকে প্রণাম ক'রে দাঁড়ালো একপাশে। চৌধুরী সাহেব ব্যোমকেশকে শশীমুখী দেবীর সামনে এগিয়ে দিয়ে বললেন,—প্রণাম কর।

ব্যোমকেশ তাড়াতাড়ি বলে উঠলো,—ও—ইনিই বুঝি জেঠাইমা!

পদস্পর্শ ক'রে শশীমুখী দেবীকে প্রণাম করলে ব্যোমকেশ। পাশে সরযুকে লক্ষ্য ক'রে বললে,—আর ইনি?

শশীমুখী দেবী মৃদু একটু হেসে বললেন,—আমার মেয়ে, সরযু।

ব্যোমকেশ যেন একটু খুশী হয়ে উঠলো, বললে,—সরযু, বাঃ—নামটি ত বেশ।

শশীমুখী দেবী ও সুরমা দেবী একান্তে একটু মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলেন। মুখ টিপে একটু হেসেই ফেললেন সুরমা দেবী। সরযু একটু লজ্জা পেলো কিনা কে জানে। শশীমুখী বললেন,—তোমরা সব দাঁড়িয়ে রইলে কেন বাবা, বসো।

খোলা বারান্দায় আগে থেকেই ফরাশ পাতা ছিলো। আর সকলের সঙ্গে সুরমাদেবীও একপাশে আসন গ্রহণ করলেন। ভবেশবাবু ও চৌধুরী সাহেব পাশের বারান্দায় গিয়ে বসে পড়েছেন চেয়ার টেবিলে। খোশ-গল্প শুরু হয়ে গেছে তাঁদের। শশীমুখী দেবী সুরমাকে লক্ষ্য ক'রে বললেন,—লক্ষ্মী পুজোর প্রসাদ একটু নিয়ে আসি। তারপর সব একসঙ্গে বসে গল্প-স্বল্প করা যাবে, কেমন?

সরযু কুঁজো থেকে জল গড়িয়ে দিয়ে গেল। শশীমুখী রেকাব সাজিয়ে প্রসাদী ফল মিষ্টান্ন পরিবেশন করতে লাগলেন। মণ্টু ও নীলু পরমানন্দে শুরু ক'রে দিলে প্রসাদ ভক্ষণ। গোটাচারেক লিচু একসঙ্গে মুখের মধ্যে পুরে মণ্টু হঠাৎ বলে উঠলো,—ব্যোমকেশ দা'র একটা ডিশে হবে না জেঠাই-মা, আরো কতকগুলো দিন ওঁকে, উনি অসম্ভব খেতে পারেন।

ব্যোমকেশ সঙ্গে সঙ্গে আপত্তি জানিয়ে বললে,—বাজে কথা জেঠাইমা, মণ্টু সাহেবের কথা আপনি শুনবেন না।

শশীমুখী হাসতে হাসতে ব্যোমকেশের থালায় আরও কয়েকটা ফল মিষ্টি পরিবেশন ক'রে বললেন,—বেশ ত, আর দুটো খাওনা বাবা, এ ত খুব আনন্দের কথা।

ব্যোমকেশ রেকাবের উপর হাত আড়াল দিয়ে বললে, ব্যস্—ব্যস্ আর দেবেন না, সত্যিই আর আমি খেতে পারবো না।

মণ্টু সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলো,—কাল রাত্রে গুণে গুণে ছত্রিশখানা লুচি সাবাড় ক'রে দিলে, আর এই ক'টা খাবার তুমি খেতে পার না! এমন মিছে কথা ব'লো না ব্যোমকেশ দা!

মণ্টুর কথা শুনে সকলেই এবার হো হো করে হেসে উঠলো। ব্যোমকেশ প্রতিবাদ জানিয়ে বললে,—ছত্রিশখানা কে বললে তোমাকে, খেয়েছি ত মোটে ছাব্বিশখানা।

মণ্টু চোখ দুটো একটু বিস্ফারিত ক'রে বললে,—আরে বাপ্স্—তাই বুঝি খুব কম হলো, শুনছেন জেঠাইমা!

সুরমা মণ্টুকে মৃদু একটা ধমক দিয়ে বললেন,—চুপচাপ খেয়ে যা না, এত বক্‌বক্ করছিস কেন।

ব্যোমকেশ একটু হেসে বললে,—মণ্টু সাহেবকে আর দুটো লিচু দিন জেঠাইমা, লিচু খেতে ও ওস্তাদ।

এবার কিন্তু মণ্টু কোন প্রতিবাদ করলে না। লিচু খেতে সে সত্যিই খুব ভালবাসে।

প্রসাদপর্ব শেষ ক'রে পানের ডিবে আর জরদার কৌটা নিয়ে সুরমা দেবীর পাশে এসে বসলেন শশীমুখী। কথাবার্তা শুরু হলো তাঁদের। মণ্টু ও নীলু নূতন কয়েকটা ছড়া শিখেছে। সরযূদিকে তাই আবৃত্তি ক'রে শোনাতে আরম্ভ করলে। পাশের বারান্দা থেকে ভবেশবাবু একটা হাঁক দিয়ে বললেন, —আমাদের একবার তামাক দে রে, ও বাণেশ্বর!

মণ্টু হঠাৎ ছড়া শেষ ক'রে বলে উঠলো,—জানেন জেঠাইমা, ব্যোমকেশ-দা খুব ভাল গান গাইতে পারেন, শুনবেন? একটা গাও না ব্যোমকেশ-দা!

ব্যোমকেশ বললে,—আমার গান কি এঁদের কাছে শোনাবার মত, বাজে বকুছো কেন মণ্টু সাহেব!

মণ্টু বললে,— গান ত তুমি রোজই গাও, মিথ্যে বলছি!

আর সকলকে শুনিয়ে আবার বলে উঠলো মণ্টু,—ব্যোমকেশ দা এখন চৌতাল প্র্যাকটিশ করছেন, চৌতাল। আমাদের রোজ শোনান, না রে নীলু!

শশীমুখী একটু খুশীই হলেন, বললেন,—বেশ ত, দু' একখানা গাও না বাবা!

ব্যোমকেশের মনটা হঠাৎ তাইতো তাইতো ক'রে উঠলো। গাইবে না কি দু' একখানা? মজলিশটা ত ভালই জমেছে।

শশীমুখী পুনরায় বললেন,—হারমোনিয়মটা বের ক'রে দেবে?

ব্যোমকেশ একটু সঙ্কোচ কাটিয়ে বললে,—আছে নাকি!

শশীমুখী পরিচারিকা মানদাকে আদেশ করলেন সরযূর হারমোনিয়মটা বের ক'রে দিতে। সরযূ এতক্ষণ একপাশে দাঁড়িয়েই ছিলো। ব্যোমকেশ তাকে লক্ষ্য ক'রে বলে উঠলো—আপনি ওখানে দাঁড়িয়ে রইলেন কেন, এখানে এসে বসুন।

শশীমুখী একটু অনুযোগের স্বরে বললেন,—ওকে আবার আপনি কেন বাবা! ও যে সরযূ, আমার মেয়ে, তোমার চেয়ে বয়সে অনেক ছোট।

ব্যোমকেশ হঠাৎ প্রশ্ন করে বসলো,—বয়স কত হলো জেঠাইমা, বছর ষোল হবে?

হঠাৎ কি মনে ক'রে ওইখানেই থেমে গেল ব্যোমকেশ। সরযূ কিছু মনে করলে নাকি!

সুরমা দেবী সরযূকে কাছে ডেকে বললেন,—বোস্ মা, বোস্. দাঁড়িয়ে রইলি কেন।

সরযূ চুপচাপ বসে পড়ল কাকীমার একপাশে। মানদা হারমোনিয়মটা এনে নামিয়ে দিলে ব্যোমকেশের সামনে। ব্যোমকেশকে গাইতেই হলো। সা-রে-গা-মায় টিপ দিতে দিতে বললে,—তাইত কি গানই বা শোনাই, সবই তো প্রায় পুরানো হয়ে গেছে। নতুন দেখেই গাই একটা।

শেষ পর্যন্ত ব্যোমকেশ সুর ধরলে:—

"কখন তুমি আসবে আমার বাটে,
আমি আছি গো পথ চেয়ে।
তরী তোমার লাগবে আমার ঘাটে,
তুফান ঠেলে আসবে উজান বেয়ে॥

আসবে তুমি কালবোশেখীর মত
ঝড়ের বুকে মেঘের পাখা মিলে,
আসবে চরণ চিহ্ন এঁকে এঁকে
উর্মিমুখর নীলসাগরের নীলে।
শেষ লগনে চির মোহন বেশে
দুয়ারে মোর থামবে তুমি এসে,
আমার সকল হিয়া উঠবে বেজে
তোমারি গান গেয়ে ॥"

পাশের বারান্দায় ভবেশবাবু চৌধুরী সাহেবকে লক্ষ্য করে বললেন,—গলা খানি ত বেশ চমৎকার, ভালই গায় দেখছি।

চৌধুরী সাহেব সায় দিয়ে বললেন,—গান বাজনায় অসম্ভব ঝোঁক ভোর চারটেয় উঠে গলা সাধতে আরম্ভ করে।

শুনে হয়ত একটু খুশীই হলেন ভবেশবাবু। মন্তব্য করলেন,—সে ত খুব ভাল কথা। কথায় বলে 'ন বিদ্যা সঙ্গীতোপরি,' এও ত একটা বিদ্যে। এখন ওঠো দেখি, এই অবসরে আমাদেরও দু' এক বাজি হয়ে যাক।

দাবার আড্ডায় ত একবার বসতেই হবে। চৌধুরী সাহেব উন্মুখ হয়েই ছিলেন। বাইরের ঘরে গিয়ে ছক পেতে বসে গেলেন।

ব্যোমকেশের গান তখনও চলেছে—
"তোমার ছোঁয়া পাব বলে
উতল আজি শ্যামল ধরা,
নিদ্ হারালো রাতের পাখী—
স্বপন দেখে সন্ধ্যা তারা।
আঁধার ভাঙ্গা আলোর সাথে
কে আসে ওই ফুল ফোটাতে,
প্রভাত খানি সোনার রঙে
রাঙিয়ে দিলো অসীম ছেয়ে ॥"

শশীমুখী অবাক হয়ে শুনছেন। গান বেশ ভালই গায় ছেলেটি। গান শেষ হতেই খুশী হয়ে বললেন,—খুব চমৎকার। মাঝে মাঝে আমাদের শুনিয়ে যেয়ো বাবা, খুব ভাল লাগলো তোমার গান শুনে।

স্বরমা দেবী সরযূকে এবার আদেশ করলেন, তুই একটা গা ত মা!

সরযূ কাকীমার দিকে করুণ একটা দৃষ্টি মেলে একটু মাথা নেড়ে বললে,—আমার গলাটা আজ বেশ ভাল নেই, কাকীমা।

ও পাশ থেকে মানদা ঝি এবার চাঁচা গলায় বলে উঠলো,—তাই একটা গাও না দিদিমণি, গাও না একটা নতুন দাদাবাবুকে শুনিয়ে।

মণ্টু ও নীলু পর্যন্ত বায়না ধরে বসলো, এবার সরযূদির গান না শুনে তারা কিছুতেই ছাড়বে না। শশীমুখী বললেন,—গা মা, একটা গা।

সরযূর আর পালাবার পথ রইলো না। ব্যোমকেশ হারমোনিয়ামটা ঠেলে দিলে সামনের দিকে। সরযূ মুখ নীচু করে গাইতে আরম্ভ করলে :—

"আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার
চরণ ধূলার তলে —"

খুশী হওয়ার পালা এবার ব্যোমকেশের। সরযূর গান শুনে সে শুধু খুশীই হলো না, বেশ যেন একটু উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠলো। গান ত সরযূ মন্দ গায় না, আর একটু খানি শিখিয়ে পড়িয়ে নিতে পারলেই—

নিজের মনেই হঠাৎ যেন একটা হোঁচট খেলে ব্যোমকেশ। সে আবার কি কথা, শিখিয়ে পড়িয়ে নেবার কি সে মালিক!

বাইরে চলছে দাবা-যুদ্ধ। এদিকে চলছে গানের মজলিশ। দুটোই বেশ জমে উঠেছে।

আধুনিকের পর শ্যামা-সঙ্গীত এবং তার পর একখানা কীর্তন গেয়ে শেষ করলে ব্যোমকেশ।

মণ্টু এবং নীলু এখনো বাকি, ব্যোমকেশের নতুন সাকরেদ। মণ্টুকে লক্ষ্য ক'রে এবার বলে উঠলো ব্যোমকেশ,—তোমরা একটা গাও দেখি এবার মণ্টু সাহেব। কাল যেটা শিখেছ—ধরো দেখি বেশ জোর গলায়।

মণ্টু আর নীলু বেশ একটু উৎসাহিত হয়ে উঠলো। এক সঙ্গে এতগুলোকে গান শোনাবার সুযোগ তারা পায় কোথায়। বাজনায় টিপ দিতে লাগলো ব্যোমকেশ, দুই ভাইবোনে পরমানন্দে সুরু করলে :—

"হাট্টিমাটিম টিম, তারা মাঠে পাড়ে ডিম,
তাদের খাঁড়ায় দুটো সিং, তারা হাট্টিমাটিম টিম।"

মাথার উপর পূর্ণিমার চাঁদ হাসছে। কচি কণ্ঠের কাকলি দিয়ে শেষ হলো এই গানের মজলিশ। মনোরম একটি আনন্দঘন পারিবারিক পরিবেশের মধ্যে বেশ আনন্দেই কেটে গেল কিছুক্ষণ।

পাচক ঠাকুর এসে সংবাদ দিলেন রাত্রের আহার প্রস্তুত। শশীমুখী দেবী উঠলেন ঠাঁই করবার ব্যবস্থা করতে। সরযূ ও সুরমা রান্নাঘরের দিকে গিয়ে দাঁড়ালেন।

আহারাদির পর চৌধুরী সাহেবের সঙ্গে ভবেশবাবুর আর একদফা আলোচনা সুরু হয়েছে সরযূর বিবাহের প্রসঙ্গ নিয়ে। শশীমুখী পানের রেকাব নিয়ে সামনে এসে দাঁড়াতেই ভবেশবাবু প্রশ্ন করলেন,—ছেলে তোমাদের পছন্দ ?

শশীমুখী উত্তর দিলেন,—ছেলে ত বেশ ভালই, অপছন্দের কারণ ত কিছু দেখি না। আপনি একটু চেষ্টা করে দেখুন ঠাকুরপো, হঠাৎ যেন আবার হাত-ছাড়া হয়ে না যায়।

চৌধুরী সাহেব একটু হেসে বললেন,—হাত-ছাড়া হওয়ার ভয় অবশ্য করি না, আমি শুধু আপনাদের কথা ভাবছি, বেশ ভাল ক'রে একটু ভেবে নিন।

ভবেশবাবু এ কথার জবাব দিয়ে বললেন,—ভাবছিই ত, দরকার হয় আরো ভাববো। কিন্তু এ বিষয়ে কুমারীশবাবুর মনোভাবটা একটু জেনে নিতে ক্ষতি কি ? চিঠি একখানা লিখে দাও, জবাবটা কি আসে আগে দেখ।

সুরমা এসে শশীমুখী দেবীকে লক্ষ্য ক'রে বললেন,—এবার তাহলে আমাদের যেতে হয় দিদি, ছেলেমেয়েগুলো আবার ঘুমিয়ে পড়বে।

শশীমুখী ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন সুরমার সঙ্গে। বললেন,—আবার কবে আসছো, শিগ্‌গীর আবার দেখা হবে ত ?

সুরমা জবাব দিলেন,—হবে বৈকি দিদি, নিশ্চয়ই হবে। সরযূর বিয়েটা যদি এর মধ্যে পাকাপাকি হয়ে যায়, তাহলে ত আর কথাই নাই। আসতেই হবে।

শশীমুখী দেবী একমুখ হেসে বললেন,—তোমার কর্তাকে ত সেই কথাই বলছিলাম ভাই। হলে বেশ ভালই হয়, আমাদের আর বাইরে কোথাও খোঁজাখুঁজি করতে হয় না।

মণ্টু আর নীলু জুতো মোজা পরছে বাড়ী যাওয়ার জন্য। একান্তে হঠাৎ ব্যোমকেশের সঙ্গে আর একটিবার সরযূর দেখা হয়ে গেল। বিদায় নেবার সময় হয়েছে। ব্যোমকেশ সরযূকে লক্ষ্য করে বললে,—আপনার গান শুনে খুব খুশী হলাম। অসুন না একদিন আমাদের ওখানে, আর এক আসর বসা যাবে। আসবেন ?

সরযূ কোন জবাব দিলে না। ব্যোমেকেশ নিজেই আবার বলে উঠলো,—আবার কবে দেখা হচ্ছে বলুন ত ?

সরযূ একটু নির্লিপ্ত ভাবেই জবাব দিলে,—সে কথা আমি কেমন ক'রে বলবো বলুন, আপনিই জানেন।

সুরটা বেশ ভাল ঠেকলো না ব্যোমকেশের কাছে। কেমন যেন একটা হোঁচট খেলে ব্যোমকেশ। সরযূর এ জবাবটুকুর মধ্যে না আছে এক ফোঁটা মধু, না একটা কিছু। আশ্চর্য ! এতগুলো গান ব্যোমকেশ না শোনালেও পারতো।

চৌধুরী সাহেব এগিয়ে এসে সুরমা দেবীকে লক্ষ্য ক'রে বললেন,—কৈ গো—আর দেরি কেন, এবার এসো।

সুরমা দেবী আর সকলকে নিয়ে চৌধুরী সাহেবের পিছু পিছু গিয়ে গাড়ীতে উঠলেন। রাত তখন অনেক হয়ে গেছে।

ভাটপাড়ার কুমারীশ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বন্ধুবর বনমালী চৌধুরীর, পত্রখানা পেয়ে প্রথমটা ভাবতেই পারেন নি কি জন্য তাঁকে এত অনুরোধ

ক'রে সত্বর সেখানে আহ্বান করা হয়েছে। বহুদিন পর তিনিই প্রথম পত্র লিখেছিলেন বনমালীবাবুকে, ব্যোমকেশের একটা কাজকর্মের ব্যবস্থা ক'রে দেবার জন্য। সে ব্যবস্থা ইতিমধ্যে করা হয়েছে। উপরন্তু আর কিছু করা যায় কিনা সে বিষয়ে তিনি কুমারীশবাবুর সঙ্গে একটু পরামর্শ করতে চান। চাকরি তার একটা জুটে গেছে, ব্যোমকেশের মত ছেলের পক্ষে আপাতত এইটুকুই যথেষ্ট। এক্ষেত্রে বনমালীবাবু যথেষ্ট মূল্য দিয়েছেন তাঁর পুরাতন বন্ধুত্বের, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কুমারীশবাবুকে তিনি সম্মানিত করেছেন শ্রীমান ব্যোমকেশকে ঠিক আত্মীয়স্বজনের মতই সাদরে গ্রহণ ক'রে। এটা তাঁর শুধু বন্ধু-প্রীতির নিদর্শন নয়, যথেষ্ট তাঁর উদারতার পরিচয়। এখন শ্রীমান যদি কোন রকমে চাকরিটা বজায় রেখে কুমারীশবাবুর একটু মুখ রক্ষা ক'রে চলবার চেষ্টা করে—তাহলেই যথেষ্ট। কিন্তু বনমালীবাবু এতখানি অনুরোধ ক'রে কুমারীশবাবুকে যখন যেতে লিখেছেন, যাওয়া একবার অবশ্যই কর্তব্য। কিছুমাত্র আর কালক্ষেপ না ক'রে গৌরাংডি রওনা হবার জন্য প্রস্তুত হলেন কুমারীশবাবু। এই ফুরসতে বন্ধুবরের সঙ্গে দেখা সাক্ষাতটা একবার সেরে আসাই দরকার।

ব্যোমকেশ সম্প্রতি স্টোর বাবুর এসিস্ট্যাণ্ট হয়ে কোম্পানীর কাজে ঢুকেছে। ডিউটি তার সকাল সাতটা থেকে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত। মাঝখানে স্নান-আহারের জন্য ঘণ্টা দুয়েক ছুটি। সিটি বাজবার সঙ্গে সঙ্গে নিজের আসনখানি অধিকার করে অফিসে গিয়ে বসে পড়ে ব্যোমকেশ। যেমন ক'রে হোক কাজকর্মগুলো একটু তাড়াতাড়ি শিখে ফেলতে হবে ব্যোমকেশকে, ভবিষ্যতে উন্নতির আশা আছে যথেষ্ট। চাকরিটা নেহাত মন্দ না, ভালই লাগছে ব্যোমকেশের। এ এক নতুন জগত, নতুন জীবন, বিচিত্র এক নতুনতর অভিজ্ঞতা। ব্যোমকেশের কাছে এ যেন একটা নতুন আকর্ষণ। এ সব ছেড়ে ব্যোমকেশ আর যাবে কোথায়। কোম্পানী থেকে নেহাত বরখাস্ত করা না হলে এখান থেকে আর একটি পাও নড়ছে না ব্যোমকেশ। ভালই আছে সে।

বহুদিন পর দুই বন্ধুর দেখা সাক্ষাৎ। ছাত্রজীবনের সেই আনন্দময় দিনগুলি আবার যেন মূর্ত হয়ে ভেসে উঠলো চোখের সামনে। খ্যাতনামা এ্যাডভোকেট শ্রীকুমারীশ বন্দোপাধ্যায় আর মাইনিং ইঞ্জিনিয়ার মিঃ বনমালী চৌধুরী, ওরফে চৌধুরী সাহেব, হঠাৎ যেন কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেলেন মামলাদারী শামলা আর ম্যানেজারী হ্যাট-নেকটাই ফেলে। মুখোমুখি যেন পরস্পরের সামনে এসে দাঁড়ালো কলেজের দুই তরুণ ছাত্র। গৌরাংডি কলিয়ারির সরকারী বাংলো অতীতের কোন্ সোনার কাঠির ছোঁয়ায় নিমেষে যেন রূপান্তরিত হয়ে গেল নামকরা এক কলেজ হোস্টেলের রুম নম্বর সাতে, যেখানে তারা পাশাপাশি চৌকি পেতে ক্রমাগত চারটি বছর ধরে উচ্ছল জীবনের সেই স্বপ্নময় দিনগুলি একসঙ্গে কাটিয়ে এসেছে। সারাটা রাত দুই বন্ধুর ঘুম হলো না। স্মৃতির ভাণ্ডারে সেদিনের সেই ছাত্রজীবনের যত কথা জমা হয়ে ছিল, একে একে যেন ভীড় করে দাঁড়ালো এসে রূপকথার মায়া নিয়ে। কোথায় যে তার আদি, আর কোথায় যে তার শেষ—তার হিসাব নিকাশ একটি রাতের সীমার বুঝি বাইরে। কথার ভীড়ে দুই বন্ধু যেন হারিয়ে গেছেন অতীত দিনের স্বপ্ন ঘেরা বিচিত্র এক আব্ছা আলো-অন্ধকারের দেশে। দূরের একটা বয়লারে জোর শব্দে সিটি বাজতেই বনমালী বাবু সজাগ হয়ে বলে উঠলেন,—রাত আর বেশী নেই, এবার একটু ঘুমিয়ে নাও।

কুমারীশবাবু পাশ বালিশটা টেনে ধীরে ধীরে চোখ বুজলেন।

সকাল বেলা চায়ের টেবিলে বসে কাজের কথা আরম্ভ হলো দুই বন্ধুর মধ্যে। ভবেশ বাবুর কন্যা শ্রীমতী সরযূর সঙ্গে ব্যোমকেশের বিবাহের প্রসঙ্গ নিয়ে আলাপ আলোচনা করবার জন্যই যে কুমারীশবাবুকে বিশেষ ভাবে আহ্বান করা হয়েছে, সে কথা তিনি ক্রমশ উপলব্ধি করলেন। বনমালীবাবু সবিস্তারে জানালেন কন্যাপক্ষের ইচ্ছা ও আগ্রহের কথা। ভবেশবাবু নিজে এসে কুমারীশবাবুকে সাদর আহ্বান জানিয়ে গেলেন কন্যা চাক্ষুষ করবার জন্য।

ব্যাপারটা সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত। কুমারীশবাবু এর জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। ব্যোমকেশকে একখানা পরিচয় পত্র লিখে দিয়েই এদিকের কর্তব্য শেষ

করে ফেলেছিলেন। বনমালীবাবুর আন্তরিক সদিচ্ছায় ভদ্রস্থ একটা চাকরিও জুটে গেছে তার। অতঃপর জ্ঞাতি খুড়া কুমারীশবাবুর দিক থেকে এর অধিক আর ভাববার কিছু ছিলো না। কিন্তু নতুন ক'রে আর একটু তাঁকে না ভাবিয়ে ছাড়লেন না এঁরা। ব্যোমকেশকে সংসারের খোঁটায় শক্ত করে বেঁধে দিয়ে যাওয়ার ভারটাও হঠাৎ পড়লো এসে তাঁরই উপর। কুমারীশবাবু এটা ভাবতেই পারেন নি। প্রস্তাবটা অবশ্য ভালই, ব্যোমকেশের ছন্নছাড়া জীবনের পক্ষে এটা খুব প্রয়োজন ছিলো।

কন্যা চাক্ষুষ ক'রে যারপর নাই খুশী হলেন কুমারীশবাবু। রূপে গুণে অনিন্দ্য, বলবার কিছু নাই। ব্যোমকেশকে গড়ে পিটে মানুষ করে তুলবার জন্য একজন শুভাকাঙ্ক্ষী অভিভাবকের প্রয়োজন ছিলো। ভবেশবাবু নিজে থেকে অগ্রণী হয়ে তার সে অভাবটুকু পূর্ণ করতে প্রস্তুত হয়েছেন, ব্যোমকেশের পক্ষে এটা কম সৌভাগ্যের কথা নয়। কুমারীশবাবুকে তাই শেষ পর্যন্ত এ বিষয়ে সহযোগিতা করতেই হলো। মত দিলেন তিনি। অবশ্য ব্যোমকেশের সঙ্গেও তার বিবাহের প্রসঙ্গ নিয়ে খোলাখুলি একটা আলোচনা ক'রে নিলেন কুমারীশবাবু। তার সম্মতি অসম্মতির প্রশ্নও এক্ষেত্রে একটা বড় প্রশ্ন। অবশ্য ব্যোমকেশের সম্মতি পেতে বিশেষ কোন বেগ পেতে হলো না, এর জন্য সে আগে থেকেই প্রস্তুত ছিলো। খুড়োমশায়ের সম্মান না রেখে সে পারে!

আষাঢ় মাসের প্রথম দিকে দিন স্থির করে কুমারীশবাবু বিদায় হয়ে গেলেন। সপ্তাহ দুই পরে পুনরায় তিনি ফিরে এলেন সপরিবারে। বনমালী বাবুর বাড়ী থেকে বরানুগমনের ব্যবস্থাটা আগে থেকেই স্থির হয়েছিল। নির্দিষ্ট শুভদিনে সরযূর সঙ্গে ব্যোমকেশের শুভবিবাহ সম্পন্ন হয়ে গেল যথোচিত সমারোহের সঙ্গে। কুমারীশবাবুর স্ত্রী কঙ্কন দিয়ে বধূবরণ করলেন। নববধূর শুভাগমনে বনমালী বাবুর বাসগৃহ বিয়েবাড়ীর কল-আনন্দে মুখর হয়ে উঠলো। ফুলশয্যা ও প্রীতিভোজের হৈ-হল্লোড়ে কেটে গেল তার পরের দিনটাও। তার পর দিন বরবধূ বিদেয় হয়ে গেল জোড়ে। ভবেশবাবু সস্ত্রীক কন্যা-জামাতাকে বরণ করে নিলেন পরম সমাদরে। নূতন করে যেন গৃহপ্রবেশ হলো

ব্যোমকেশের। অতি একঘেয়ে পুরাতন পৃথিবীর রূপটাই যেন বদলে গেল ব্যোমকেশের চোখে। মনে তার এক নতুন রঙের ছোঁয়াচ লাগলো।

কুমারীশবাবুর বেশ কয়েকটা দিন দেরি হয়ে গেল। এবার তাঁর বাড়ী না ফিরে উপায় নাই। নব-সম্পর্কিত বৈবাহিক মহাশয় ও তাঁর আত্মীয় স্বজনের আদর আপ্যায়ন ও হৃদ্যতার যে গভীর স্পর্শ টুকু অনুভব করে গেলেন তিনি গত কয়েক দিন ধরে, সহজে তা ভুলবার নয়। সপরিবারে বিদায় নেবার সময় সেটা যেন আরো গভীর ভাবে উপলব্ধি করলেন। বৈবাহিক ভবেশ বাবুর প্রশান্ত দৃষ্টিখানি ঈষৎ যেন ব্যথাকাতর। বৈবাহিকা শশীমুখী দেবীর চোখ দু'টি ছল্ ছল্ করছে। ব্যোমকেশ ও সরযূ খুড়া মহাশয় ও খুড়ীমার পায়ের ধুলো নিয়ে একপাশে দাঁড়ালো। কুমারীশবাবু তাদের আন্তরিক আশীর্বাদ ও শুভেচ্ছা জানিয়ে ব্যোমকেশকে উদ্দেশ করে বললেন, ঈশ্বরের আশীর্বাদে, যাঁদের অপরিমেয় স্নেহ ভালবাসা লাভ ক'রে আজ তুমি ধন্য হয়েছ, তোমাকে নিজের সন্তানের মত গ্রহণ করে যারা আজ তোমার বাপ-মার অভাব পূর্ণ করলেন, তাঁদের সে অন্তরের মহিমাটুকু কোনদিন যেন তোমার দ্বারা তিলমাত্র ক্ষুণ্ন না হয়—এইটুকু শুধু তোমার কাছে আমার অনুরোধ রইলো ব্যোমকেশ। এঁরা তোমার আপন জন, একথা যেন কোনদিন ভুলে যেয়ো না।

ব্যোমকেশ নীরব। ঈষৎ মাথা নুইয়ে সম্মতি জানালে তাঁর আন্তরিক শুভেচ্ছার। কুমারীশবাবু নববধূ সরযূর দিকে চেয়ে ব্যোমকেশকে লক্ষ্য করে পুনরায় বলে উঠলেন,—আমার এই মা-টিকে ভুলেও যেন কোনদিন এতটুকু অবহেলা করো না। এই তোমার জীবন-লক্ষ্মী। আমাদেরই বংশের মহিমান্বিতা কুলবধূ।

কুমারিশবাবুর স্ত্রী সরযূর চিবুক স্পর্শ করে সস্নেহে বললেন,—এবার আমরা আসি বৌমা, কি খুশীই যে হলাম তোমাকে পেয়ে। আমাদের সেখানেও যে একটি বার তোমায় যেতে হবে, মা! নিতে আমি লোক পাঠাব, যেয়ো কিন্তু।

সরযূ ঈষৎ অবগুণ্ঠন সরিয়ে মৃদুস্বরে বললে,—নিশ্চয় যাব, আপনাদের কথা আমি কোনদিন ভুলবো না, কাকীমা!

কুমারীশবাবু সপরিবারে গিয়ে গাড়ীতে উঠলেন। ভবেশবাবুর সদর দোরে কতকগুলি মৌনমূক সতৃষ্ণ দৃষ্টি তাঁদের গমনপথের দিকে কিছুক্ষণ-ধরে নির্নিমেষে চেয়ে রইলো।

চার

মাত্র বছর-খানেকের মধ্যেই ঘরে বাইরে সকলের সঙ্গেই বেশ জমিয়ে নিয়েছে ব্যোমকেশ। শ্বশুর বাড়ীর আওতায় বেশ একটা স্বপ্নের আমেজ, ঠিক যেন গোলাপী নেশার মত। ভালই লাগছে ব্যোমকেশের, পরমানন্দে দিন কাটছে। গৃহের আকর্ষণ চিত্তহারিণী চন্দ্রমুখী নববধূ সরযূ ত হাতের পাঁচ আছেই, অধিকন্তু বাইরেও সে কিছু কিছু আনন্দের উপাদান নিজের হাতে সৃষ্টি ক'রে নিয়েছে, হুজুগ-প্রবণ বহির্মুখী মনটাকে জিইয়ে রাখবার জন্য। ব্যোমকেশ একটি প্রতিভা। অতি অল্প দিনের মধ্যেই সমবয়সী বন্ধু-বান্ধবদের জুটিয়ে বেশ একটি সান্ধ্য বৈঠক তৈরি করে নিয়েছে 'তরুণ সঙ্ঘ' নাম দিয়ে।

সঙ্গীত চর্চা ও স্থানীয় জন-সাধারণের মধ্যে উৎকৃষ্ট নাট্যরস পরিবেশন করাই বর্তমানে তরুণ সঙ্ঘের প্রধান লক্ষ্য। একাধারে সঙ্গীত শিক্ষক ও নাট্য পরিচালনের গুরু দায়িত্বভার ব্যোমকেশকেই গ্রহণ করতে হয়েছে, অন্যান্য সহযোগীদের একান্ত অনুরোধে। কলিয়ারির মাইনিং সর্দার বামাপদ চাকীর বাইরের ঘরখানাই বর্তমানে তরুণ-সঙ্ঘের ক্লাবঘর। সাময়িক ভাবে সেই ব্যবস্থাই করা হয়েছে। সন্ধ্যার কিছু আগে থেকেই নিজের হাতে শতরঞ্জিখানা পেতে নিয়ে বাঁয়া-তবলায় চাঁটি দিতে বসে যায় বামাপদ। নিজের মনেই বাজনা সাধতে থাকে। তারপর তরুণ সঙ্ঘের সদস্যরা একে একে এসে জুটতে থাকে আড্ডায়। ব্যোমকেশ এসে দরজার একপাশে শৌখিন লপেটা-জোড়া খুলে হারমোনিয়ামটা টেনে নিয়ে বসে পড়ে একধারে। ধোপদস্ত আদ্দির রুমাল দিয়ে মুখখানা একবার ভাল ক'রে মুছে নিয়ে গুন্ গুন ক'রে সুর ভাঁজতে থাকে ইভনিং ইন্ প্যারিসের উগ্র গন্ধ ছড়িয়ে পড়ে

ক্লাবঘরের বাতাসে। তরুণসঙ্ঘের তরুণ মনগুলিকে কেমন যেন একটু ছুঁইয়ে দিয়ে যায় দামী সেন্টের ফুরফুরে সুবাস।

গান বাজনা সুরু হয়। পাশের সরকারী মেস থেকেও জোটেন এসে অনুরাগী কয়েকজন শ্রোতা। মেস-চালক প্রৌঢ় হাজারিদাও মাঝে মাঝে এসে জমে যান এই আনন্দমেলায়, রঙচটা বেহালাখানা তাঁর হাতে ঝুলিয়ে। কলিয়ারির এই সর্বজনীন হাজারিদা নামক ব্যক্তিটি শুধু তাঁদের হাজারিদাই নন কোম্পানীর তিনি বহুদিনের হাজারিদা, অর্থাৎ কিনা সিনিয়র এ্যাটেণ্ডেন্স ক্লার্ক। লোকটি বড ভাল, 'মাইডিয়ার' যাকে বলতে হয়। কোন রকমে বেহালার শুধু ছড়টানাটাই মোটামুটি শিখে রেখেছেন হাজারিদা, বাকিটুকু ভবিষ্যতের গর্ভে। তবে হ্যাঁ—এ বিষয়ে অনুরাগ তাঁর অপরিমেয়, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। সুযোগ পেলেই যন্ত্রটি ঘাড়ে ফেলে ভিড়ে যান গিয়ে যে কোন দলে। তাই ব্যোমকেশের দলের খাতায় হাজারিদার নাম চাপতে বড় বেশ দেরি হয়নি। সদস্য-তালিকার প্রথম পাতায় একেবারে গোড়ার দিকেই সসম্মানে ঠাঁই পেয়েছেন তিনি, যথোচিত পদমর্যাদা সমেত—'শ্রী এস, কে, হাজারি, পৃষ্ঠপোষক, তরুণ-সঙ্ঘ।' পদ-মর্যাদাটুকু যথাসাধ্য বজায় রেখে চলবার চেষ্টা করেন হাজারিদা, ফুরসৎ পেলেই যন্ত্রটি সমেত হাজির হন এসে তরুণ-সঙ্ঘের আড্ডায়। ব্যোমকেশের বাজনার সঙ্গে বেহালাটা একটু দোরস্ত ক'রে নেবার চেষ্টায় আছেন তিনি। বাঁয়া-তবলায় মাইনিং সর্দার বামাপদর হাতটি বেশ মিঠে। ওদিকটায় নিশ্চিন্ত। গ্রামের যাত্রাপার্টির বাঁশীয়াল ছোকরাটিও সম্প্রতি এসে ভিড়েছে গেছে তরুণসঙ্ঘের আড্ডায়। এই সঙ্গে হাজারিদাও যদি বেহালাটা কোন-রকমে চালিয়ে নিতে পারেন, তাহলে আর কনসার্টের দিকটা দেখতে হবে না। পৃষ্ঠপোষক হাজারিদার পক্ষ থেকে সেই চেষ্টাই চলছে।

সন্ধ্যা থেকে আড্ডা বসেছে। কিছুক্ষণ গানবাজনার পর সঙ্গীত চর্চায় ক্ষান্ত দেওয়া হলো। 'সপ্তরথী' নাটকের মহলা চলছে ক'দিন থেকে, তরুণসঙ্ঘের সর্বপ্রথম নাট্য-অবদান। সামনের কালীপূজায় কলিয়ারিতে শুধু বিদেশীদের যাত্রাই শুধু হবে না, সেই সঙ্গে বারোয়ারি তলায় স্টেজ

বেঁধে তরুণসঙ্ঘের প্রযোজনায় দু' এক রাত্রি থিয়েটারের ব্যবস্থাও এবার করা হচ্ছে। অক্লান্ত সঙ্ঘকর্মী ও সুদক্ষ পরিচালক শ্রী ব্যোমকেশ বন্দ্যোপাধ্যায় ওরফে জামাইবাবু, নিজে যখন এ কাজে হাত দিয়েছেন, তখন একটা কিছু নতুনতর হ'তেই হবে, এ বিশ্বাস না ক'রে আর উপায় নাই। ব্যোমকেশের আপ্রাণ চেষ্টায়.তরুণসঙ্ঘ যে ক্রমশই সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে চলেছে, সে বিষয়ে সন্দেহ কি। ক্লাবটা এবার জমলো।

সপ্তরথী নাটকে অর্জুনের ভূমিকায় দেখতে পাওয়া যাবে তরুণ-নুট শ্রীব্যোমকেশ বন্দ্যোপাধ্যায়কে। ভূমিকাটি সহজ নয়, অত্যন্ত সিরিয়াস পার্ট, বীর এবং করুণ রসের অপূর্ব সমন্বয়। কোলকাত্তী আর্টিষ্ট না হলে এ ভূমিকায় রূপ দেবে কে! তাই অভিমন্যুর পার্ট বাতিল ক'রে ব্যোমকেশকে শেষ পর্যন্ত নিতে হয়েছে গাণ্ডীবধন্বা তৃতীয় পাণ্ডবের দায়িত্ব। বয়োজ্যেষ্ঠ ও পূজণীয়ের সম্মান স্বরূপ হাজারিদার ঘাড়ে এসে পড়েছেন অস্ত্রগুরু দ্রোণাচার্য। হাজারিদা অবশ্য রথী মহারথীর দায়িত্ব নিতে প্রথমটায় খুব আপত্তি ক'রেছিলেন। এ সব কিনা মার মার কাট কাট লম্ফ ঝম্ফের ব্যাপার, তরুণ বয়সী ছেলে ছোকরাদেরকেই সাজে; তাঁকে নিয়ে অনর্থক আর কুরুক্ষেত্রে টানাটানি কেন। বিশেষ ক'রে তাঁকে যখন কনসার্ট পার্টির সঙ্গে এক নাগাড়ে বেহালা বাজিয়ে যেতে হবে নাটকের সুরু থেকে শেষ পর্যন্ত, তখন অপর কোন দায়িত্বের মধ্যে তাঁকে আর না জড়ানোই ভাল। হাজারিদার এ আপত্তি কিন্তু শেষ পর্যন্ত ধোপে টিকলো না। কনসার্ট পার্টির সঙ্গে বেহালা তাঁকে বাজাতে হবে ঠিকই, কিন্তু সে সময় ত তাঁর কোন অভিনয় থাকবে না। দ্রোণাচার্যের মেক-আপ নিয়ে পর্দার আড়াল থেকে বেহালার ছড় টানাটা এমন কিছু একটা কষ্টসাধ্য ব্যাপার নয়। এমনটা প্রায় সর্বত্রই ঘটে থাকে।

কথাটা খুব খাটী। এ্যামেচার থিয়েটারে এর চেয়েও গুরুতর ব্যাপার আরও বহু ঘটতে দেখা গেছে। পুত্র-শোকাতুরা রাণী মন্দোদরীকে পর্দার অন্তরালে এসে গোগ্রাসে এক পেট চপ-কাটলেট উদরস্থ ক'রে সিগ্রেট ফুঁকতে ফুঁকতে আমরা সিন টানতে দেখেছি। অঙ্গাধিপতি মহাবীর কর্ণের পুত্র

বৃষসেনকে দেখি একান্তে বসে কাটাসৈন্যের পা টিপছে। এমন কি তরুণ তাপস ঋষ্যশৃঙ্গের মত কামকেলি-অনভিজ্ঞ ঋষিকুমারকেও নেপথ্যে অতি অবলীলাক্রমে উর্বশী বাইজীর আঁচল ধরে টানাটানি পর্যন্ত করতে দেখা গেছে। তাতে ক'রে অভিনয়ের দিক থেকে এমন কিছু মারাত্মক হানি ঘটেনি। ওগুলো প্রায় ঘটেই থাকে। সুতরাং অস্ত্রগুরু দ্রোণাচার্যকে পরচুলার গোঁপদাড়ি পরে অন্তরালে দু'এক ঘণ্টা যদি বেহালা বাজাতে হয়, সে আর এমন নতুন কথা কি। হাজারিদাকে বাধ্য হয়ে বেহালাদারি ও দ্রোণাচার্যত্ব দুটোই শ্রম পর্যন্ত স্বীকার ক'রে নিতে হয়েছে। অন্যান্য মহারথীরাও প্রস্তুত। তাদের মহড়াকালীন রণহুঙ্কার এখন থেকেই শোনা যাচ্ছে। নাটক এখন প্রস্তুতির পথে। একটুখানি শুধু মুস্কিল হয়েছে উত্তরাকে নিয়ে। পাশের গাঁয়ের হাইস্কুলে ক্লাস নাইনে পড়ে ছেলেটি। একমাত্র ছুটির দিন ছাড়া পড়াশুনো কামাই ক'রে আখড়ায় এসে মহলা দেবার অবকাশ তার কম। ব্যোমকেশকে তাই মাঝে মাঝে যেতে হয় তার বাড়ী পর্যন্ত, ছেলেটিকে ট্রেনিং দিতে। ছোকরার বেশ 'ন্যাক' আছে। গান গায় ভালই, আবৃত্তি করে চমৎকার, চেহারাখানাও বেশ মানানসই। একে যদি কোন রকমে শিখিয়ে পড়িয়ে শেষ পর্যন্ত স্টেজে নামাতে পারে ব্যোমকেশ, উত্তরা একখানা দেখিয়ে দেবে।

রিহার্সেলের কাজ শেষ হতেই একে একে সব বিদেয় হয়ে গেল। রাত দশটার সিটি পড়লো এক নম্বর পাওয়ার হাউসে। বামাপদের কিন্তু টিকি নাই ঘণ্টাখানেক আগে থেকে। বাঁয়া-তবলাটা গড়াগড়ি যাচ্ছে মেঝের উপর। হারমোনিয়মখানা খোলাই পড়ে আছে একধারে। যন্ত্রগুলো পর্যন্ত গুটিয়ে রেখে যায় নি। বামাপদ হঠাৎ হাওয়া হয়ে উড়লো কোথায় ?

ক্লাব ঘরের দরজায় খিল এঁটে দিয়ে ভিতর দিকের বারান্দায় গিয়ে উঠলো ব্যোমকেশ। বামাপদর ফাঁকা বাড়ী। পাশের কামরায় আলো জ্বলছে। ব্যোমকেশ দরজায় গিয়ে গোটা কয়েক টোকা দিলে। ভিতর থেকে সাড়া এলো,—কাম ইন। দরজা ঠেলে ঘরের মধ্যে গিয়ে ঢুকে পড়লো ব্যোমকেশ। বামাপদ নেশা করছে। রিহার্সেল থেকে চুপচাপ এসে বসে গেছে কখন

বোতলের ছিপি খুলে। লিকারের উগ্র গন্ধ ছড়িয়ে পড়েছে সারা ঘরে। ব্যোমকেশ তাড়াতাড়ি নাকে মুখে রুমাল চাপা দিলে। বামাপদ হো হো ক'রে একবার হেসে উঠলো। ব্যোমকেশের বিশেষ বন্ধু, তরুণ সঙ্ঘের একটি প্রথম শ্রেণীর চাঁই খাদসর্দার এই বামাপদ চাকী। বিশেষ কিছু বলাও যায় না। মনে মনে কিন্তু বেশ একটু ক্ষুন্ন হলো ব্যোমকেশ। বললে,—এ সব আবার কি আরম্ভ করেছিস! অভ্যাসটি ত ভাল নয় বামাপদ, না—না—এটা তোকে ছাড়তে হবে।

বামাপদ হো হো ক'রে আর একদফা হেসে উঠলো আহাম্মকের মত। বললে,—ধরলাম কখন, যে ছাড়বো? এ শুধু মাঝে মাঝে একটু রিক্রিয়েশন মাত্র।

ব্যোমকেশ একটু আশ্চর্য হয়ে বললে,—নেশা ক'রে রিক্রিয়েশন! না—না—এ ত ভাল কথা নয়। এই ক'রে তুই ক্লাবটাকে কোন্ দিন ডোবাবি। এ আমি কিছুতেই হতে দেব না বামাপদ, এটা তোকে ছাড়তেই হবে।

বামাপদ যেন সত্যি সত্যি একটু সজাগ হয়ে উঠলো। ডান হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে বললে,—হাত মিলাও দোস্ত—হাত মিলাও, এতক্ষণে একটা কথার মত কথা বলেছ।

ব্যোমকেশ খানিকটা উৎসাহিত হ'য়ে বললে,—তাহলে কথা দে'—আজ থেকে এসব ছাড়লি।

—ছাড়লাম মানে, ঝেটিয়ে একেবারে বিদেয় ক'রে দিলাম, ইহজীবনের মত।

এই বলে বামাপদ প্রায়-নিঃশেষিত বোতলটার মুখে ছিপি এঁটে কাচের গেলাসটা সমেত জানলা গলিয়ে বাড়ীর পিছন দিকে ছুঁড়ে দিলে।

ব্যোমকেশ খুশী হয়ে উঠলো—যাক, আপদ গেল। তরুণ সঙ্ঘের একটা ফাঁড়া কেটে গেল আজ।

সৎসঙ্গের অশেষ গুণ। ভাগ্যিস আজ ব্যোমকেশের কাছে হাতে নাতে ধরা পড়ে গেল বামাপদ। নইলে এই সুবুদ্ধিটুকু যোগাতো কে। বন্ধুকে সৎপথে টেনে নেওয়াই যে বন্ধুলোকের কাজ। বামাপদ হঠাৎ গুন্ গুন্ ক'রে একটা সুর ধরলে:—

ওগো সাথী মম সাথী—
আমি সেই পথে যাব সাথে।
যে পথে বন্ধু মাতাল খেদাতে
ধেয়ে আসে লাঠি হাতে। ওগো সাথী—

কথা জড়িয়ে আসছে বামাপদর। ব্যোমকেশ তাকে একটা ধমক দিয়ে থামিয়ে দিলে, বললে,—থাক্, আর সুর ভাঁজতে হবে না, রাত দশটা বেজে গেছে, চল্লি আমি।

বামাপদ একটু সুর টেনে বললে,—গুড নাইট !

কলিয়ারির অফিস আর শ্বশুরবাড়ী। দুটোর মধ্যে ব্যবধান এত অল্প যে বহুবিশ্রুত প্রিয়াবিরহের কি জানি এক উহু মরি মরি আস্বাদ ব্যোমকেশের কাছে নিছক একটা হেঁয়ালি হয়েই রয়ে গেল বুঝি অনির্দিষ্টকালের জন্য। বিরহের কোন অবকাশ নাই। নব-অনুরাগিনী নববধূ সরযূর কুঞ্জে মৌরসী পাট্টা নিয়ে শিকড় গেড়ে বসে গেছে ব্যোমকেশ, নড়বার আর উপায় নাই। সরযূর অঞ্চল প্রান্তে চঞ্চল মনখানি তার কি মায়ায় যে বাঁধা পড়ে গেল হঠাৎ খাদমুলুকে বেড়াতে এসে, ব্যোমকেশের জীবনে এও একটা কম হেঁয়ালি নয়। কিন্তু একটানা এই মিলনের আনন্দ ক্রমশই যেন একঘেয়ে হয়ে আসছে। অফিস থেকে দিন কয়েকের ছুটি নিয়ে বাইরে কোথাও ঘুরে আসবে নাকি ব্যোমকেশ? যেতে পারলে ভালই হতো, কিন্তু ছাড়পত্র যোগাড় করা মুস্কিল। অফিস তাকে ছুটি দিলেও বাড়ী থেকে ছুটি পাওয়া কোনমতেই সম্ভব নয়। বাইরে যাওয়ার নাম করলেই জামাতৃ-বৎসল শ্বশ্রূমাতা অতিমাত্রায় কাতর হয়ে ওঠেন। স্বল্পভাষী শ্বশুর মশায় 'বেশ ত এক সময় গেলেই হবে' বা এই রকমের একটা কিছু আশ্বাসবাণী উচ্চারণ ক'রেই সেইখানেই একটি বিরাম-সূচক দাঁড়ি টেনে দেন। ব্যস—ওই পর্যন্তই। আর সরযূ, এ বিষয়ে তাকে কিছু বলা মানেই বাহুল্য। পরীক্ষা ক'রে দেখা আছে ব্যোমকেশের। মুখখানা একটু গম্ভীর ক'রে ঘোমটার ফাঁকে হয়ত বলে উঠবে,—তাই যাও না, আমি কি কাউকে ধরে রেখেছি। এর

ব্যঞ্জনাটুকু জলের মত পরিষ্কার এবং তীরের মত তীক্ষ্ণ, সোজা গিয়ে হৃৎপিণ্ডে আঘাত করে, এর পর আর কথা চলে না। একুনে এই তিন তিনটে কড়া পাহারার দেউড়ী পার হয়ে এখান থেকে ফস্‌কে বেরুনো সহজ কথা নয়। এখন শ্বশুরবাড়ীর সোনার দাঁড়ে বসে গৃহপালিত শুকপক্ষীর মত পরমানন্দে ছাতুছোলা খাও, আর মনে মনে জপতে থাকো,—জয় রাধে, জয়তু শ্রীমতী রাধে—দেহি পদপল্লবমুদারম্।

সরযূকে একখানা প্রেমপত্র লিখবার সুযোগ পর্যন্ত পাওয়া গেল না ইস্তক বিয়ে হওয়ার পর থেকে। ব্যোমকেশের পক্ষে এটা কিন্তু ভাল কথা নয়। মানুষের জীবনে একবার প্রেম জাগে, জাগে রঙিন স্বপ্ন, আর সেই সঙ্গে কিছু কিছু কাব্যধর্মী উচ্ছ্বাস। বারে বারে যদি নাও-জাগে অন্তত বিয়ের পর মনে প্রাণে দোলা দিয়ে একবার সে জাগবেই। শুভদৃষ্টি বা গাঁটছড়া বাঁধার সঙ্গে সঙ্গেই হৃৎপিণ্ডে কেমন যেন একটা হেঁচকা রকমের টান পড়ে, বুকের মধ্যে শুরু হয় দুরু দুরু কম্পন। তারপরই বাসর ঘর। সে ত প্রায় একটা দিগ্বিজয়ের ব্যাপার। নিশি প্রভাত হতে না হতেই হঠাৎ যেন মনে হয় রাতারাতি বুঝি মস্ত একটা হিরো হয়ে বসে আছি। সারা দুনিয়াটা যেন সানাইয়ের সুরে মাতাল হয়ে অকস্মাৎ এসে লুটিয়ে পড়েছে পায়ের তলায়। ব্যোমকেশের এটা হাতে নাতে পরীক্ষা করা আছে।

লক্ষণটা ভালই। নবজীবনের জয়যাত্রার পথে প্রেমদেবতার এ এক অভিনব জাগরণ। সদ্য সদ্য বিয়ে করার পর মনে প্রাণে এ বস্তু যার জাগে না, তাকে নেহাত হৃদয়হীন পাষণ্ড ছাড়া আর কি বলা যেতে পারে। এ জাতীয় অপ্রেমিকের হাত থেকে ঈশ্বর আমাদের রক্ষা করুন। সুখের কথা আমাদের ব্যোমকেশ বাবাজীবন কিন্তু সে দলের বাইরে। প্রেম এবং কাব্যোচ্ছ্বাস দুটোই রীতিমত উদ্বেল ক'রে তুলেছে বেচারীকে ইদানিং কিছু কাল থেকে। ঘোমটা দেওয়া একখানি মুখ, কাঁকনপরা পেলব একজোড়া বাহু, আর আলতাপরা কোমল দু'টি চরণ মানুষকে যে এতখানি ঘায়েল ক'রে ফেলতে পারে, বাউণ্ডুলে ব্যোমকেশচন্দ্রের এতকাল তা জানা ছিলো না। সরযূকে আশ্রয় ক'রে তার জীবনের বুঝি মোড় ফিরলো। শ্বশুর

বাড়ীর আওতায় এসে ব্যোমকেশ হঠাৎ সত্যি সত্যি একটা হিরো হয়ে উঠলো নাকি! স্বপ্ন-বিভোল দাম্পত্য-জীবননাট্যের মহানায়ক আজ ব্যোমকেশ, হিরো হতে আর বাকি কি। এইবার সরযূকেও কোন রকমে একটু একটু ক'রে হিরোইনের পর্যায়ে টেনে তুলতে হবে, ব্যোমকেশের একান্ত চেষ্টা। সঙ্গীত বিদ্যায় আর একটুখানি তাকে পাকিয়ে নিতে পারলেই হয়। দু' একটা গানের মজলিসে ধরে নিয়ে গিয়ে কোন রকমে দু' একখানা টোরি বা মালকোষ ছেড়ে দিতে পারলেই—ব্যস্, আর দেখতে হবে না, গায়িকা থেকে একেবারে আর্টিস্ট। চাই কি, সামনের বার 'অল ইণ্ডিয়া মিউজিক কমপিটিশনে' সরযূকে অনায়াসে ভিড়িয়ে দেওয়া যেতে পারে। সেই তালেই আছে ব্যোমকেশ।

ক'দিন থেকেই সরযূকে তাড়া দিচ্ছে ব্যোমকেশ—ইতস্তত বিক্ষিপ্ত গান আর স্বরলিপির কপিগুলো যেন ভাল খাতায় এক জায়গায় তুলে রাখা হয়। সরযূ কিন্তু ক্রমাগত গড়িমসি করছে। একখানা বাঁধা খাতার অভাবেই সব কিছু নাকি আটকে আছে তার। এটা একটা অজুহাত কিনা কে জানে।

সেদিন অফিস ফেরত সাইকেলের ক্যারিয়ারে এক তাড়া কাগজপত্র বেঁধে নিয়ে ব্যোমকেশ বাড়ী ঢুকলো। বৈকালিক চা জলখাবার নিয়ে সরযূ এসে সামনে দাঁড়াতেই ব্যোমকেশ তাড়া খুলে তিনখানা ঝকঝকে বাঁধা খাতা সরযূর সামনে ধরে দিয়ে বললে,—এই নাও তোমার গানের খাতা। একটাতে খেয়াল ঠুংরি, একটায় তোমার ওই ভজন আর রাগ-প্রধান, আর একটায় স্রেফ আধুনিক। বেশ ভাল ক'রে কপি ক'রে নাও।

একখানা বাঁধা খাতার অভাবে নিতান্তই যা আটকে ছিলো এতদিন, ব্যোমকেশের উৎসাহের আতিশয্যে সে বাধাটুকু অপসারিত হতে একটা দিনও সময় লাগলো না। গানগুলো কপি না ক'রে সরযূর আর উপায় নাই। কিড-লেদারের বর্ডার দেওয়া উৎকৃষ্ট রেক্সিনে বাঁধাই খাতাগুলো কিন্তু দেখতে খুব চমৎকার। সরযূ বুঝি একটু খুশী হয়ে উঠলো, বললে,—বেশ সুন্দর হয়েছে। কিন্তু একখানা হলেই ত আমার সম্প্রতি কাজ চলে যেতো, এতগুলো পয়সা খরচ ক'রে একসঙ্গে তিনখানা আনবার কি দরকার ছিলো।

ব্যোমকেশ একটু বাঁকা হাসি হেসে বললে,—পয়সা, পয়সা আবার কিসের! এ খাতা আমি দাম দিয়ে কিনে এনেছি ভেবেছ! মোটেই না, কোম্পানীর স্টোর থেকে বাগিয়ে নিয়ে এলাম।

সরযূ একটু বিস্মিত হয়ে বললে,—সে কি এতগুলো দামী খাতা—

ব্যোমকেশ বলে উঠলো,—আরও আছে, দিস্তে পাঁচেক রুলটানা ফুলস্কেপ কাগজ। নতুন নাটকের পার্ট লিখতে এগুলো কাজে লেগে যাবে। কোম্পানীর ঘাড় ভেঙ্গে আমার ক্লাবের কিছু খরচা বাঁচিয়ে দিলাম, বুঝতে পারছো না!

গম্ভীর হয়ে উঠলো সরযূ। বুঝতে সে সবই পেরেছে। খাতাগুলো নামিয়ে দিলে টেবিলের একপাশে। নিজের মনেই কি যেন ভাবছে সরযূ। ব্যোমকেশ আবার বলে উঠলো,—কি, হাঁ ক'রে চেয়ে রইলে যে!

সরযূ একটু আমতা আমতা ক'রে বললে,—কিন্তু কাজটা কি বেশ ভাল হলো! এই নিয়ে অফিসে একটা জানাজানি হলে—

ব্যোমকেশ চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে বললে,—জানাজানি হলেই বা কি, এ নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না। অফিসের নীচে থেকে উপর পর্যন্ত সব আমার মতই ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির। যে যার আপনার তালে আছে। মাঝখান থেকে আমি কেন হাত গুটিয়ে বসে থাকি। একা শুধু আমার জন্যেই কোম্পানী কিছু দেউলে হয়ে যাবে না।

সরযূ কিন্তু এ যুক্তি মেনে নিতে পারলে না, তার মনের মধ্যে কোথায় যেন একটু বিঁধছে। একটুখানি ইতস্তত ক'রে পুনরায় বললে,—এটা কিন্তু অন্যায়, কাজটা বেশ ভাল হয় নি, সে তুমি যাই বলো।

ব্যোমকেশ একটু চোখ তেড়ে বললে,—তুমি আবার সারমন ঝাড়তে আরম্ভ করলে যে! ন্যায় অন্যায় বলে বর্তমান পৃথিবীতে কিছু আছে নাকি! তা যদি থাকতো তাহলে শ্রীমান ব্যোমকেশ শর্মাকে ফ্যা ফ্যা ক'রে পথে পথে আজ ভবঘুরের মত ঘুরে বেড়াতে হতো না। কি না আমার ছিলো একদিন, সবই ছিলো; তাই দিয়ে আমার সারাটা জীবন রাজার হালে কেটে যেতে পারতো। কিন্তু শঠ আর প্রতারকদের জাল আর জোচ্চুরি, অন্যায় আর

অধর্মকে সে দিন কিন্তু আমি নীতির দোহাই দিয়ে ঠেকাতে পারি নি। তাই সাবালক হওয়ার আগেই আমাকে প্রায় সর্বস্বান্ত হয়ে পথে গিয়ে দাঁড়াতে হয়েছিলো। কিন্তু যাক সে সব দুঃখের কথা, ও সব বালাই মন থেকে আমি একেবারে ঝেড়ে মুছে ফেলেছি।

এইখানেই থেমে গেল ব্যোমকেশ। পরক্ষণে আবার শুরু করলে,—এখন আমার কি মনে হয় জানো? অতি বাস্তব এই দুনিয়াটার সঙ্গে মনে মনে একটা রফা ক'রে নেওয়াই ভাল। বহু দেখে বহু ঠেকে অনেক কিছু ভেবে-চিন্তে এইটুকুই এখন বুঝেছি যে দুনিয়ার এই সরাইখানায় যে ক'টা দিন নেহাত মাথা গুঁজে থাকতেই হবে, হেসে খেলে জীবনটাকে বাঁশীর মত ফুঁ দিয়ে যতখানি সম্ভব বাজিয়ে নেওয়াই ভাল। পদে পদে বেসুর গেয়ে লাভ কি? 'ইট, ড্রিঙ্ক এ্যাণ্ড বি মেরি' এই পন্থাটাই জীবন-সমস্যা সমাধানের সব চেয়ে একটা বড় পন্থা, এই কথাই আমার বারে বারে মনে হয়েছে। ড্রিঙ্ক অবশ্য আমি করি না, কিন্তু জীবনটাকে আমি যেমন ক'রে হোক খুশী রাখতে চাই। তার ছোটখাটো প্রয়োজনের তাগিদে মাঝখান থেকে কোথায় কোন্ অসতর্ক মুহূর্তে ন্যায়নীতির সীমারেখার বাইরে হঠাৎ একটু পা পিছলে গেল, এটা এমন কিছু বড় কথা নয়। কিন্তু তুমি এমন ধারা নিঝুম মেরে গেল কেন, কি ভাবছো বলতো!

সরযূ ম্লান একটু হাসি টেনে বললে,—তোমার বক্তৃতা শুনছি। আর কিছু বলবে?

ব্যোমকেশ হতাশ হয়ে পড়লো। বুঝতে তার বাকি রইলো না যে এতক্ষণ ধরে যে সারগর্ভ মূল্যবান বাণীগুলি সে আউড়ে গেল সরযূর সামনে তা কিছুমাত্র কাজে লাগে নি, ব্যোমকেশের শুধু বকে যাওয়াই সার হয়েছে।

বাইরে বেরোবার সময় হলো। তাড়াতাড়ি চা পর্ব শেষ ক'রে ব্যোমকেশ পুনরায় বললে,—খাতাগুলো তুলে রাখ, লেখালেখি শুরু ক'রে দাও আজ থেকেই।

টেবিলের উপর থেকে খাতাগুলো তুলে নিয়ে সরযূর দিকে এগিয়ে দিলে ব্যোমকেশ, বললে,—নাও ধর—হাঁ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলে কেন!

সরযূ এবার স্পষ্টই বলে উঠলো,—এ খাতা আমি কিছুতেই নিতে পারবো না, সে তুমি যা-ই মনে কর। এগুলো তুমি নিয়ে যাও, তোমার থিয়েটার পার্টির পার্ট লিখতে হয়ত কাজে লাগতে পারে।

ব্যোমকেশ বললে,—সে জন্যে ত যথেষ্ট কাগজ আনা হয়েছে, খাতাগুলো এনেছি শুধু তোমার জন্যে।

সরযূ কিন্তু রাজি হলো না, পুনরায় বলে উঠলো,—কিন্তু এগুলো ব্যবহার করা আমার পক্ষে কিছুতেই সম্ভব নয়। তোমার কোম্পানীকে পার ত এগুলো ফিরিয়ে দিয়ে এসো।

ব্যোমকেশ একটু বিস্মিত হলো। তীক্ষ্ণ একটা দৃষ্টি হেনে বললে,—কিন্তু আমাকে যে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে কোম্পানীর অফিস চালাতে হয়। তার সুযোগ সুবিধাগুলো আমাকে পেতে হবে না?

সরযূ তর্কের মুখে জবাব দিলে,—কোম্পানীর অফিস চালাও তার জন্য তারা মাইনে দেয়, এলাওয়েন্স দেয়, কত রকমের বোনাস দেয়। এ সবগুলো ত দেবার কথা নয়।

ব্যোমকেশ একটু বে-কায়দায় পড়লো। সরযূর কাছে তর্কের মুখে সে হেরে যাবে নাকি! পুনরায় একটা চাপান দিয়ে বললে,—কিন্তু এগুলো যে আমাদের উপরি পাওনা। কোম্পানীর বাজেটের মধ্যে এর জন্য একটা মোটা টাকা ধরা আছে, সে খবর রাখো!

কথাটা যে একেবারেই সত্যি নয় ব্যোমকেশ তা জানে। কিন্তু সরযূর কাছে হার মানবে সে কেমন ক'রে, সে যে ভয়ানক লজ্জার কথা হবে!

ব্যোমকেশের এই আমতা আমতা ভাব দেখে সরযূ কিন্তু এবার হেসে ফেললে, বললে,—কোম্পানীর আইনে উপরি পাওনা বলে কিছু নাই। এটা তোমার নিছক একটা ভাঁওতা।

ব্যোমকেশের পিঠে সপাং ক'রে যেন এক ঘা চাবুক পড়লো। সরযূর কাছ থেকে আজ এই সব কথা শুনতে হবে নাকি, সরযূ কি তার 'বস্'? ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলে উঠলো ব্যোমকেশ,—ভাঁওতা, এ কথার মানে? তা হলে

কি তুমি বলতে চাও যে কোম্পানীর গুদাম থেকে এগুলো আমি চুরি ক'রে এনেছি, আমি চোর ?

অহেতুক আক্রোশে ব্যোমকেশ হঠাৎ ফোঁস ক'রে উঠলো। একটুখানি ঘাবড়ে গেল সরযূ ব্যোমকেশের ভাবগতিক দেখে। সঙ্গে সঙ্গে আবার বলে উঠলো,—সে কি, ও কথা তুমি ধরে নিচ্ছো কেন, আমি কি তোমাকে চোর বলেছি !

ব্যোমকেশ একটু জোর দিয়ে বললে,—বলছই ত, বলতে আর বাকি রাখলে কি ? আমি চোর—আমি প্রতারক—আমি ভাঁওতাবাজ—

সরযূ বাধা দিয়ে বললে,—না—না—ও কথা আমি বলি নি, দোহাই তোমার—তুমি চুপ কর, বাইরে কেউ শুনতে পাবে যে।

ব্যোমকেশ বললে,—শুনুক। এই সমস্ত বড়লোকী চাল সহ্য করে, শ্বশুর বাড়ীর অন্নদাস হয়ে এ ভাবে আমি থাকতে চাই না। যে স্ত্রী স্বামীর মুখের উপর চোর বাটপাড় বলে তাকে চোখ রাঙিয়ে শাসায়—

সরযূ একেবারে ঘেমে উঠলো। অতি অসহায়ভাবে কাতর কণ্ঠে এবার বলে উঠলো সরযূ,—থাক—থাক—ও সব কথা আমায় শুনিয়ো না। যদি কোন ভুল ক'রে থাকি তার জন্যে মাপ চাইছি। তোমার দু'টি পায়ে পড়ি, তুচ্ছ একটা ব্যাপার নিয়ে তুমি এতখানি কঠোর হয়ে উঠো না।

ব্যোমকেশ যেন ভিতর থেকে একটা ধাক্কা খেলে। এ আবার কি অদ্ভুত কাণ্ড ! সরযূর কণ্ঠস্বর এত করুণ হয়ে উঠলো কেন ?

ব্যোমকেশের উত্তেজিত মনের উদ্ধত স্নায়ুতন্ত্রীগুলো এক মুহূর্তে যেন ঝিমিয়ে পড়লো, অবসাদগ্রস্ত মন্ত্রমুগ্ধ নাগশিশুর মত। সরযূর মনে কি আঘাত দিয়েছে ব্যোমকেশ !

আর একটিবার সরযূর মুখের দিকে তাকাতেই ব্যোমকেশের দৃষ্টি যেন স্তব্ধ হয়ে থেমে রইলো কিছুক্ষণের জন্য। সরযূর চোখের পাতাগুলো কি ভারি হয়ে উঠেছে ! মুক্তার মত দু'টি বিন্দু চোখের কোণে টলমল করছে কি ও ?

ব্যোমকেশের মন থেকে ক্রুদ্ধ একটা বন্য পশু কখন যেন হঠাৎ তাড়া খেয়ে সরে পড়েছে ! সেখানে এসে নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে আছে অচপল এক

মায়ামুগ্ধ কুরঙ্গ। অবাক বিস্ময়ে হাঁ ক'রে যেন চেয়ে আছে সরযূর দু'টি ব্যথাহত আঁখির পানে বিহ্বল দৃষ্টি মেলে। বিস্মিত ব্যোমকেশ হঠাৎ বলে উঠলো,—তোমার চোখ দু'টো যেন ছলছল করছে না!

সরযূ তাড়াতাড়ি চোখ দুটো একটু মুছে নিয়ে বললে,—কই না ত।

ব্যোমকেশ একটু গম্ভীর হয়ে উঠলো, বললে,—বুঝেছি, এ শুধু আমাকে জব্দ করবার মতলব।

প্রসঙ্গটা চাপা দেবার জন্য সরযূ এবার তাড়াতাড়ি মুখে একটু হাসি টেনে বললে,—আর এক কাপ চা আনবো?

ব্যোমকেশের আর বলবার কিছু নাই। আর এক কাপ চা খেলেই যদি খুশী হয় সরযূ, ব্যোমকেশের তাতে আপত্তি কি। বললে,—বেশ, আনো আর এক কাপ। কিন্তু তার আগে খাতাগুলো তুমি তুলে রেখে যাও।

সরযূ সায় দিয়ে বললে,—নিশ্চয় তুলে রাখবো।

খাতাগুলো আলমারির দেরাজে বন্ধ ক'রে দিয়ে ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল সরযূ। হতবুদ্ধি ব্যোমকেশ নিঝুম মেরে বসে রইলো চেয়ারের পিঠে হেলান দিয়ে। সরযূকে আঘাত করতে গিয়ে নিজেই সে খানিকটা আহত হয়ে পড়েছে। কিন্তু কি অদ্ভুত এই সরযূদের জাতটা। ফুলের ঘায়ে এরা মূর্ছা যায়, একটুখানিতেই নেতিয়ে পড়ে, কথায় কথায় চোখের জলে বুক ভাসায়। এদের স্বভাবটাই কি ছিঁচকাঁদুনি! কিন্তু সব চেয়ে আশ্চর্যের কথা শেষ পর্যন্ত এরাই কিন্তু জয়ী হয়। চোখের জলে এরা পাষাণ গলিয়ে দেয়, ঐরাবতকে তলিয়ে দেয় সামান্য দু' ফোঁটা অশ্রু জলের অতলস্পর্শী মায়ায়। এটা কি ওদের জন্মগত অধিকার, বিশেষ একটা ঐশ্বর্য! নাকি পুরুষ-জয়ের অস্ত্র ওটা, নাকি ও দুটোই! ব্যোমকেশের কাছে এও যেন এক গভীর রহস্য।

শুধু ব্যোমকেশ কেন, রহস্যময়ী এই নারী-বিগ্রহের পাদপীঠমূলে ব্যোমকেশের মত লক্ষ লক্ষ অধম জীব বোম্-ভোলানাথ হয়ে পড়ে আছে চৈতন্যহীন জড়ের মত যুগ-যুগান্ত ধরে। ঘুম ভাঙ্গিয়ে তাকে জাগালো

কে! তার বিস্ময় বিমূঢ় দৃষ্টির সামনে নিখিল-বিশ্ব-চরাচরব্যাপী অনন্ত সৌন্দর্যের অপরূপ চিত্রখানি বারে বারে তুলে ধরলো কে! রহস্যময়ী এই নারী। জায়া জননী ভগ্নীরূপে যুগে যুগে এরা সঙ্গ দিয়েছে পুরুষকে। অপরিমেয় ভালবাসা আর অফুরন্ত মায়া দিয়ে ধূলোমাটির এই পৃথিবীকে রূপে রসে মাধুর্যে ভরে তুলেছে অব্যক্ত এক স্বর্গীয় সুষমায়। দিগ্‌ভ্রান্ত ও বেতালপন্থ শ্রীমান ব্যোমকেশ বাবাজীবনের পক্ষে এই রহস্য-বারিধির থৈ পাওয়া খুব সহজ কথা নয়।

ব্যোমকেশ আর এক দফা চা পান শেষ ক'রে রিহার্সালে যাবার জন্য প্রস্তুত হলো। সরযূ দাঁড়িয়ে ছিলো এক পাশে। ব্যোমকেশ তার ডান হাতখানা হঠাৎ মুঠোর মধ্যে টেনে নিয়ে বললে,—চুপচাপ কি ভাবছো, বল ত?

সরযূ মৃদু একটু হেসে বললে,—ভাবছি আজ সন্ধ্যাটা কি চমৎকার, একটু পরেই চাঁদ উঠবে, না?

সরযূর মনটা কি সত্যি সত্যি হাল্‌কা হয়ে গেছে। যাক্ এতক্ষণে তার মুখে একটু হাসি ফুটলো। এইটুকুই এখন দেখতে চায় ব্যোমকেশ। কিন্তু এ হাসি যে নিতান্তই পরিমিত, এ দিয়ে কি মন ভরে! ব্যোমকেশ একটু অনুযোগের সুরে বললে,—আর একটু তাই প্রাণ খুলেই হাস না, এত কার্পণ্য করছো কেন!

জোর ক'রেই যেন আর খানিকটা হাসি টেনে বললে সরযূ,—হাসছি ত, আর কত হাসবো।

ব্যোমকেশ এবার সরযূর মুখখানা মুখের কাছে টেনে নিয়ে তার গালের নীচে এলোপাথাড়ি চুমু ঘষতে আরম্ভ করলে। বললে,—তোমাকে আমি না হাসিয়ে ছাড়বো ভেবেছ, গোমড়া মুখ আমি একদম সইতে পারি না, তা জানো।

সরযূ কিন্তু সত্য সত্যই এবার হো হো ক'রে হেসে উঠলো। বললে,—ছাড়ো—ছাড়ো—কাতুকুতু লাগে যে। উঃ—এ আবার কি কাণ্ড—বলো ত!

সরযূর বাঁ গালটা কি হঠাৎ লাল হয়ে উঠলো। অতর্কিতে ঠোঁটের কাছে পেয়ে লোলুপ দশনের লাঞ্ছন-চিহ্ন এঁকে দিলে নাকি ব্যোমকেশ!

গোধূলি প্রায় গড়িয়ে আসছে। দরজার পাশে সুইচটা হঠাৎ টিপে দিলে ব্যোমকেশ। সরযূ গিয়ে ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঁড়ালো। গালটা তার সত্যই গোলাপ ফুলের পাপড়ির মত রেঙে উঠেছে। পিছন দিক থেকে মুখ টিপে টিপে হাসছে ব্যোমকেশ। আয়নার ছায়ার মধ্যে দু'জনের চোখোচোখি হয়ে যেতেই সরযূ হঠাৎ লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠলো। তাড়াতাড়ি মুখ ফিরিয়ে বললে,—যাও, ভয়ানক দুষ্টু তুমি।

ব্যোমকেশ এবার হো হো ক'রে হেসে উঠলো নিজের মনেই। যেন এইমাত্র একটা রাজ্য জয় ক'রে ফেলেছে। পাম্প-শু জোড়া পায়ে দিয়ে বললে,—এবার কিন্তু আমায় বেরুতে হচ্ছে। গানগুলো মোদ্দা আজ থেকেই তুমি কপি করতে শুরু ক'রে দাও।

সরযূ ঈষৎ মাথা নেড়ে বললে,—আচ্ছা।

পাঁচ দিস্তের রুলটানা কাগজের তাড়াটা সাইকেলের ক্যারিয়ারে বেঁধে নিয়ে ব্যোমকেশ আবার বেরিয়ে পড়লো।

আলমারির দেরাজ থেকে একখানা বাঁধা খাতা বের ক'রে গৃহ-ভৃত্য বাণেশ্বরকে একটা ডাক দিলে সরযূ। বাণেশ্বর বুড়ো সামনে এসে দাঁড়াতেই খাতাখানা তার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললে,—ঠিক এই রকমের তিনখানা বাঁধা খাতা বাজার থেকে এক্ষুনি আমায় কিনে এনে দিতে পার, বাণেশ্বর দা! হুবহু ঠিক এই রকমের, দপ্তরীর দোকানে পাওয়া যাবে।

বাণেশ্বর খাতাখানা হাতে নিয়ে একটুখানি নেড়ে চেড়ে বললে,—খাতাটি ত বেশ সুন্দর, দিদিমণি! কি বাহারের খোসবো উঠছে দেখেছ, ঠিক যেন কাবুলী আতর।

সরযূ একটু হেসে বললে,—আতর নয়, ওটা চামড়ার গন্ধ।

বাণেশ্বর খাতাখানা আর একবার ভাল ক'রে শুঁকে নিয়ে বললে,—চামড়ার গন্ধ? তাই বুঝি হবে। ঠিক—ঠিক—তুমি ঠিকই বলেছ দিদিমণি গন্ধটা লাগছে ঠিক যেন নতুন জুতোর মত; এ নিঘ্যাত চামড়া।

আর একবার হো হো ক'রে হেসে উঠলো সরযূ। বাণেশ্বর খাতাখানা সরযূর সামনে ধরে বললে,—কিন্তু এর দামদস্তুর ত আমি জানি না দিদিমণি, বোকা পেয়ে যদি ঠকিয়ে নেয়।

সরযূ হাসতে হাসতে বললে,—ঠকাবে না, যা দাম চায় দিয়ে এসো। এই দশ টাকার নোটখানা তুমি রাখ, যদি কিছু ফেরত দেয় নিয়ে আসবে। কিন্তু কেউ যেন এ কথা জানতে না পারে, বুঝলে।

—বাণেশ্বর কি যেন একটু ভেবে নিয়ে বললে,—কিন্তু মানদা ঝি যদি দেখতে পায়। ও বেটী আবার সন্ধ্যের পর কাপড় কাচতে আসে কিনা।

সরযূ মাথা নেড়ে বললে,—না—না—কাউকে দেখানো চলবে না, খাতাগুলো এনে সোজা একেবারে আমার হাতে পৌঁছে দেবে।

বাণেশ্বর সায় দিয়ে বললে,—ঠিক আছে।

বাণেশ্বরকে বাজারে পাঠিয়ে সরযূ গিয়ে সাবান তোয়ালে নিয়ে স্নানের ঘরে ঢুকলো। আজ তার গা ধুতে চুল বাঁধতে বেশ একটু দেরি হয়ে গেল।

পাঁচ

তরুণ-সঙ্ঘ নিয়ে তৎপর হয়ে উঠেছে ব্যোমকেশ। খাদ সর্দার বামাপদ চাকীর আড্ডায় ক্লাব রীতিমত জমে উঠেছে। সভ্য সংখ্যা বেড়ে চলেছে হু হু ক'রে। একখানা নাটকে আর পার্ট সঙ্কুলান হওয়া সম্ভব নয়, তাই দ্বিতীয় নাটক 'রাবণবধের' পার্ট লেখা শুরু হয়ে গেছে। সামনের কালী পূজায় 'সপ্তরথী' শেষ ক'রে তরুণ সঙ্ঘের পরবর্তী অবদান ওই 'রাবণবধ' নিয়ে আর এক দফা বেশ তোড়জোড় ক'রে লেগে পড়তে হবে। ভূমিকা-লিপি প্রায় স্থির ক'রে ফেলেছে ব্যোমকেশ। শুধু হনুমানের ভূমিকাটি নিয়ে একটুখানি যা সমস্যা দেখা দিয়েছে। পার্টটি খুব সহজ নয়। মনুষ্যোচিত ধ্যানধারণার বাইরে একটুখানি কিষ্কিন্ধ্যার ভাব ফুটিয়ে তুলতে

না পারলে হনুমান চরিত্রে সাফল্য লাভের আশা কম। চলন বলন ভাবভঙ্গী ও প্রবেশ প্রস্থানের মধ্যে হনুমৎ-সুলভ ক্ষিপ্রতা ও সেই সঙ্গে বন্য একটা চুলবুলে ভাব আদ্যন্ত বজায় রেখে অভিনয় ক'রে যেতে হবে, ভূমিকার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত। মাঝে মাঝে নাটকের টেম্পো তুলতে হবে বীরব্যঞ্জক হুঙ্কার ও লম্ফঝম্ফের সাহায্যে। পিলেপটকা লোকের কাজ নয় এ, আবার মেদসর্বস্ব স্থূলকায় গোবর-গণেশ দিয়েও উল্লম্ফনপটু হনুমান চরিত্র প্রকট করা শক্ত। ব্যোমকেশ তাই স্থির ক'রে ফেলেছে স্থানীয় এ্যাথলেটিক ক্লাবের বেস্ট জাম্পার বদন সরকারকে ধরে এনে যেমন ক'রে হোক স্টেজে নামাতে হবে। বদন সরকার নিজেও অবশ্য নাট্যামোদী লোক, ব্যোমকেশের এ প্রস্তাবে সানন্দে সে রাজি হয়েছে। শুধু একটি মাত্র আপত্তি তার। খোলা মুখে হনুমান সেজে দর্শকদের সামনে গিয়ে দাঁড়াতে হবে, এটা যেন তার কেমন কেমন ঠেকছে। তার চেয়ে দাও একখানা হনুমানের মুখোশ পরিয়ে আসল মুখখানা ঢেকে, কেউ যেন চিনতে না পারে। ব্যস্—তাহলেই আর চক্ষুলজ্জার বালাই বলতে কিছু থাকবে না। সেই অবস্থায় পিছন দিকে সাতাশগজী একটা লাঙ্গুল জড়াতে, বা ভেড়ীর চামড়ার কস্টিউম গায়ে দিয়ে অভিনয় করতে কিছুমাত্র আপত্তি নাই বদনের। মোটকথা মুখোশের মধ্যে একটু আত্মগোপন করতে না পারলে খোলাচোখে এগুলো বরদাস্ত করা মুস্কিল। অবশ্য মুখোশ পরার ফালতু একটা সুবিধাও আছে। তৃতীয় অঙ্কে লঙ্কাদাহনের পর মুখ ঘষে ঘষে লেজের আগুন নেভাতে বিশেষ কোন বেগ পেতে হবে না। অতঃপর মুখপোড়া হনুকে দেখে দর্শকরা যদি মনের আনন্দে হাততালি দিয়ে উঠে—সেটা অবশ্য ভাল কথাই, কিন্তু তার জন্য মরীয়া হয়ে পৈত্রিক মুখখানা ত পুড়িয়ে ফেলা চলে না। ব্রহ্মণ্যদেবের প্রকোপ থেকে সর্বাগ্রে ওটাকে বাঁচাতে হবে। কাজেই মুখোশ একখানা নিতান্তই দরকার। ব্যোমকেশও ভেবে চিন্তে শেষ পর্যন্ত স্থির ক'রে ফেলেছে ওই মুখোশ পরিয়েই নামাতে হবে বদন সরকারকে, উপায় নাই। তার মত একজন কলাকসরত বিশারদ কৌশলী ব্যায়ামবীরকে এহেন একটি বিশেষ ভূমিকায় অভিনয় করবার জন্ত হাতের কাছে যে পাওয়া গেছে, এই যথেষ্ট।

বামাপদ চাকী। নেশার ঘোরে একদিন গেয়ে উঠেছিলো,—'আমি সেই পথে যাব সাথে।' সে পথে কিন্তু যায় নি সে। ব্যোমকেশকেই নিজের পথে টেনে এনে হঠাৎ একদিন এক গেলাসের ইয়ার ক'রে ছেড়ে দিলে। অবশ্য সেজন্য ব্যোমকেশ নিজেই খানিকটা দায়ী।

ব্যোমকেশের মনটা সেদিন ভাল ছিলো না। কি যেন একটা তুচ্ছ কারণে নিজের মনেই খানিকটা বিক্ষোভের সৃষ্টি ক'রে ক্রমাগত তাকে অযাচক উত্তাপ দিয়ে ফাঁপিয়ে তুলতে লাগলো। মনের মধ্যে যেন দানা বেঁধে উঠতে লাগলো একটা ইনফিরিয়রিটি কমপ্লেক্স। ব্যোমকেশ কি বড় লোকের বাড়ী বিয়ে ক'রে গোড়াতেই একটু ভুল করেছে! নইলে পদে পদে এমনধারা আঘাত পেতে হয় কেন। আর যত কিছু আঘাত যত কিছু অবহেলা ওই ধনীকন্যা সরযুর কাছ থেকেই। ব্যোমকেশের পক্ষে এটা অসহ্য। মনটা তাই মাঝে মাঝে ফুঁপিয়ে ওঠে, ভিতর থেকে যেন বলে ওঠে,—ধুত্তোর! ওই ধুত্তোর বলেই আজ বাড়া থেকে বেরিয়ে এসেছে ব্যোমকেশ। সরযূকে লক্ষ্য ক'রে শেষ পর্যন্ত তাকে ধিক মেরে বলতেই হলো,—আরে ধুত্তোর, রাখো তোমার ন্যাকামি, তোমার মত মেয়েমানুষের নাচ আমি ঢের দেখেছি।

তা হয়ত হবে। তার জন্য সরযূর কোন অনুযোগ নাই। বহুকষ্টে হাসি চেপে ব্যোমকেশের সামনে থেকে ফাঁকতালে কখন সরে পড়ে সরযূ। ব্যোমকেশ মনে মনে আবার বলে উঠে,—ধুত্তোর।

আসলে কিন্তু ব্যাপারটা এমন কিছু নয়। ধরতে গেলে নিতান্তই তুচ্ছ। সরযূ নাকি ছোট বেলায় গান বাজনার শিক্ষানবিসি আরম্ভ করে সঙ্গীতবিদ্যাবিশারদ এক গৃহশিক্ষকের কাছে। তার কিছুদিন পরেই কোন্ এক নৃত্যপটিয়সী দিদিমণির কাছ থেকে বেশ কিছুটা নাচতে ও নাকি শিখেছিলো। মেয়ে ইস্কুলের অনুষ্ঠানে তিন তিনবার ফার্স্ট প্রাইজের মেডেল পেয়েছিলো সরযূ, গান গেয়ে আর নেচে। বয়স তখন তার কতই বা, বছর বারোর মধ্যে। কিন্তু বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে নাচের দিকটায় ভাটা পড়লো, কৈশোরের প্রায় মাঝামাঝি এসে ও পথটায় কাঁটা পড়লো।

বাপ মা বললেন,—আর না, এখন শুধু বাড়ী বসে যতটুকু পারে গান-বাজনাই শিখুক, নাচটা এবার বাদ দেওয়াই ভালো। সেই থেকেই নাচ একদম বন্ধ।

সরযূর মনের কোণে আজও কিন্তু স্বপ্নের মত জেগে আছে নূপুরের সেই গুঞ্জন। সরযূ কি ইচ্ছে করলে সেই আগের মত নাচতে পারে আজও! ঠিক তেমনি হালকা পায়ের চটুল ছন্দে ময়ূরের মত পেখম তুলে? তা হয়ত বা পারে, কিম্বা হয়ত ভুলেই গেছে দীর্ঘদিনের অনভ্যাসে। আজও কিন্তু আলমারিতে সাজানো আছে তার নূপুরের সেই তোড়া। হাসি পায় সরযূর, ওইগুলো পায়ে দিয়ে আবার কি সে সত্য সত্যই দাঁড়াতে পারে সেই লীলায়িত নাচের ভঙ্গিমায়, গ্রীবাখানা হেলিয়ে, সচকিতা হরিণীর মত! না—না—সে আর হয় না, নিজের মনেই কেমন যেন লজ্জা পেয়ে যায় সরযূর। তার চেয়ে গান, কিম্বা একটুখানি সেতার, সে না হয় কোন রকমে চলতে পারে। কিন্তু এই বয়সে বুক ফুলিয়ে বেণী দুলিয়ে প্রাণখোলা সেই উদ্দাম নৃত্য—এও কি আর সম্ভব! না—সে আর হয় না, দেখলে লোকে বলবে কি! এ সম্বন্ধে সরযূ আর কারো কাছে কোন ধরা-ছোঁয়াই দেয় না। নাচের কথা প্রায় ভুলেই গেছে!

সরযূ হয়ত ভুলে গেছে, কিন্তু এত সহজে ব্যোমকেশ সে কথা ভুলবে কেন। সরযূর নূপুরের তোড়া আর প্রাইজের মেডেলগুলো এখনো সাক্ষ্য দিচ্ছে যে সরযূ শুধু সঙ্গীতপটুই নয়, নৃত্যেও তার রীতিমত দখল আছে। কিন্তু ব্যোমকেশের বরাত, সরযূর নাচ দেখবার সৌভাগ্য তার এ পর্যন্ত হয় নি। ব্যোমকেশ সে কথার উল্লেখ করলেই সঙ্গে সঙ্গে হেসে উড়িয়ে দেয় সরযূ, বলে—আমি আবার নাচ শিখলাম কবে, ও সব বাজে কথা। সে দিন রাত্রে সরযূর সঙ্গে এই নিয়েই একটু বাক-বিতণ্ডা হয়ে গেল ব্যোমকেশের। ঢেউ তার কিছুটা দূর গড়ালো।

রাত তখন অনেকখানি। দক্ষিণের খোলা জানলার ফাঁকে শুক্লা তিথির চাঁদ এসে উঁকি দিচ্ছে। ব্যোমকেশ শুয়ে শুয়ে সরযূর কানে কানে গুন্ গুন্ ক'রে একটা গানের সুর ভাঁজছিলো:—

'এ্যায়সা রাতমে প্রেম লাগানা রস লাগানা সৈঁই।'

রাতটা কিন্তু সত্যই খুব চমৎকার। কি ভালই যে লাগছে ব্যোমকেশের! সরযূকে মাঝে মাঝে একটু ক'রে নাড়া দিচ্ছে, আর গুন্ গুন্ ক'রে গেয়ে চলেছে :—'এ্যায়সা রাতমে প্রেম লাগানা'—

সরযূ কিন্তু জেগেই ছিলো। ব্যোমকেশের গানের পর্দায় সুর মিলিয়ে হঠাৎ পরের কলিটা গেয়ে উঠলো :—

'মিল গিয়ারে প্রাণবঁধুয়া দিল দরাজ হো গেই'।

ব্যোমকেশ যেন উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠলো সরযূর সাড়া পেয়ে। গাইতে গাইতে দু'জনের কণ্ঠ যেন একই সুরে বিলীন হয়ে গেল উদারা আর তারায় মিলে :—

'এ্যায়সা রাতমে প্রেম লাগানা রস লাগানা সৈঁই।
মিল গিয়ারে প্রাণ বঁধুয়া দিল দরাজ হো গেই।'

অপরূপ একখানি দুর্লভ রাত্রি। একেবারে হাতের মুঠোয় যেন ধরা যায়। এ রাত যে প্রেমের রাত, এ রাত যে অফুরন্ত রসের রাত। মনে প্রাণে তাকে আবাহন না ক'রে এমন এক দুর্লভ মুহূর্তে নিঃসাড়ে কি ঘুমিয়ে থাকা চলে। সারাটা রাত আজ জেগে কাটাবে নাকি ব্যোমকেশ? ক্ষতি কি, সরযূ ত পাশেই রয়েছে, জেগে থাকার সঙ্গী। দু'জনে যদি সারাটা রাত আজ গান গেয়েই শুধু কাটিয়ে দেয়, মন্দ কি। শুধু এই একটি মাত্র গান, কিম্বা তার এই একটি মাত্র কলি; একটি রাতের জাগরণী উৎসবকে জাগিয়ে রাখবার জন্য এই একটি কলিই যথেষ্ট :—'এ্যায়সা রাতমে প্রেম লাগানা রস লাগানা সৈঁই'।

দ্বৈত কণ্ঠে জেগে উঠে একি অপূর্ব শিহরণ। বাণী যেন ঢেউয়ের মত দোল খেতে খেতে সুরের বুকে জাগিয়ে চলেছে লীলায়িত নৃত্যের ছন্দ। অলক্ষ্য মঞ্জীরের দূরাগত গুঞ্জন ধ্বনি কানের কাছে যেন সাড়া দিয়ে যায় রুনুঝুনু রুনুঝুনু শব্দে। একে যদি পরিপূর্ণ রূপ দিতে হয়—বাণী আর সুরই শুধু যথেষ্ট নয়, সেই সঙ্গে প্রয়োজন নৃত্যের। এ কাজ কিন্তু সরযূর, এই সঙ্গে সরযূ একটু নাচলে কেমন হয়!

ব্যোমকেশ হঠাৎ শয্যা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো। চুপি চুপি গিয়ে বিজলী বাতির সুইচটা দিলে টিপে। সমস্ত ঘর আলো হ'য়ে উঠলো। শয্যালয়া

অসম্বৃতা সরযূ সচকিতে সারা অঙ্গে বসন টেনে দিলে। ব্যোমকেশ তার হাত ধরে একটা টান দিয়ে বসিয়ে দিলে পালঙ্কের উপর, বললে,—ওঠো, এস্রাজটা আমার বের ক'রে দাও। এই গানের এই সুরের আগুন এস্রাজের তারে তারে আমি ছড়িয়ে দেব ছড়ের বুকে ঝঙ্কার তুলে। কণ্ঠ থাক নীরব হয়ে, মুখর যন্ত্র গেয়ে যাক শুধু একটি মাত্র গানের কলি,—'এ্যায়সা রাতমে প্রেম লাগানা রস লাগানা সৈঁই।' আর তুমি আজ একটু নাচ না, সরযূ!

সরযূ হতবিহ্বল দৃষ্টি মেলে চাইলে একটিবার ব্যোমকেশের দিকে। একি অদ্ভুত খেয়ালী মানুষ, রাত দুপুরে বিছানা থেকে টেনে তুলে হঠাৎ বলে, নাচো!

ব্যোমকেশ এবার পাঁজাকোলা ক'রে সরযূকে দু'হাত দিযে জড়িয়ে নিয়ে দাঁড় করিয়ে দিলে গিয়ে আলমারির সামনে। বললে,—খোল আলমারি, বের কর তোমার নূপুর, আমার সামনে নূপুর পায়ে দিয়ে আজ তোমাকে নাচতেই হবে।

সরযূ অতিশয় বিব্রত হয়ে পড়্লো। আলমারির দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে শশব্যস্তে বলে উঠলো,—নাচ আমি একেবারে ভুলে গেছি, বিশ্বাস করো আমার কথা।

সেই এক উত্তর। ব্যোমকেশের কাছে ও জবাবটা পুরানো হয়ে গেছে। আজ আর কিন্তু ওসব কথা শুনতে চায় না ব্যোমকেশ, সরযূর নাচ তাকে দেখতেই হবে। একটু অনুযোগের সুরে বললে,—আমার সামনে নাচতে এত লজ্জা কিসের বল ত! পা ফেলতে যদি ছন্দ ভুল হয়, দৈবাৎ যদি তাল কেটে যায়? তা হোক—তবু আমি কিছু মনে করবো না, তোমাকে নাচতেই হবে।

কৌতুকময়ী নারী মুখ টিপে টিপে হাসছে। নাচবে নাকি, ছি ছি—তাও কি হয়! ব্যোমকেশের হাত ধরে জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো সরযূ, বললে,—সামনের বাগানে কি সুন্দর ফুল ফুটেছে দেখেছো, চাঁদের আলোয় ঝলমল করছে। ওগুলো কি ফুল বল ত?

ব্যোমকেশ একটু উৎসাহিত হয়ে বলে উঠলো,—শ্বেত রঙ্গন। গোটা কয়েক তুলে এনে খোঁপায় তোমার গুঁজে দেব নাকি নৃত্যের প্রসাধন?

আবার সেই নৃত্য ! সরযূ বাধা দিয়ে বললে,—থাক, এই নিশুতি রাত্রে মাথায় ফুল গুঁজে কেউ প্রসাধন করে না। নাচের কথা ভুলে যাও তুমি, লক্ষীটি ! ও আমি কিছুতেই পারবো না। তার চেয়ে যদি আর কিছু চাও—

ব্যোমকেশের মুখের দিকে চেয়ে আর একটুখানি ঘনিয়ে এসে দাঁড়ালো। এক ঝলক চাঁদের আলো ঠিকরে পড়লো তার মুখের উপর। সরযূর ঠোঁটের কোণে বাঁকা একটা মিষ্টি হাসির আমেজ, চাঁদের আলোয় যেন গলে গলে পড়ছে। টলমল্ করছে যেন অধরের সোনালী পিয়ালায়—কি বলবো, অমৃত মদিরা ? অপাঙ্গে তার একি জাদুকরী মায়া, একদৃষ্টে চেয়ে আছে যেন—কি তাকে বলা যেতে পারে—মূর্তিমতী কামনা ?

কিন্তু এই দিয়েই কি ব্যোমকেশকে আজ ভুলিয়ে রাখতে চায় সরযূ ! ব্যোমকেশকে জাদু ক'রে ফেলতে চায় নাকি ! নাচছে না কেন।

হাঁদারাম ব্যোমকেশ হাঁ ক'রে শুধু চেয়েই রইলো। সরযূর ভঙ্গিটা কিন্তু সত্যিই খুব চমৎকার। ব্যোমকেশ বুঝি মনে মনে একটু তারিফ ক'রেই বলে উঠলো,—তোমার এই মার্ভেলাস পোজ্‌খানি নূপুর দু'ছড়া পায়ে দিয়ে নাচের ভঙ্গিমায় ধরে দিলেই ত পারতে, কি চমৎকার মানাতো বল ত।

সরযূ যেন ঘেমে উঠলো। ব্যোমকেশের কণ্ঠলগ্ন বাহু দু'টি তার শিথিল হয়ে গেল এক মুহূর্তে। সরে দাঁড়ালো সরযূ। তার নারীত্বের অভিমানে বুঝি প্রচণ্ড একটা ঘা পড়লো। ঈষৎ তীক্ষ্ণকণ্ঠে সরযূ বলে উঠলো,—ছিঃ !

ব্যোমকেশের গায়ে কে যেন একটা আলপিন ফুটিয়ে দিলে। সরযূ কি বলতে চায় কি, এর মানে ?

মুখখানা কালি ক'রে সরযূ গিয়ে বালিশের উপর মুখ গুঁজে চুপচাপ শুয়ে পড়লো। ব্যোমকেশের বুঝতে আর বাকি রইলো না যে শ্রীমতী সরযূবালা তার গণ্ডদেশে অলক্ষ্য তার করকমলের কোমল চাঁটির ঘায়ে পাঁচটা আঙুলের ছাপ মেরে দিয়ে চলে গেল। এটা কি একটা স্টাণ্ট, নাকি দেমাক ! কিন্তু ব্যোমকেশের অপরাধটা কি !

হতভম্বের মত চুপচাপ খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলো ব্যোমকেশ। হঠাৎ যেন একটা দমকা হাওয়া এসে আচম্বিতে একটা আছাড় মেরে এক মুহূর্তে

বিপর্যস্ত ক'রে দিয়ে গেল ব্যোমকেশকে। পৃথিবীর চেহারাটা কি বদলে গেল নাকি? তার রূপ রস গন্ধ সবই যেন উবে গেল এক মুহূর্তে! ব্যোমকেশ কি জেগে আছে?

বাইরে কিন্তু পৃথিবীর চেহারা বদলায় নি। যেমন ছিলো ঠিক তেমনি আছে। ব্যোমকেশের মনের বুঝি একটু রঙ পাল্টালো। সরযূর আর সাড়া-শব্দ নাই।

ব্যোমকেশ আর একটিবার খোলা জানলার সামনে গিয়ে দাঁড়ালো, বাইরের দিকে দৃষ্টি মেলে। জমাট-বাঁধা কালো মেঘের ওই পিণ্ডটা চাঁদটাকে হঠাৎ ঢেকে ফেলল কখন। রঙ্গন ফুলের গুচ্ছগুলো অন্ধকারে ঢাকা পড়ে গেছে। ভালই হয়েছে, প্রিয়তমার কবরী সাজাবার জন্য চুপি চুপি ফুল ছিঁড়তে গিয়ে কেউ আর ওদের খুঁজে পাবে না। শিউলি গাছের উপর থেকে হঠাৎ এই অসময়ে একটা পাখী ডেকে উঠলো যেন। কি পাখী ওটা—'পিঁউ কাঁহা', না 'চোখ গেল'? চুলোয় যাকগে, 'পিঁউকাঁহার' ডাক আর শুনতে চায় না ব্যোমকেশ। 'চোখ গেল'র চোখের ব্যথা নিয়ে ব্যোমকেশের মাথা ঘামাবার অবকাশ কোথায়? পাখীটা কিন্তু 'পিউ কাঁহা' নয়, 'চোখ গেল'। ওই যে আবার, চোখ গেল—চোখ গেল! ব্যোমকেশকে কি বিদ্রূপ করতে এসেছে, নাকি এ তার সমবেদনার উচ্ছ্বাস। ওর ওই চোখের জ্বালা, আর ব্যোমকেশের বুকের জ্বালা, দুই যে আজ সমান হয়ে গেল কে কাকে সান্ত্বনা দেবে। যাক গে—মরুক গে ছাই, ও শুনে আর লাভ কি।

ঘরের এক কোণে ছোট্ট একটা চৌকির উপর পুরানো একখানা গালচে পাতা ছিলো। ব্যোমকেশ একটা বালিশ টেনে নিয়ে আলো নিবিয়ে চুপচাপ গিয়ে শুয়ে পড়ল সেই চৌকিটার উপর।

নিস্তব্ধ নিশুতি রাত। ব্যোমকেশের শয়নকক্ষ নিঝুম। চাপা একটা থমথমে ভাব যেন উৎকর্ণ হয়ে আড়ি পেতে মুহূর্ত গুণছে, অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে।

পাশের খাটে আগেই গিয়ে শুয়ে পড়েছে সরযূ। ঘুমিয়ে পড়লো নাকি! খস্ খস্ করে কি যেন একটা শব্দ হচ্ছে, না! শাড়ির আঁচল টানলো বুঝি। টুং টুং চুড়ির আওয়াজ, পাশ ফিরে শুলো হয়ত। উস্ খুস্ করছে নাকি

নিজের মনেই ! ছাই। ঘুমিয়েই পড়লো বুঝি। ঘুমুক, বেশ আরাম ক'রে ঘুমিয়ে নিক আজ হাত পা ছড়িয়ে, গদি-আঁটা ও পালঙ্কের উপর। বহু-ঘাটের-জল-খাওয়া বাউণ্ডুলে ব্যোমকেশচন্দ্রের পক্ষে কম্বল ঢাকা ছোট্ট এই চৌকিখানাই যথেষ্ট। এও হয়ত বেশি দিন আর থাকবে না, এখন থেকেই বেশ টের পাওয়া যাচ্ছে। কি কুক্ষণেই যে নাচের নেশা পেয়ে বসলো আজ ব্যোমকেশকে, বিধাতাই জানেন। কিন্তু একটুখানি নাচলেই কি রাজকন্যের এমন কিছু সম্মানহানি হতো ! রীতিমত এ বেয়াদপি, এতখানি সহ্য করতে ব্যোমকেশ কিন্তু নারাজ। এই অধীনের গলায় বরমাল্য দিয়ে তার সপ্তপুরুষের যেন মাথা কিনে বসে আছেন। থাকো তোমার ওই দেমাক নিয়ে, ব্যোমকেশ শর্মা পরোয়া করে না। দরকার হলে শর্মা এবার এখান থেকে সটকাবে।

একি, অন্ধকারে হঠাৎ গায়ের উপর এসে পড়লো কি একটা ! টিকটিকি নাকি, ঠাণ্ডা লাগছে। না—টিকটিকি ত নয়, এক গোছা রজনীগন্ধা। পালঙ্কের পাশে ফুলদানিতে সাজানো ছিলো, ব্যোমকেশকে তাক ক'রে নিক্ষেপ করা হয়েছে। এ ফুল কিন্তু ফুলশর হয়ে ব্যোমকেশকে আজ বিঁধছে না। পালঙ্কের দিকে পিছন ফিরে শ্রীমান এখন পাশ ফিরে এই শুলো। ফুল ছুঁড়েই মারো, আর মুগুর দিয়েই পেটাও, শর্মা এবার চোখ বুজলো। থাকো সারারাত এই ঘুরঘুট্টি অন্ধকারে একলাটি ঐ খাটের উপর পড়ে। বোঝ একবার ঠেলাটা।

পাশের ঘরের দেওয়াল-ঘড়িতে ঠং ঠং ক'রে দুটো বাজলো। ভাবতে ভাবতে কখন যেন ঘুমিয়ে পড়েছে ব্যোমকেশ, কিছুমাত্র আর মনে নাই। ঘুম ভাঙ্গলো ভোরের দিকে। পায়ের তলায় নরম মত কি যেন একটা ঠেকছে না ! বালিশ নাকি, ব্যোমকেশের পা-টা হঠাৎ বালিশের উপর চাপিয়ে দিলে কে !

ধড়মড়িয়ে উঠে বসলো ব্যোমকেশ। চৌকির এক পাশে ভাঁজ করা বেডকভারের ছোট্ট একটা পুঁটুলি মাথায় দিয়ে সরযূ এসে চুপচাপ কখন শুয়ে পড়েছে। তার গায়ের উপর পা চাপিয়ে ব্যোমকেশ কি এতক্ষণ নিঃসাড়ে

ঘুমিয়ে পড়েছিলো। কি আশ্চর্য। সরযূ হঠাৎ এখানে এসে আবার হানা দিলে কেন!

চৌকি ছেড়ে ধীরে ধীরে উঠে পড়লো ব্যোমকেশ। জানালা বেয়ে উষার আলো উঁকি দিচ্ছে। পিছনের বাগানে রঙ্গন ফুলের গুচ্ছগুলো ধীরে ধীরে আবার জেগে উঠলো নাকি। কিন্তু সেই 'চোখগেল' না 'বুক গেল' কি যেন সেই পাখীটা হঠাৎ গেল কোথায়! ভোরের আলোয় আর কি তাকে খুঁজে পাওয়া যাবে না? বনের পাখী বনবাদাড়ের ঝোপে ঝাড়ে মুখ লুকিয়ে কান্নার আগুন বুকে চেপে মরছে হয়ত কোথাও অন্ধকারে ডানা ঝাপ্টে। চোখ ধাঁধানো রঙিন আলোর উদ্ধত অভিশাপ ও সইবে কেমন ক'রে। ওর চোখে যে বড় ব্যথা।

ছয়

অফিসে গিয়ে আজ তিন তিনটে কলম ভেঙ্গে ফেললে ব্যোমকেশ। নিবগুলো সব একধার থেকে ভোঁতা। ও দিয়ে কি লেখা যায়। অফিস-বয়টা খানিক ধমক-ধামক খেয়ে নিব পাল্টে দিয়ে কোন রকমে সরে পড়লো। কিন্তু নতুন নিবে অসুবিধা কিছু বাড়লো বই কমলো না। কালি এতে ধরতেই চায় না, ধরলেও যায় পিছলে। পাঁচ লিখতে গেলে ফিগার উঠে যায় পঞ্চাশ। শূন্যটাই ফালতু, নিবের ডগার কালি ওটা। কালি পড়ে পড়ে শেষ পর্যন্ত ধ্যাব্ড়া হয়ে উঠলো খাতাখানা। ছত্রিশ জায়গায় ইনিশিয়েল দিয়ে কোন রকমে কাজ সারলে ব্যোমকেশ। মন মেজাজ তিরিক্ষি হয়ে উঠলো। এটা কোম্পানীর অফিস, না কি ভূতের আড্ডা। দোয়াত কলমটা পর্যন্ত ঠিক থাকে না। খাতাখানা এখন দয়া ক'রে বড়বাবুর চোখে না পড়লেই বাঁচোয়া। দেখলেই হয়ত বলে উঠবে—নতুন ক'রে লেখো আবার। এই সমস্ত হাজার রকমের ঝামেলা পুইয়ে চাকরি করা কি

পোষায়! প্রমোশনের নাম গন্ধ নাই, আট ঘণ্টার জায়গায় বারো ঘণ্টা নাকে দম দিয়ে কলম পেষো। এ কোম্পানী কি টেঁকে, ফেল মারতে বড় বেশী আর দেরি নাই, লালবাতি জ্বললো বলে। ব্যোমকেশ কিন্তু বেঁচে যায়। ঘরে বাইরে হাজার রকমের ফ্যাচাং, এ দিগদারি আর ভাল লাগে না।

অফিস থেকে বাড়ী ফিরে জামাকাপড়টা কোন রকমে পাল্‌টে নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে আবার বেরিয়ে পড়লো ব্যোমকেশ। চা পর্যন্ত আজ খেয়ে গেল না। গত রাত্রের ব্যাপারটা কিছুতেই যেন ভুলতে পারছে না। ইচ্ছে করলে অবশ্য ভুলতে এমন কিছু বাধা ছিলো না, কিন্তু একটুখানি ওই যে নির্ভেজাল দাম্পত্য কলহ, বা ওই জাতীয় একটুখানি আকস্মিক মান-অভিমান বা ঈষৎ একটু মন-কষাকষি, ও বস্তুটার আকর্ষণ এত বেশি যে সহজে মানুষ ভুলতে চায় না। বুক দিয়ে তাকে প্রবল বেগে আঁকড়ে ধরাই যেন একমাত্র পুরুষার্থ। মনের মধ্যে কেমন যেন একটা রি রি ভাব, কেমন যেন একটা উহু উহু আস্বাদ ঠিক যেন উটের মুখে কাঁটা গাছ চিবনোর মত। রীতিমত রক্ত ঝরে, জ্বালাও করে যথেষ্ট, তবু যেন মনে হয় এর তুল্য সারবস্তু জগতে বুঝি তুর্লভ। অবশ্য উপমাটা যে বেশ উচ্চাঙ্গের হলো না, তা বুঝতে পারছি। কারণ উট নামক প্রাণী বিশেষের জীবনধারণের পক্ষে কাঁটাগাছ বেশ কিছুটা কাজে লাগে, ওটা তার আহার্য। কিন্তু বিচারবুদ্ধিশীল মানব জাতির পক্ষে দাম্পত্য-কলহ-কেন্দ্রিক তার দ্বিতীয় রিপুটি আহার বিহার কোন কাজেই বিশেষ তেমন সাহায্য করে না। উপরন্তু ও তুটোর রীতিমত বিঘ্ন ঘটায়। তু'টি মনের চকমকি আর নুড়ি পাথরে দৈবাৎ যদি ঘর্ষণের বেগটা একটু মাত্রা ছাড়িয়ে গেল, শুরু হলো অমনি স্ফুলিঙ্গ বর্ষণ, দপ ক'রে হয়ত জ্বলেই উঠলো। ভাবল এইটাই বুঝি চরম, পৃথিবীতে একটা খণ্ড-প্রলয় না ঘটিয়ে এ আগুণ কি আর নিভবে! আসলে কিন্তু ওটা আলেয়ার আগুন, দূর থেকে শুধু চোখ ধাঁধাঁয়, হাত পোড়ে না। উত্তাপটা নিতান্তই মনের, তাই মন কিছুটা পোড়ে, শেষ পর্যন্ত কিন্তু ফোস্‌কা পড়ে না। গুণমাহাত্ম্যে চকমকির ওই ঠোকাঠুকির আগুন পারিবারিক খড়ো চালার নিরাপত্তা সম্পর্কে কিছুটা তুশ্চিন্তার কারণ ঘটালেও এমনটা বড় দেখা যায়

না যে তাই দিয়ে কোথাও বড় রকমের একটা জতুগৃহদাহ হয়ে গেল। বস্তুটাকে তাই মহাজনেরা একেবারেই আমল দেন নি। স্পষ্টই বলেছেন—বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া। শুরুতেই যদি হেসে ওটাকে উড়িয়ে দেওয়া সম্ভব হয়, সেই সব চেয়ে ভাল। বরাতে নেহাৎ দুঃখ থাকলে শেষ পর্যন্ত কেঁদে ভাসানো ছাড়া উপায় কি।

ব্যোমকেশ কিন্তু ভুলেও একটিবার হাসলোও না, কাঁদলোও না। ওই স্ফুলিঙ্গটুকু সম্বল ক'রে নিজের মনেই তাকে ফুঁ দিয়ে দিয়ে ক্রমাগত ফাঁপিয়ে তুলতে লাগলো। মনের এ একটা ব্যাধি। আফিং-এর নেশার মত এই উপসর্গটি যখন পেয়ে বসে মানুষকে, দুনিয়াটাকেই মনে হয় যেন দুশমন, মনটা যেন মরীয়া হয়ে হাওয়ার সঙ্গে পাঞ্জা লড়ে বেড়ায়। ভাবটা যেন যা হোক কিছু একটা ঘটে যাক, এস্পার নয় ওস্পার। এর মধ্যে যে কচিৎ এক-আধটা খণ্ড প্রলয় ঘটেও যায় না, এমন কথা বলা শক্ত। আবার সে দিক দিয়ে বিশেষ সুবিধা না হলেও এর আর একটা মোক্ষম দিক খোলা আছে। বে-পরোয়া বয়ে-যাওয়ার দিক, নিজের সত্তাটাকে ভেঙ্গে চুরে মুঠো মুঠো করে ছড়িয়ে দেওয়ার দিক। আহাম্মকির চরম। নেশার ঘোরে ওই সর্বনাশা ভাঙ্গনের ভূত একবার যদি ঘাড়ে এসে ভর ক'রে বসে, সহজে তাকে বিদেয় করা শক্ত। একটা কিছু অবাঞ্ছিত উৎপাতের সৃষ্টি না ক'রে কোন মতেই আর সরতে চায় না।

এই ভূতে-পাওয়া মনটাকে দিগ্‌দড়ি-ছেঁড়া গরুর মত সারাদিন আজ খেদিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে ব্যোমকেশ। ধরতে গেলেই শিংনাড়া দেয়। তাই নতুন ক'রে গতানুগতিকের খোঁটায় তাকে বাঁধবার চেষ্টা না ক'রে তার পিছু পিছু ভূতের মত ঘুরে বেড়াতে লাগলো। দুনিয়ার উপর ঘেন্না ধরে গেছে ব্যোমকেশের, এই কি একটা জীবন!

তরুণ-সঙ্ঘের আড্ডায় গিয়ে থমকে একটু দাঁড়ালো ব্যোমকেশ। ক্লাব ঘর এখনো খোলা হয় নি। যাক, সে এক রকম ভালই হয়েছে। ক্লাবঘরে বসে আরো ভূতের সঙ্গে আড্ডা দিয়ে হুল্লোড় করবার মত আজ আর তার মনের অবস্থা নাই। চুলোয় যাক গে তরুণ-সঙ্ঘ, একে একে এখানকার মায়া এবার কাটাতে হবে ব্যোমকেশকে।

বামাপদ বাড়ী ফিরলো নাকি ? তার মত একজন বন্ধু লোকের সঙ্গ পেলে মনটা হয়ত কিছু জুড়োতেও পারে। এগিয়ে গেল ব্যোমকেশ। বামাপদর সদর দোরে গিয়ে বার থেকে ঠেলা দিতেই দরজাটা খুলে গেল। অন্দরের মাঝের ঘর থেকে উঁকি মারছে বামাপদ। ব্যোমকেশকে দেখেই তাড়াতাড়ি চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লো। একমুখ হাসি টেনে বললে,—একি, অসময়ে হঠাৎ চাঁদ উঠলো কেন, আজ এত সকাল সকাল যে !

ব্যোমকেশ গিয়ে একটা তাকিয়া ঠেস দিয়ে আরাম ক'রে বসে পড়লো চৌকির উপর। বামাপদ সবে কয়লা খাদ থেকে ফিরেছে, জামাকাপড়টা পর্যন্ত বদলায় নি এখনো। খাকী রঙের হাফ প্যাণ্ট আর মিলিটারি হাফ সার্টের প্রায় অর্দ্ধেকটা জুড়ে আণ্ডার গ্রাউণ্ডের কালির ছাপ, পাতালপুরীর কালো মানিকের সঙ্গে কোলাকুলির চিহ্ন ওটা। দেহের অনাবৃত অংশগুলোও কয়লার গুঁড়োয় মলিন হয়ে আছে। মুখখানা শুধু বাদ, খাদ থেকে ফিরবার পথে মুখটা হয়ত কলের জলে ধুয়ে এসেছে। সারা দেহের মালিন্যকে ছাপিয়ে চকচকে ওই পরিচ্ছন্ন মুখখানাই জানিয়ে দিচ্ছে যে সর্দারী ইউনিফর্ম পরা ওই খাদবাবুটি শুধু কালিঝুলি মাখা জনৈক খাদকর্মীই নন, ইনিই স্বয়ং বামাপদ চাকী। দেহে মনে কিছুটা ক্লান্তির ছাপ, খাদের কাজে খাটুনি একটু আছে বৈকি। তাই খাদ থেকে ফিরে এসেই ক্লান্তি অপনোদনের ব্যবস্থাটা সত্ত সত্তই ক'রে ফেলেছে বামাপদ। টেবিলের উপর মদের বোতল খোলা। একটা শালপাতার ঠোঙ্গায় গোটা কয়েক পেঁয়াজ বড়া পড়ে আছে এক পাশে।

অসময়ে এই অপ্রস্তুত অবস্থায় ব্যোমকেশের আকস্মিক আবির্ভাবে বামাপদর হয়ত একটু লজ্জা পাওয়া উচিত ছিলো, কিন্তু সে দুর্লক্ষণ কিছুমাত্র দেখা গেল না। কয়েকদিন মাত্র আগে এই ব্যোমকেশের সামনে জানলা গলিয়ে সত্য সত্যই মদের বোতলটা ছুঁড়ে ফেলেছিলো বামাপদ, কথা দিয়েছিলো ইহজীবনে ও বস্তুটি আর স্পর্শ করবে না। স্পষ্টই আজ বোঝা গেল ব্যোমকেশকে সেদিন নিছক একটা ভাঁওতা দিয়েছে বামাপদ। ব্যোমকেশ কিন্তু তার জন্য কিছুমাত্র বিস্মিত হলে না, বিক্ষুব্ধও হলো না,

ঠেস দিয়ে নির্বিকার বসে রইলো চৌকির উপর ; টেবিলটার দিকে উদাস একটা দৃষ্টি মেলে। বামাপদ গিয়ে ব্যোমকেশের পাশে বসলো। মদের বোতলটা খোলাই আছে হাতের কাছে। বামাপদ একটু মুচকি হেসে বললে,—মদ খাওয়া আমি সত্যি সত্যি ছাড়ি নি বন্ধু, বহু দিনের অভ্যাস—তাই মায়া কাটাতে কষ্ট হয়। কিছু মনে করলি নাকি !

কিছু মনে করবার মত কোন লক্ষণই কিন্তু দেখা গেল না ব্যোমকেশের মধ্যে। শুধু বামাপদের মুখের দিকে চাইলে একটিবার, বললে—খেতে খেতে হঠাৎ থামলি কেন, চালা।

বামাপদর মনটা ইস্তক চালাই-চালাই হয়েই ছিলো। ব্যোমকেশের দিক থেকে কোন বিরূপতার লক্ষণ না দেখে খুশীই হলো একটুখানি। টেবিলের উপর থেকে বোতলটা টেনে নিয়ে কাচের গেলাসে ঢালতে ঢালতে হেসে বললে,—তাহলে একটু চালাই, কি বল্ ! সারাটা দিন খাটনির পর দু'এক পাত্তর পেটে না পড়লে শরীরটা যেন আর বইতে চায় না। ঠিক এই সময়টি হলেই—

গেলাস-ভরতি পানীয়টুকু সঙ্গে সঙ্গে গলাধকরণ ক'রে ফেললে বামাপদ। আর একপাত্র ঢালতে ঢালতে ব্যোমকেশের দিকে চেয়ে আবার বলে উঠলো,—ওকি, পকেটে হাত ঢুকিয়ে রুমাল খুঁজছিস নাকি ! কিন্তু এতবড় একটা গণ্যমান্য অতিথির সামনে এতখানি বেয়াদপি ত করতে পারি না, বন্ধু ! এখন তাহলে বন্ধ করি, কি বল্।

ব্যোমকেশ একটু হেসে বললো,—সে কথা আমি ভাবছি না, আমি শুধু ভাবছি এর আনন্দটা কোথায়, নেশা ক'রে মাতাল হয়ে কি সুখটা পায় মানুষ।

বামাপদ একটু ঘোরের উপর বলে চললো,—সুখের কথা ঠিক জানি না বন্ধু, তবে দুঃখের মুখে ঝাড়ু মারতে শক্তি যে এর অসীম, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। মাতাল আমি চিরটা কাল ছিলাম না ব্যোমকেশ। কতখানি জ্বালায় জ্বলে, কি এক যে দুঃখের আগুনে দগ্ধে শেষ পর্যন্ত আমি মাতাল হতে বাধ্য হয়েছি সে একটা দুঃস্বপ্নের ইতিহাস। থাক—ও আর ঘাঁটিয়ে

কোন লাভ নেই। এখন শুধু নেশা, এই নেশাই আমায় কোন রকমে বাঁচিয়ে রেখেছে!

ডবল মাত্রায় আর এক পাত্র সঙ্গে সঙ্গে গলধকরণ ক'রে ফেললে বামাপদ। ব্যোমকেশ একটু বিস্মিত হয়ে বললে,—সে কি, তোর আবার দুঃস্বপ্নটা কিসের ; ব্যাপার কি বল্ ত!

বামাপদ কাচের গেলাসটা টেবিলের উপর নামিয়ে রেখে বললে,— ব্যাপারটা নিতান্তই ব্যক্তিগত পারিবারিক একটা কাহিনীর টুকরো। সে এক দুঃসহ লজ্জার কথা বন্ধু! শোন্ তাহলে, খুলেই বলি। বয়স তখন আমার একেবারে তারুণ্যের কোঠায়। জীবনের সেই নতুন জোয়ারে নতুন প্রেমের ময়ূরপঙ্খী বেয়ে ভিড়লাম গিয়ে একদিন নতুন দেশের এক রাজকন্যার ঘাটে। কুঁচবরণ কন্যা, তার মেঘবরণ চুল। মেয়েটিকে হঠাৎ ভালবেসে ফেললাম।

ব্যোমকেশ একটু উৎসাহিত হয়ে বললে,—ভালবেসে ফেললি, সে ত খুব ভাল কথা, রীতিমত একটা রোমান্টিক খবর। কিন্তু কে—কে সেই নতুন দেশের রাজকন্যাটি, বলতে কোন বাধা আছে?

বামাপদ জবাব দিলে, সে একটা জীবন্ত দুঃস্বপ্ন, আগেই ত বলেছি। কিন্তু তবু তাকে ভালবেসেছিলাম। ভাল না বেসে আমার উপায় ছিলো না, আমারই সে বিয়েকরা বৌ।

ব্যোমকেশ বিস্মিত হয়ে বললে,—বিয়ে-করা বৌ! তা নিজের বৌকে ভালবাসবি, এ আর এমন দুঃস্বপ্ন কি হলো।

বামাপদ মদের গেলাসটা টেবিলের উপর থেকে আর এক দফা টেনে নিয়ে বললে,—সবটা আগে শোন, মন্তব্য পরে। তাকে বিয়ে ক'রে প্রথম যেদিন একসঙ্গে এসে বাড়ী ঢুকলাম, সে একটা স্মরণীয় দিন। পরম রূপলাবণ্যময়ী কুঞ্চিত কেশদামা অনবদ্যাঙ্গী এক অষ্টাদশী তরুণী—নাম তার মায়া। তার রূপের শিখায় আমি পতঙ্গের মত ঝাঁপিয়ে পড়লাম। আমি মুগ্ধ হয়ে গেলাম একেবারে সেই ছাঁদনাতলায়, প্রথম সেই শুভদৃষ্টির কালমুহূর্তে। ভাবলাম এতবড় সৌভাগ্য আর বুঝি কারো হয় না। আমার সেই সৌভাগ্যের প্রদীপখানি আঁচল দিয়ে আড়াল ক'রে গৃহলক্ষ্মী এসে গৃহপ্রবেশ করলেন এক

চরমতম শুভলগ্নে। আমি ধন্য হয়ে গেলাম মায়ার মত জীবনসঙ্গিনী পেয়ে। কি ভালই যে বাসলাম তাকে, জানেন আমার অন্তর্যামী। কিন্তু আমার সে প্রাণঢালা ভালবাসা শেষ পর্যন্ত সে গ্রহণ করলে না।

সচকিতে বলে উঠলো ব্যোমকেশ,—সেকি, নিজের বিয়ে করা বৌ, ভালবাসা গ্রহণ না ক'রে সে যাবে কোথায়!

বামাপদ সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলো,—যেখানে তার মন বাঁধা আছে, যেখানে গেলে নতুন ক'রে আর জাহান্নামের পথ খুঁজতে হয় না।

হকচকিয়ে উঠলো যেন ব্যোমকেশ। বামাপদ বলে চললো,—শোন বন্ধু, কথাটা যখন উঠেই পড়লো—এর শেষটুকু আর গোপন রাখতে চাই না। বিশেষ ক'রে তোমার মত একজন অভিন্নহৃদয় বন্ধুর কাছে। সেও হয়ত আমায় ভালবাসে, প্রথম প্রথম এই ছিলো আমার ধারণা। কথাবার্তায় ব্যবহারে কিছুমাত্র ব্যতিক্রম লক্ষ্য করি নি। স্বপ্নেও সেদিন ভাবতে পারি নি যে মায়ার মত মেয়ে কোন দিন আমায় বঞ্চনা করতে পারে। লক্ষণটা কিছু কিছু প্রকাশ পেতে লাগলো একসঙ্গে কিছুদিন ঘরকন্না করার পর।

—কি জাতীয় লক্ষণ, ঝগড়াঝাঁটি শুরু করলো নাকি।

—না—না—ঝগড়া করবার মেয়েই নয় সে। হঠাৎ লক্ষ্য করলাম কেমন যেন একটা নির্লিপ্ত ভাব। আমাকে যেন ক্রমশই এড়িয়ে যেতে লাগলো। অবশ্য তার পক্ষে সে অবস্থায় যতটুকু সম্ভব! যেন একটু সরে গিয়ে দাঁড়াতে চায় তার বধূত্বের সীমারেখার বাইরে। তার মনখানাকে ঠিক আগের মত আর ধরা-ছোঁয়া যায় না। আমি অবাক হয়ে গেলাম মায়ার এই আকস্মিক ভাবান্তর লক্ষ্য ক'রে। আপ্রাণ চেষ্টা করলাম আমার সব কিছুর বিনিময়ে তার মানসিক প্রশান্তিটুকু ফিরিয়ে আনতে। আমার মনের সোনার খাঁচায় মিনে করা সোনার দাঁড়ে ওই চিত্তহারিণী হীরামনকে বাঁধতে। কিন্তু পাখী একদিন শিকলি কাটলো, ওই মিনেকরা সোনার দাঁড়ে আর বসলোই না।

ব্যোমকেশ রীতিমত উত্তেজিত হয়ে বলল,—শিকলি কাটলো মানে, একেবারেই ভাগলো নাকি!

বামাপদ জবাব দিলে,—ঠিক তাই। খেয়ালের বশে হঠাৎ একদিন জোর ক'রে বাপের বাড়ী চলে গেল, কারো অনুমতির অপেক্ষা পর্যন্ত না রেখে। যাবার সময় কি বলে গেল জানিস, বললে—এ অজ পাড়াগাঁয়ে আমার মন টেঁকছে না, বাইরে একটু ঘুরে আসতে চাই।

ব্যোমকেশ রাগতভাবে বললে,—আর তুই অমনি আহাম্মকের মত সঙ্গে সঙ্গে তাকে ছেড়ে দিলি বুঝি। জোর ক'রে ধরে রাখতে পারলি না।

গম্ভীরভাবে জবাব দিলে বামাপদ,—জোর ক'রে শুধু দেহটাকেই ধরা যায় বন্ধু, মনটাকে তার ধরবো কি দিয়ে। ধিক মেরে তাই ছেড়ে দিলাম, চুলোয় যাকগে। বাপের বাড়ীর দুলালী বাপ-মায়ের আদরের দোলনায় আরাম ক'রে দিন কয়েক দোল খেয়ে আসুক। নিজ থেকেই আবার হুমড়ি খেয়ে পায়ের উপর এসে লুটিয়ে পড়তে পথ পাবে না। আমার সে ধারণা কিন্তু একেবারে মিথ্যে হয়ে গেল, মায়া দেবী আর ফিরলেন না।

ব্যোমকেশ তাড়াতাড়ি বলে উঠলো,—ফিরলো না মানে, তুই নিজে গিয়ে তার চুলের মুঠি ধরে হিড় হিড় ক'রে টেনে আনতে পারলি না!

বামাপদ জবাব দিলে,—সেখানে আমায় শেষ পর্যন্ত যেতেই হলো, বন্ধু! কিন্তু মায়া দেবীকে হিড় হিড় ক'রে টেনে আনা আর সম্ভব হলো না, নিজেরই এই পৈত্রিক মুখখানায় বেশ খানিকটা চুনকালি মেখে বাড়ী ফিরতে হলো।

অধৈর্য হয়ে উঠলো ব্যোমকেশ,—হেঁয়ালি রাখ বামাপদ, মায়া তোকে শেষ পর্যন্ত কি বললে তাই খুলে বল্।

হতাশ হয়ে বললে বামাপদ,—তাকে আর খুঁজেই পাওয়া গেল না, ঠিক তার আগের দিন গভীর রাত্রে বাপের বাড়ী থেকে সটকেছে।

তড়িতাহত ব্যোমকেশ বিস্ময়-বিস্ফারিত চোখ দুটো মিলে বামাপদর দিকে শুধু তাকালো একবার। বামাপদর কণ্ঠস্বর শুকিয়ে যেন কাঠ হয়ে গেছে, কেমন এক রকম সুর টেনে বলে চললো,—সেখানকার এক বর্দ্ধিষ্ণু জমিদার, তারই এক অকালকুষ্মাণ্ড নামকরা এক বখাটে ছেলে। মায়া কিনা সেই লম্পটটার সঙ্গে গৃহত্যাগ ক'রে বেমালুম একেবারে হাওয়া হয়ে গেল!

চমকে উঠলো ব্যোমকেশ। বামাপদ বললে,—সেই কালামুখী কালনাগিনীকে আমি চিনতে পারি নি বন্ধু, স্বপ্নেও কোনদিন ভাবতে পারি নি যে বিয়ের আগেই অপর একজনকে সে আত্মদান করেছে।

চাপাগলায় চীৎকার ক'রে বলে উঠলো ব্যোমকেশ,—বামাপদ—বামাপদ, এ তুই কি বলছিস!

বামাপদ যেন মরীয়া হয়ে বলে চললো,—মাতালের মত টলতে টলতে কোন রকমে সেখান থেকে বেরিয়ে এলাম। বাড়ী ফিরে দেখি বৌমায়ের শোকে মা আমার শয্যা নিয়েছেন। চাকীবংশের এত বড় একটা কলঙ্ক—এতখানি অসম্মান—মা কিন্তু সইতে পারলেন না। মাসখানেকের মধ্যেই—

ব্যোমকেশ আর্তকণ্ঠে বলে উঠলো,—থাক্—থাক্—ও আর আমি শুনতে চাই না বামাপদ, বন্ধ কর তোর ওই দুঃস্বপ্নের কাহিনী।

বন্ধ করবে কেমন ক'রে বামাপদ, কাহিনীটা যে এখনও শেষ হয় নি। জের টেনে বললে,—মাসখানেকের মধ্যেই হঠাৎ একদিন হার্টফেল ক'রে মা আমার ইহজগত থেকে বিদেয় হয়ে গেলেন। বাড়ী-ঘরে তালা বন্ধ ক'রে পাগলের মত আমি ছুটে বেরুলাম রাস্তায়, পথে পথে শুধু ভূতের মত ঘুরে বেড়াতে লাগলাম। উঃ—সে কি এক অসহনীয় অবস্থা! ব্যোমকেশ, ব্যোমকেশ, আমার গেলাস? মদের গেলাটা আমার গেল কোথায়!

কি এক অব্যক্ত বেদনার ভারে বামাপদ যেন নুয়ে পড়লো। তাড়াতাড়ি কাচের গেলাসটা তুলে নিয়ে ব্যোমকেশের দিকে হাত বাড়িয়ে ঈষৎ মিনতির স্বরে বললে,—বোতলটা একটু কাত ক'রে একটুখানি ঢেলে দাও না, বন্ধু!

ব্যোমকেশ টেবিলের উপর থেকে মদের বোতলটা তুলে নিয়ে বামাপদের পানপাত্রে ঢেলে দিতে লাগলো, বললে,—এবার তুই একটু শান্ত হ বামাপদ, দরকার হয় আরও মদ খা—তোর যতখানা খুশি, ওটা কিন্তু এবার ভুলতে চেষ্টা কর্।

বামাপদ পানপাত্রে চুমুক দিয়ে বললে, ভয় নাই বন্ধু, ও বিষ আমি হজম ক'রে ফেলেছি আমার চোখে মায়া দেবী আজ মরে একদম ভূত হয়ে

গেছে। ভূত নয়, শাঁকচুন্নী। মাঝে মাঝে দপ্ দপ্ ক'রে জ্বলে। তুই দেখেছিস নাকি, শাঁকচুন্নী দেখেছিস কখনো?

এ আবার কি উদ্ভট প্রশ্ন। শাঁকচুন্নী আবার কেউ দেখে নাকি! বামাপদ একেবারে মাতাল হয়ে গেছে।

মাতাল কিন্তু আবার সজাগ হয়ে উঠলো। বললে,—এই যখন আমার মনের অবস্থা, আমি যেদিন শুধু পাগল হতেই বাকি, ঠিক সেই সময়ে কেমন ক'রে জানি না হঠাৎ একদিন আলাপ হয়ে গেল এই সুষমাদেবীর সঙ্গে। আলাপ ক্রমশ জমতে জমতে একেবারে ঘনীভূত প্রেম; আর সেই প্রেমের ঠেলায় অস্থির হয়ে আমার এই নতুন প্রিয়াটি বেওয়ারিশ এই শিকারটিকে বেমালুম একেবারে হজম ক'রে ফেললেন। আমি কিন্তু বেঁচে গেলাম বন্ধু, সেই কালস্মৃতির বিষের দাহ থেকে আমি যেন রেহাই পেয়ে গেলাম। এই আমায় বাঁচিয়েছে, এই লাল সিরাজির নেশা। মদ নয়, মৃতসঞ্জীবনী।"

বামাপদ পানপাত্র পূর্ণ ক'রেই চলেছে। ব্যোমকেশের চাপা একটা দীর্ঘশ্বাস তার অজ্ঞাতেই বুঝি ঝরে পড়লো বাতাসের বুকে। বামাপদ নেশার ঘোরে শুরু করলে,—নিজের মনেই হাসি পায়। নির্বোধ সেই মায়া বলে মেয়েটির অশরীরী প্রেতাত্মা মাঝে মাঝে এসে চোখের সামনে যেন ভেসে উঠে। করুণ সুরে ইনিয়ে বিনিয়ে বলতে থাকে,—ওগো আমায় ভুলো না, তোমার মন থেকে আমায় শেয়াল-কুকুরের মত দূর দূর ক'রে তাড়িয়ে দিয়ো না। এ জীবনে তোমার শয্যাসঙ্গিনী আর যদি কভু না-ও হতে পারি, মনের কোণে একটুখানি ঠাঁই দিয়ো। শুনি আর হাসি, আমার 'ওগো বধূ সুন্দরী'র আদিখ্যেতার বহর দেখে আর হেসে বাঁচি না।

উৎকট একটা হাসির আমেজে ফেটে পড়লো বামাপদ। ব্যোমকেশ একটু অবাক হয়ে বললে,—এর পরেও তোর হাসি পায়, আশ্চর্য!

বামাপদ জবাব দিলে,—মাঝে মাঝে একটু প্রাণ খুলে হাসতে পারি বলেই আজও কোন রকমে বেঁচে আছি বন্ধু! নৈলে হয়ত কোন দিন মনের দুঃখে পাগল হয়ে যেতাম।

কিছুক্ষণ থেকে ব্যোমকেশ যেন কি ভাবছে। হঠাৎ একটু জোর দিয়েই বলে উঠলো,—ওরা পারে, আঘাত দিতে ওরা ভালই পারে। কিন্তু আমরা এতখানা সইবো কেন, এ আর আমরা সইবো না বামাপদ, কিছুতেই সইবো না। কিন্তু কি যেন একটা বলছিলি না, তোর ওই লাল সিরাজির নেশা— সত্যই কি ও মৃত-সঞ্জীবনী? একপাত্র আমায় দিতে পার বন্ধু!

ব্যোমকেশ নিজের হাতেই বোতলটা হঠাৎ টেনে নিয়ে কাচের গেলাসে মদ ঢালতে লাগলো। বামাপদ বিস্মিত হয়ে বলে উঠলো,—সে কিরে, তোর আবার হলোটা কি, মদ খাবি কোন্ দুঃখে!

ব্যোমকেশ বললে, বাধা দিয়ো না বন্ধু, আজ আমি তোমার সমবেদনার সাকরেদ। তোমার এই অভিনব আবিষ্কার সঞ্জীবনী সুধা একটুখানি না খেয়ে কি পারি।

গেলাসটা ভরতি ক'রে ঠোঁটের কাছে তুলে ধরলে ব্যোমকেশ। কি উগ্র গন্ধ। তাড়াতাড়ি মুখের মধ্যে ঢেলে দিলে খানিকটা মুখখানা একটু বিকৃত ক'রে বলে উঠলো,—আঃ—এ যে বিষ, গলাটা একেবারে জলে পুড়ে গেল যে।

বামাপদ সোডার বোতল খুলে ব্যোমকেশের গেলাসের মধ্যে ঢেলে দিলে খানিকটা। বললে—এতখানা 'র' কি তোর ধাতে পোষায়।

ব্যোমকেশ বাঁ হাত দিয়ে কোনরকমে নাক চাপা দিয়ে বাকীটুকু গলার মধ্যে ঢেলে দিলে। কিন্তু এ-ও ত কিছু কম কড়া নয়, ব্যোমকেশের বুকটা যেন জালিয়ে দিলে। এই ছাইভস্ম মানুষ খায় কেমন করে।

খানিকটা মশলা মুখে দিয়ে তাড়াতাড়ি একটা সিগারেট ধরালে ব্যোমকেশ। মাথাটা যেন ঘুরছে। বোতলের অবশিষ্টটুকু এক নিঃশ্বাসে সাবাড় ক'রে দিলে বামাপদ। তারপর সে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালো। বললে,—জামাকাপড় ছেড়ে ফেলি। মুখ হাত ধুয়ে একটু ভদ্রস্থ হয়ে এবার আড্ডায় গিয়ে বসতে হবে ত, অন্ধকার হয়ে এলো যে।

সদর দোরটা একটুখানি ঠেলে বেহালাদার হাজারিদা উঁকি দিচ্ছেন। একটা হাঁক দিয়ে বললেন,—চাকী ভায়া বাড়ী আছ নাকি, ক্লাবঘরটা একটু খুলবে?

বামাপদ দূর থেকেই সাড়া দিলে,—এই যে দাদা আসি, ফিরতে আজ একটু দেরি হয়ে গেছে কিনা, তাই এখনো তৈরি হতে পারি নি।

ভিতর দিক থেকে গিয়ে বৈঠকখানার দরজাটা খুলে দিলে বামাপদ। হাজারিদা এসে বেহালাখানা বাগিয়ে বসলেন। পিছু পিছু তাঁর আরও কয়েকজন জমলো এসে। বামাপদ চট-চাটাইয়ের ব্যবস্থা ক'রে যন্ত্রপাতিগুলো সাজিয়ে দিয়ে বললে,—আসছি আমি, চালান আপনারা ততক্ষণ।

হাজারিদার বেহালায় টুং টাং শুরু হলো। বামাপদ ফিরে এসে দেখে ব্যোমকেশ চিৎপাত হয়ে শুয়ে পড়েছে চৌকির উপর। নিজের মনেই গুন্ গুন্ করে একটা গান ধরেছে, চুটকি একটা সিনেমার গান। বামাপদ মুখ হাত ধুয়ে জামা কাপড়টা বদলে ফেল্লে। ব্যোমকেশকে একটা ঠেলা দিয়ে বললে,—ওঠ,—তাড়াতাড়ি বাড়ী চলে যা, তোর রীতিমত নেশা ধরে আসছে।

ধড়মড়িয়ে ওঠে বসলো ব্যোমকেশ। ফ্যাল্ ফ্যাল্ ক'রে কিছুক্ষণ চেয়ে রইলো বামাপদর দিকে। তার পর হাসতে হাসতে আবার গড়িয়ে পড়লো চৌকির উপর। বামাপদ হাত ধরে টেনে তুললে ব্যোমকেশকে বললে,—সোজা একেবারে বাড়ী চলে যা। বাড়ী গিয়ে টেনে একটি ঘুম, বুঝলি।

ব্যোমকেশ চৌকি ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো, বললে,—আমার সাইকেলটা? সাইকেল চড়ে বাড়ী ফিরতে পারবো ত!

বামাপদ বললে,—দরকার নাই, থাক ওটা। সকালবেলা আমি পৌঁছে দিয়ে আসবো।

ব্যোমকেশের হাত ধরে সদর দোর পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে এলো বামাপদ। ক্লাব ঘরের সামনে দিয়ে না গিয়ে বাড়ীর পিছন দিকের একটা সুঁড়িপথ ধরিয়ে দিয়ে বললে,—এই পথ দিয়ে চলে যা, সোজা গিয়ে বড় রাস্তায় উঠবি। বাড়ী গিয়ে যেন মাতলামি করিস না, খবরদার।

ব্যোমকেশ একটু স্বর টেনে বললে,—মাতাল আমি হই নি বন্ধু, ঠিকই আছি। কিন্তু কি চমৎকার যে লাগছে তোমার ওই লাল সিরাজির নেশা, সে আমি তোমায় বোঝাতে পারবো না।

বামাপদ বলে উঠলো,—বুঝবার আমার দরকার নাই বাবা, তুই এবার বাড়ী যা দেখি।

বাড়ী আবার যেতে হবে নাকি ব্যোমকেশকে! যেতেই হবে, উপায় নাই। এই বে-এক্তিয়ার অবস্থায় আড্ডায় বসে ত আর বেল্লিকপনা করা চলে না। বাড়ী ব্যোমকেশকে যেতেই হবে। বামাপদ ঠিকই বলেছে।

অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে সুড়ি পথ ধরে এগিয়ে চললো ব্যোমকেশ। ক্লাবঘরের পিছন দিকের জানলাটা খোলা। আলো ছিটকে বেরুচ্ছে। দূর থেকে একবার তাকালো ব্যোমকেশ। থমকে একটু দাঁড়ালো। নিজের মনেই বিড় বিড় ক'রে বকতে বকতে আবার হাঁটতে আরম্ভ করল। বামাপদ কি এর মধ্যেই আড্ডায় গিয়ে বসে গেল নাকি! তা ও পারে। পরম যোগী সিদ্ধপুরুষ বামাপদ ছদ্মবেশী পরমহংস, ওর অসাধ্য কোন কাজ নাই। কি অমানুষিক সহ্যগুণ লোকটার! প্রণাম করতে ইচ্ছে হয়, কাল একসময় এসে বামাপদর দু'টো পায়ের ধুলো নিয়ে যাবে নাকি ব্যোমকেশ! ধুলো নয়, শ্মশানের চিতাভস্ম, নীলকণ্ঠের অঙ্গবিভূতি। এ কি, পিছন দিক থেকে কি যেন একটা ধাক্কা দিলে না!

অন্ধকারে একটা হোঁচট খেলে ব্যোমকেশ। নেশার ঘোরে পা টলছে নাকি! না—না ওটা মনের ভুল, ব্যোমকেশ কি নেশা করে মাতাল হতে পারে!

পলাশবনের সুড়ি পথ ধরে এগিয়ে যাচ্ছে ব্যোমকেশ। বামাপদর আড্ডায় হাজারিদার বেহালাটা হঠাৎ করুণসুরে কান্না জুড়ল কেন। না—না ও ত কান্না নয়, মহাশ্মশানের ভৈরবকে ঘিরে ডাকিনী-যোগিনীর অট্টহাস। সতী-হারা বামাপদ রাতারাতি শিব হয়ে গেল যে। ও আবার কি, কোথায় যেন তবলা বাজছে না?

থমকে আবার দাঁড়ালো ব্যোমকেশ। দূর থেকে তার কানে এসে ঘা দিচ্ছে বামাপদর তবলার চাঁটি। বেহালাটা বেহাগের সুর পাল্টে টপ্পা ধরলে কেন হঠাৎ! বাইজীর নাচ হবে নাকি বামাপদর আড্ডায়। কিন্তু ব্যোমকেশকে ত আজ ডাকা হয় নি। ঐ যে রুমুঝুমু নূপুরের শব্দ, বাইজীর নাচ বুঝি শুরু হয়ে

গেল। কিন্তু কে ওই রূপবিলাসিনী রূপসী, কামকেলিচতুরা ছলনাময়ী নারী? নীল ওড়নায় মুখ ঢেকে বামাপদর আড্ডায় আজ মুজরো করতে এসেছে, কে ও? কি সর্বনাশ—ওষে মায়া, বামাপদর সেই বিয়ে-করা বৌ। বামাপদ কি চিনতে পারে নি! আরে ছিছি ছিছি—ওই কালামুখী কলঙ্কিনীর নূপুরের তালে তালে তুই আবার তবলা পিটছিস কোন লজ্জায়।

হঠাৎ একটা শালগাছের গুঁড়ির সঙ্গে সামনা সামনি গিয়ে ধাক্কা খেলে ব্যোমকেশ। কপালের ডান দিকটায় একেবারে রগ ঘেঁষে বেশ একটু চোট লাগলো। রক্ত ঝরছে নাকি? পকেট থেকে রুমাল বের ক'রে মুখটা একটু মুছে নিলে ব্যোমকেশ। পাওয়ার-হাউসের চিমনির পাশ দিয়ে চাঁদ উঠছে নাকি? সেকি ইনি আবার কোন্ গগনের চাঁদ! ব্যোমকেশ কি পথ ভুলে এদিকে এসে পড়েছে? পলাশবাগান পার হয়ে শালবীথির মাঝখানটায় আব্ছা আলো অন্ধকারে দাঁড়িয়ে ব্যোমকেশ হঠাৎ নিজের মনেই চীৎকার ক'রে উঠলো,—বামাপদ! বামাপদ! পথ ভুলিয়ে আমায় তেপান্তরে এনে এখানে কোথায় ছেড়ে দিয়ে গেলি রাস্কেল।

বামাপদর তবলার চাঁটির আওয়াজ ভেদ করে ব্যোমকেশের ওই উদ্‌ভ্রান্ত প্রলাপ সেখান পর্যন্ত পৌঁছলো কিনা ঠিক বোঝা গেল না।

সাত

যে দুঃখে পড়ে বামাপদ একদিন নেশা ধরেছিলো, মানুষের জীবনে সে যে একটা চরমতম বিপর্যয় সে বিষয়ে সন্দেহ কি। কিন্তু জীবনব্যাপী দুঃখ বেদনা বিপর্যয়ের অনিবার্য আঘাতকে ঠেকাবার জন্য নেশা করাই যদি একমাত্র মোক্ষম পন্থা বলে কোনরকমে একবার প্রমাণ হয়ে যেতো, তাহলে হয়ত সারা দুনিয়াটাই রাতারাতি হয়ে উঠতো একটা বিরাট সরাবখানা। আজও কিন্তু তা হয় নি, তাই দেখে শুনে মনে হয় দুঃখমোচনের স্বভাবসিদ্ধ সহজ সুস্থ পন্থা ওটা নয়। চিরন্তন দুঃখবেদনার আঘাত থেকে মানুষকে

উদ্ধার ক'রে যে বস্তু তাকে দুঃখাতীতের সন্ধান দেয়, এই পৃথিবীর জীবনরসে ব্যথা-বিদগ্ধ মনখানি তার নতুন ক'রে সঞ্জীবিত ক'রে তোলে, সে তার নিজেরই অপরিমেয় প্রাণশক্তি। একমাত্র তারই উপর নির্ভর ক'রে চলার পথে এগিয়ে যাবার মত সম্বল বা সামর্থ্য যার নাই, অন্ধকারে হোঁচট খেতে খেতে বারে বারে তাকে পথ হাতড়াতে হবেই, সে বিষয়ে সন্দেহ কি। দুর্বল সেই অসহায় মুহূর্তে বাইরের কোন একটা আশ্রয় পেলে সদ্য সদ্য যেন বেঁচে যায় সে। হোক তা সে যতই ক্ষণিক, হোক না কেন সুস্থমনের পরিপন্থী। নেশা ক'রে তাই দুঃখ ভোলার চেষ্টা যারা করে তাদের সেই জটিল মনস্তত্ত্বের সঠিক খবর হয়ত আমরা দিতে পারবো না। কিন্তু বার থেকে দেখে শুনে এই কথাই শুধু মনে হয়—দুঃখ তাদের কোনদিন কি ঘুচবে?

বামাপদর দেখাদেখি ব্যোমকেশের মত সম্পূর্ণ এক অনধিকারী অকস্মাৎ যে এমনভাবে বাড়ী চড়াও হয়ে বামাপদর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে হঠাৎ দুঃখ ভুলতে শুরু ক'রে দেবে, এমন কোন কথা ছিলো না। সাময়িক খেয়ালের ঝোঁকে নিতান্তই কাল্পনিক একটা মনস্তাপের সৃষ্টি ক'রে এবার কিন্তু সত্য সত্যই দুঃখের পথে পা বাড়াল ব্যোমকেশ। একটু একটু করে ক্রমশই সে পানাসক্ত হয়ে উঠতে লাগলো। বামাপদর ওই লাল সিরাজির আকর্ষণ চুম্বকের মত টানতে থাকে, সদ্যলব্ধা প্রণয়িণীর ক্ষণাস্বাদিত চুম্বনের মত। বামাপদ তার অন্তরঙ্গ বন্ধু, ভদ্র এবং সজ্জন। এটা কিন্তু সে চায় নি যে ব্যোমকেশ তার এক গেলাসের ইয়ার হয়ে তারই মত একটা নেশাখোর মাতাল হয়ে উঠুক। কিন্তু ঘাড়ের উপর চুলবুলে ওই ভাঙনের ভূতটা যতক্ষণ চেপে আছে ততক্ষণ তাকে সৎপরামর্শ দিয়ে ঠেকায় কে। উপর্যুপরি বেশ কয়েকদিন খানিকটা করে টানলে ব্যোমকেশ বামাপদর আড্ডায় গিয়ে। তার পর তাকে নিজে থেকে আর টানতে হলো না, ওই নেশাই তাকে টেনে ধরলে ছিনে-জোঁকের মত, টান মেরে আর সহজে তাকে ছাড়ায় কে।

বামাপদর অন্দর মহলের গণ্ডী ছাড়িয়ে বাইরেও দু'একদিন ঢুঁ মেরে এলো ব্যোমকেশ। শহরের এক অভিজাত রেস্টুরেণ্টে গিয়ে 'বার' নামক বস্তুটির সঙ্গে বেশ একটু আলাপ জমিয়ে এলো। সঙ্গে ছিলো এক্সপার্ট গাইড মিঃ

প্রেমশংকর সাহানী, পশ্চিমভারতীয় এক শ্রেষ্ঠী-তনয়। এ অঞ্চলে কয়লার কারবার। বহুদিনের পুরাতন ফার্ম। বাপের হয়ে কাজকর্ম দেখা শুনা ক'রে প্রেমশংকর বিরাট একখানা ক্যাডিলাক হাঁকিয়ে এখান ওখান ঘুরে বেড়ায় হরদম।

ম্যাকফারসন কোল কোম্পানীর সঙ্গে বড় রকমের একটা কণ্ট্রাক্ট নিয়ে নেগোশিয়েসন চলছে সাহানী কোম্পানীর। গৌরাংডি অফিস পর্যন্ত মাঝে মাঝে তাই আসতে হয় প্রেমশংকরকে! অফিসেই একদিন প্রেমশংকরের সঙ্গে কথায় কথায় আলাপ জমে গেল ব্যোমকেশের। আলাপ ক্রমশঃ বন্ধুত্বের কোঠায় পৌঁছতে খুব বেশী দেরি হলো না। উভয়েই প্রায় সমবয়সী। মনোধর্মের দিক থেকেও বেশ খানিকটা ঐক্য আছে। ব্যোমকেশের মতই প্রেমশংকর লোকটি অতিশয় সঙ্গীত-প্রিয়। গীটার বাজনায় শিক্ষানবিসি আরম্ভ করেছে কিছুদিন থেকে। ওই যন্ত্রটি দেখেই অপরিচিত যন্ত্রীটিকে হঠাৎ একদিন গোষ্ঠিগত স্বজন বলে চিনে ফেললে ব্যোমকেশ। আলাপচারির মাধ্যমে স্বতঃস্ফূর্ত সখ্য রসের সঞ্চার। প্রদেশগত আঞ্চলিক ব্যবধানের কাল্পনিক সীমা-রেখাটুকু কখন যেন উবে গেল আপনা থেকেই।

ব্যোমকেশ একদিন সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে প্রেমশংকরকে ধরে নিয়ে এলো তরুণ-সঙ্ঘের আড্ডায়। গান বাজনার জলসা বসলো আগন্তুকের আপ্যায়নে। যন্ত্র ও কণ্ঠ সঙ্গীত যথারীতি পরিবেশন করা হলো তরুণ-সঙ্ঘের সদস্যদের মধ্যে থেকে। প্রেমশংকরকেও গীটার বাজিয়ে শোনাতে হলো আর সকলের একান্ত অনুরোধে। বাজালে নেহাত মন্দ না। গীটারের সুরকে সঙ্গত ও সঙ্গীতের মনোহারিত্বে মণ্ডিত ক'রে যে তাকে অপূর্ব এক অভিব্যক্ততায় মূর্ত ক'রে তুলল, সে কিন্তু বামাপদর তবলা। এ গুণটি বামাপদর আছে। গীটার বাজনা শেষ ক'রে বামাপদকে ধন্যবাদ জানালে প্রেমশংকর,—ওয়াণ্ডারফুল, সিম্পলি ওয়াণ্ডারফুল, থ্যাঙ্ক ইউ ভেরি মাচ, মিঃ চাকী।

হাত বাড়িয়ে অনেকক্ষণ ধরে হ্যাণ্ডশেক হলো। অতঃপর শেঠনন্দন প্রেমশংকরজী তরুণ-সঙ্ঘের একটি স্থায়ী সম্পদে পরিণত হলেন। সদস্যদের অনুরোধে পৃষ্ঠপোষকের তালিকায় স্থান গ্রহণ করতে রাজী হয়ে গেলেন

সানন্দে। বিদায় নেবার আগে একখানি বড় অঙ্কের চেক ধরিয়ে দিয়ে গেলেন ব্যোমকেশের হাতে, ক্লাব ফাণ্ডে যৎসামান্য তাঁর ডোনেশান। লোকটি অতি অমায়িক। কথায় বার্তায় ব্যবহারে সর্বাঙ্গীন একটা মার্জিত রুচির ছাপ। বেশবাস ও আদব-কায়দা পাশ্চাত্য শিক্ষার অনুগামী।

সঙ্গীতানুষ্ঠান পরিসমাপ্তির পর প্রেমশংকরজী প্রস্তুত হলেন মোহনপুর কুঠি রওনা হওয়ার জন্য। গৌরাংডি থেকে মাইল-তিরিশেক পথ। সেখানকার কলিয়ারির স্বত্বাধিকারী এঁরাই। প্রেমশংকর সম্প্রতি মোহনপুরেই ঘাঁটি গেড়ে বসেছেন। কলিয়ারি পরিচালনার যাবতীয় দায়িত্বভার বর্তমানে এঁরই ওপর ন্যস্ত।

শৌখিন ক্যাডিলাকের ব্যাকলাইট জ্বলে উঠলো। লাল আর সবুজ রঙের উজ্জ্বল একটা সমারোহ। রোশনি যেন ঠিক্‌রে পড়ছে। সামনের দিকে হেডলাইটের তীক্ষ্ণ ফলায় অন্ধকারকে তেড়ে ফুঁড়ে দু'ফাঁক ক'রে গাড়ীখানা যেন অদৃশ্য বেগে উধাও হয়ে গেল, রাতচরা পাখীর মত।

মাঝে মাঝে ব্যোমকেশ নিজের মনেই সজাগ হয়ে ওঠে। সাময়িক একটা খেয়ালের ঝোঁকে এ কোন্ এক বাঁকাচোরা পথ ধরে এগিয়ে চলেছে সে! জীবনটাকে এইভাবে ভাঙনের মুখে ঠেলে দিয়ে লাভ কি। এমন একটি ভদ্র পরিবেশ, অপরিমেয় সুখসাচ্ছন্দ্য, স্নেহ প্রীতি ভালবাসার সুনিবিড় বন্ধন, সব কিছুই ত না চাইতে পেয়েছিলো ব্যোমকেশ। কোনদিন যা স্বপ্নেও সে ভাবে নি, সেই আশাতীত সৌভাগ্য যেচে এসে ধরা দিলে ব্যোমকেশকে। পরম এক শুভলগ্নে ভাগ্যলক্ষ্মী তার বরমাল্যখানি সরযুর হাত দিয়ে বুঝি অলক্ষে এসে দুলিয়ে দিয়ে গেল ব্যোমকেশের গলায়। ব্যোমকেশের জীবনের মূল্য যে এর কোন দিক থেকেই কম নয়। এ কথা ব্যোমকেশ অস্বীকার করবে কেমন ক'রে। অথচ ওই সরযূকে কেন্দ্র ক'রেই যত কিছু বিক্ষোভ, যত কিছু অহেতুক মনস্তাপের সৃষ্টি। এর চেয়ে ছেলেমানুষি আর কি হতে পারে।

এটা অবশ্য ব্যোমকেশের অবচেতন মনের কথা। মাঝে মাঝে এ সুবুদ্ধিটুকু নীচের তলা থেকে ছিটকে এসে উপরের তলায় উঁকি দিয়ে যায়। কিন্তু সে শুধু ক্ষণিকের জন্য। মন নামক বস্তুটিকে মত্তি এসে হঠাৎ দখল ক'রে বসে। কু-সংযোগে ওই মত্তির দাপট ক্রমশই যায় বেড়ে। তখন আর তাকে সোজা কথায় ঠেকায় কে। ব্যোমকেশ তাই শেষ পর্যন্ত মনের সঙ্গে আড়ি ক'রে ওই মত্তির নামেই পাড়ি জমায়। কুমতি আর কাকে বলে।

এই নিয়ে কিন্তু বেশ একটু বেকায়দায় পড়ে গেছে ব্যোমকেশ। তার পানাসক্তির কথা নিয়ে আবছা একটা কানাকানি শুরু হয়ে গেছে, ঘরে এবং বাইরে। প্রথম দিকটায় সরযূ একটু চেপে রেখেছিলো, ব্যোমকেশের দুর্নামের ভয়ে। বাড়ীর কাউকে ঘুণাক্ষরে জানতে দেয় নি। ভেবেছিলো যেমন ক'রে হোক ব্যোমকেশকে সে শুধরে নেবে। ব্যোমকেশ কিন্তু কোন মতেই শোধরালো না। সরযূর তীব্র প্রতিবাদ ও আবেদন নিবেদন সব কিছুই ব্যর্থ হলো তার কাছে। সরযূকে বারে বারে কথা দিয়েও সে কথা রাখে নি। বাড়ীর মধ্যে ক্রমশ একটা গুঞ্জন উঠলো। কোত্থেকে হঠাৎ সংবাদটুকু সংগ্রহ ক'রে এনে মনিববাড়ীতে এসে সবার আগে চাউর ক'রে দিলে মানদা ঝি। ফিস্ ফিস্ ক'রে গিন্নীমায়ের কানে কথাটা একদিন পৌঁছে দিলে মানদা, জামাইবাবু নাকি নেশা খেতে ধরেছেন। শশীমুখী দেবী বিশ্বাস করতে চাইলেন না এ কথা, মনে মনে কিন্তু চমকে উঠলেন। অতি সন্তর্পণে সরযূকে কাছে ডেকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন অনেক কথাই। জানতে চাইলেন জামাইবাবাজীর সাম্প্রতিক মতিগতির কথা। সরযূ এর কি উত্তর দেবে। নত মুখে শুধু এক দৃষ্টে চেয়ে রইলো মাটির দিকে।

শশীমুখী দেবী একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ছেড়ে বললেন,—বুঝেছি, আর বলতে হবে না ; শ্বশুর বংশের নাম ডুবিয়ে তবে ছাড়বে। এ আবার কোন্ দেশী জামাই গো, ছি ছি ছি ছি !

মুখখানা শুকিয়ে গেল সরযূর। স্বামী তার মাতাল—একথাও আজ শুনতে হলো সরযূকে। ঘরে বাইরে সে মুখ দেখাবে কেমন ক'রে।

শশীমুখী দেবী ক্ষুব্ধ হয়ে বললেন,—ওকে আর সন্ধ্যার পর বাড়ী থেকে বেরুতে দিস না, এই বেলা একটু সামলে নেবার চেষ্টা কর। নৈলে ভবিষ্যৎ যে একেবারে অন্ধকার।

মুখখানা কালি ক'রে বেরিয়ে গেলেন শশীমুখী দেবী। সরযূর অবস্থাটা প্রায় কাঠগড়ার আসামীর মত। ব্যোমকেশের খামখেয়ালীর জবাবদিহি কি সরযূকেই করতে হবে। কি সে করতে পারে এর জন্য। সম্বল তার শেষ পর্যন্ত. চোখের জল। সেও ত কিছু কম খরচ হলো না,. ব্যোমকেশ তবু শোধরালো কি! সরযূর পক্ষে এ যে কতখানি মর্মান্তিক, কতখানি লজ্জার কথা, একমাত্র সরযূই জানে। কিন্তু যেমন ক'রেই হোক ব্যোমকেশকে যে শোধরাতেই হবে। হাল ছেড়ে দিয়ে ব'সে থাকলে ত চলবে না সরযূর।

প্রথম যেদিন নেশা ক'রে এসে বাড়ী ঢুকলো ব্যোমকেশ, বিছানায় পড়ে পড়ে আবোল তাবোল বকতে আরম্ভ করলে, সরযূ হঠাৎ রীতিমত ভয় পেয়ে গেল। এ আবার কি অদ্ভুত কাণ্ড। ব্যোমকেশ ভরসা দিয়ে বললে,—ও কিছু না—ভয়ের কিছু নাই, সামান্য একটু নেশা করেছি মাত্র।

সরযূর বুক ফেটে কান্না পেলো। হঠাৎ একি দুর্মতি হলো ব্যোমকেশের! সরযূকে সে এইভাবেই জব্দ করতে চায় নাকি? কিন্তু কেন, কি এমন অপরাধ সে করেছে।

ব্যোমকেশ বিড় বিড় ক'রে বকেই চলেছে। কুঁজো থেকে খানিকটা জল গড়িয়ে ব্যোমকেশের মাথাটা বেশ ক'রে ধুইয়ে দিলে সরযূ। মুখে চোখে জলের ছিটে দিয়ে মুখখানা মুছিয়ে দিলে তোয়ালে দিয়ে। একটু যেন শান্ত হলো ব্যোমকেশ। তার পর সে নিঝুম মেরে হঠাৎ কখন ঘুমিয়ে পড়লো, কিছুমাত্র আর মনে নাই।

কি যেন একটা দুঃস্বপ্ন দেখে ঘুম ভেঙ্গে গেল ব্যোমকেশের, শেষ রাত্রের দিকে। চেয়ে দেখে রাত জেগে নিঝুম মেরে বসে আছে সরযূ, পালঙ্কের এক-পাশে। মুখখানা অতিশয় গম্ভীর। কালবোশেখীর পূর্বলক্ষণ। ঝড় উঠবে নাকি।

ঘুমভাঙ্গার সঙ্গে সঙ্গে গতসন্ধ্যার আদ্যন্ত ঘটনাটা আবছা একটা দুঃস্বপ্নের মতই ভেসে উঠলো ব্যোমকেশের মনের মধ্যে। মাথায় তার

শেষ পর্যন্ত কুঁজোর মুখে জল ঢালতে হয়েছে। তা না হয় হয়েছে, কিন্তু তার জন্যে লখিন্দরের বাসর জাগিয়ে সারাটা রাত ঘুম কামাই ক'রে বসে থাকবার প্রয়োজনটা কি ছিলো! সরযূ কি আড়ি করে বসে আছে নাকি।

অবস্থাটা সহজ ক'রে নেবার জন্য সরযূর দিকে পাশ ফিরে একটু তাকালো ব্যোমকেশ। বললে,—চুপচাপ বসে আছ যে, রাত জেগে চোখ দু'টো লাল ক'রে ফেলেছ?

একভাবেই বসে আছে সরযূ নিস্পন্দ নির্বাক। রাত জেগে তার কাজল কালো দুটি আঁখির কোণে ঠিকরে পড়ছে কি ও, বিদ্যুতের ঝলক? রীতিমত ঝড়ের সঙ্কেত। কিন্তু তার আগেই বর্ষণ শুরু হয়ে গেল যে। ঘাবড়ে গেল একটু ব্যোমকেশ, আমতা আমতা ক'রে বলে উঠলো,—এ আবার কি শুরু করলে, ছেলেমানুষের মত কান্না জুড়ে দিলে যে!

সরযূর বিক্ষুব্ধ কণ্ঠে ফুটে উঠলো তীব্র একটা প্রতিবাদের সুর। তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলে উঠলো,—মদ খেয়ে তুমি এমনধারা মাতলামি করতে পার, এ আমি কোনদিন ভাবতেও পারি নি।

ব্যোমকেশ কোন প্রতিবাদ করলে না। সায় দিয়ে বললে,—আমিই কি কোনদিন ভেবেছিলাম। ঠিক তোমার মতই আমিও আজ অবাক হয়ে যাচ্ছি। কিন্তু রাত যে প্রায় শেষ হয়ে এলো, এই বেলা একটু ঘুমিয়ে নেবার চেষ্টা করলে ভাল হতো না!

ঘুম আমার আসবে না। যতক্ষণ না এর বোঝাপড়া শেষ করছো, ততক্ষণ আমি শান্তিতে ঘুমুতে পারবো না।

—বোঝাপড়াটা সকালবেলা চায়ের টেবিলে বসে করলেই বেশ ভাল হতো না! আমার যে আবার ঘুম পাচ্ছে।

—বেশ ত ঘুমোও না, এই নাও—পাশ বালিশে ঠেস দিয়ে বেশ আরাম ক'রে ঘুমোও।

বেডরুম লাইটের সুইচটা সুদ্ধ অফ ক'রে দিলে সরযূ। কারো মুখে আর কোন কথাটি নাই। অতি অল্পক্ষণ পরেই অন্ধকারে হাত বাড়িয়ে

সরযূর হাত একখানা চেপে ধরে বলে উঠলো ব্যোমকেশ,—মাথাটা একটু টিপে দাও না, ঘুরঘুট্টি এই অন্ধকারে বেকার বসে থেকে লাভ কি।

সরযূর অঙ্গখানা জুড়িয়ে যেন জল হয়ে গেল। এই অবস্থায় এতখানা আদিখ্যেতা—এও মানুষ পারে, আশ্চর্য। মনের ভিতরটা রি·রি ক'রে উঠল সরযূর। হাতখানা তার নির্লজ্জের মত কপালের উপর চেপে ধরেছে ব্যোমকেশ। টান মেরে ছাড়িয়ে নেবে নাকি সরযূ!

ছাড়িয়ে নেওয়াই হয়ত উচিত ছিলো। কিন্তু সরযূ কি তা পারলে! নিশ্চিন্ত আরামে নিঝুম মেরে পড়ে আছে ব্যোমকেশ, চোখ দু'টি বুজে। অন্ধকারের পর্দা ঠেলে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া হয়ত সম্ভব নয়, কিন্তু হলফ ক'রে আমরা বলতে পারি—সরযূর কনকচাঁপার মত পাপড়ি পেলব আঙুলগুলি অন্ধকারে বেকার বসে নাই। বুঝি বা তার অজ্ঞাতেই ব্যোমকেশের ললাটদেশ লক্ষ্য ক'রে করাঙ্গুলির স্বভাব-সুলভ সঞ্চরণ ক্রিয়া আপনা থেকেই কখন শুরু হ'য়ে গেছে। এই ফুরসতে নাক ডাকিয়ে আর একদফা আরাম ক'রে ঘুমিয়ে পড়লো ব্যোমকেশ।

গৃহিণীর কানে কথাটা যখন উঠেই পড়লো, কর্তামশায়কে না জানিয়ে উপায় কি। শশীমুখী দেবী ভয়ে ভয়ে তুললেন একদিন প্রসঙ্গটা। জামাই বাবাজী বাইরের কতকগুলো কু-সংসর্গে পড়ে দিন দিন যেন কেমনধারা একটু বেচাল হয়ে উঠছেন। এই সময় একটু সামাল দেওয়া দরকার। শশীমুখী দেবী খোলাখুলি ভবেশবাবুকে জানিয়ে দিলেন ব্যোমকেশের সম্বন্ধে যতটুকু যা শোনা গেছে। অবশ্য লোকের মুখে এ কথা শোনা। এর কতখানি যে সত্য আর কতখানি যে নয়, সে সম্বন্ধে একটু খোঁজ খবর নেওয়া দরকার। এইবেলা বাবাজীবনকে একটু শুধরে নিতে না পারলে লোকসমাজে মুখ দেখানো ভার হয়ে উঠবে। অশেষ ভোগান্তি ভুগতে হবে শেষে মেয়েটাকেই।

ভবেশবাবু গড়গড়ার নলটা ঠোঁটের উপর চেপে ধরে শুনেই গেলেন শশীমুখী দেবীর কথাগুলো। তাঁর বক্তব্য শেষ হতেই নির্লিপ্তভাবে বলে উঠলেন কর্তাবাবু—তা আমি এর কি করতে পারি, জামাইকে ধরে ঠেঙ্গাবো!

শশীমুখী দেবী একটু চোখ তেড়ে বললেন, শোন একবার কথা। ধরে ঠেঙ্গাতে হবে কেন, বুঝিয়ে একটু বললেই ত যথেষ্ট। হাজার হোক জামাই মানুষ, জোর করে তাকে শাসন করা ত চলে না।

গুড়গুড়ির নলটা মুখ থেকে সরিয়ে গম্ভীর হয়ে তাকালেন ভবেশবাবু, বললেন,—শাসন করা চলে না! নিজের ছেলে হলে কি করতে, পারতে এই সব বখাটেমির প্রশ্রয় দিতে? চাবকে তার সারা পিঠ আজ লাল ক'রে দিতাম না!

শশীমুখী দেবী একটু অবাক হয়ে বললেন,—তোমার সব তাতেই বাড়াবাড়ি, ও সব কথা কি মুখে আনতে আছে। তার চেয়ে একবার ঠাকুরপোর সঙ্গে পরামর্শ করে দেখ না, তিনি যদি কিছু করতে পারেন।

কর্তামশায় ঘাড় নেড়ে বললেন,—একথা আমি পিটসাহেবকে কিছুতেই বলতে পারবো না। আমি তাকে চিনি, শুনলে সে দুঃখই পাবে, ঠিক আমাদেরই মত। লজ্জায় হয়ত মাথাটা তার হেঁট হয়ে যাবে। তার এতখানি অসম্মান আমি কিছুতেই করতে পারবো না।

গৃহিনী একটু স্বর টেনে বললেন,—তাহলে একটা যা-হোক কিছু কর ত। ছেলেটা এইভাবে বয়ে যেতে দেওয়া কি ঠিক হবে!

আবার গড়গড়া টানতে আরম্ভ করলেন ভবেশবাবু। কপালের রেখাগুলো ঈষৎ কুঞ্চিত হয়ে উঠলো। ক্ষুব্ধ কণ্ঠে পুনরায় বলে উঠলেন,—গোড়াতেই একটু ভুল হয়ে গেছে গিন্নী, সেদিন তার ভিতরের আসল বস্তুটাকে যাচাই করে দেখবার আর অবকাশই হলো না। নৈলে আজ এমনটা ঘটবে কেন। মুখুজ্যে বংশের কেউ কোনদিন যা করে নি, শ্রীমান এসে সেইটুকু আজ ঘটালেন। বাবাজী আমার ক্লাবে গিয়ে ড্রিঙ্ক করতে শিখেছেন। ছেলে একেবারে লায়েক হয়ে গেছে। ওদের ঐ আড্ডাটা এভাবে চলতে দেওয়া ঠিক হচ্ছে না, ওটা তুলে দিতে হবে।

শশীমুখী দেবী কি যেন একটু ভেবে বললেন,—তা যদি দিতে হয় দাও, কিন্তু সব দিক বাঁচিয়ে। এমন কিছু ক'রে বসো না যাতে মেয়েটার মনে কোনদিক থেকে চোট লাগতে পারে। বাছা আমার এমনিতেই কেমন যেন মন-মরা হয়ে আছে।

কর্তামশায় আর একটুখানি গম্ভীর হয়ে বললেন,—হুঁ—বুঝেছি। কিন্তু আমিও তোমাকে বলে রাখছি গিন্নী, বাবাজীবনকে এই সমস্ত বখাটেমি ছাড়তে হবে, আর তা যদি না হয়—

তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন শশীমুখী দেবী,—না হবেটা কি জন্যে শুনি? আগে একটু চেষ্টা ক'রেই দেখ না, পরের কথা পরে ভাবলেই চলবে।

কর্তামশায় এইখানেই থেমে গেলেন। যা-হোক একটা ব্যবস্থা তাঁকে করতেই হবে। ব্যাপারটা আর কোনমতেই গড়াতে দেওয়া ঠিক হচ্ছে না।

পূজার ছুটির বন্ধে কলিয়ারির অধিকাংশ কর্মচারীই বাসাবাড়ীর দরজায় তালা দিয়ে যে যার আপনার দেশে চলে যায়। মাঝে তাই বেশ কয়েকটা দিন তরুণ-সঙ্ঘের আড্ডা ছিলো বন্ধ। মেম্বাররা সব একে একে ফিরে আসতেই ব্যোমকেশ আবার প্রবল উদ্যমে লেগে পড়েছে নাটকের মহড়া দিতে। মাঝে আর কয়েকটি মাত্র দিন, কালীপূজা প্রায় এসে পড়েলো। অভিনয়ের সর্বাঙ্গীন প্রস্তুতি এই ক'দিনের মধ্যেই যেমন ক'রে হোক শেষ ক'রে ফেলতে হবে। স্টেজ এবং সিনসিনারি সরবরাহের যাবতীয় দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন পৃষ্ঠপোষক প্রেমশংকরজী। নাটক এবং সঙ্গীতের দিকটায় শুরু থেকেই লেগে আছে ব্যোমকেশ, এবার শুধু একটুখানি ফিনিশিং টাচ। এই উপলক্ষে উদ্বোধন-সঙ্গীত একখানা তৈরি ক'রে ফেলেছে ব্যোমকেশ। কথা ও সুর দু'টোই তার নিজস্ব। কলিয়ারি ম্যানেজার বনমালীবাবুর ছেলেমেয়েদের দিয়ে গানখানা পরিবেশনের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। 'হাটিমাটিম' ছড়াগানের কৃতী শিল্পী শ্রীমান মণ্টু ও শ্রীমতী নীলুকে ব্যোমকেশ তালিম দিয়ে তৈরী করে ফেলেছে। প্রেমশংকরজী গীটার বাজাবেন। সঙ্গত করবে বামাপদ। ব্যস্— আর চাই কি, উদ্বোধন-সঙ্গীতেই আসর একেবারে মাত। একটুখানি শুধু লক্ষ্য রাখতে হবে দর্শকদের সামনে গিয়ে ছেলে-মেয়ে দু'টো যেন ঘাবড়ে না যায়।

ব্যোমকেশের খেতে শুতে সময় নাই। দায়িত্ব তাব বহুমুখী। হপ্তাখানেক তাই অফিস থেকে ছুটি নিতে হয়েছে। অনুষ্ঠান শেষ না হওয়া পর্যন্ত তিলার্দ্ধ আর বিশ্রাম নাই ব্যোমকেশের।

নেশাভাঙের পাট কিন্তু একেবারে তুলে দিয়েছে ব্যোমকেশ, সম্প্রতি কিছুদিন থেকে। তুলে না দিয়ে উপায় কি, সরযূকে সামলায় কে। গোড়া থেকেই সে অসহযোগ আন্দোলন শুরু করছে, অনশন ধর্মঘটের নোটিশ পর্যন্ত জারি হয়ে গেছে বার তিনেক। পারিবারিক অশান্তি আর বাড়িয়ে লাভ কি। অন্তত এই সামনের কয়েকটা দিন একটু সংযতভাবেই চলতে হবে ব্যোমকেশকে। তারপর এক গেলাসের ইয়ার-দোস্তরা ত হাত বাড়িয়েই আছে, দরকার হলে হাত মেলাতে কতক্ষণ। দরকার ত হয়েই আছে, ব্যোমকেশ নেশা ছাড়তে চাইলেও নেশা কি আর এত সহজে ছাড়বে তাকে। এর আকর্ষণ যে এত বেশি, ব্যোমকেশের তা জানা ছিলো না।

ব্যোমকেশের নির্দেশ মত নীলু আর মণ্টু সাহেব কোন্ বিকেল থেকে এসে বসে আছে সরযূদের বাড়ীতে। ক্লাবে গিয়ে আজ উদ্বোধন সঙ্গীতটা গেয়ে শোনাতে হবে কিনা, বাজনার সঙ্গে একটু প্র্যাকটিশ করে নিতে হবে। নীলু আর মণ্টু সাহেবকে দু'খানা মেডেল পর্যন্ত দেওয়া হবে ক্লাব থেকে। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে এই শুভ-সংবাদটুকু কতবার যে শোনালো মণ্টু জেঠাইমা আর সরযূদির কাছে, তার হিসাব রাখে কে। নীলু বলে রূপোর মেডেল, মণ্টু বলে সোনার। এই নিয়ে ওরা তর্ক জুড়ে দেয়। শশীমুখী দেবী হাসতে হাসতে এগিয়ে এসে বলেন,—এবার একটু মিষ্টি খাবি আয়। বকতে বকতে এখন থেকেই যে গলা ভেঙ্গে ফেললি।

সরযূ ফল মিষ্টির থালা সাজিয়ে ঠাঁই করতে থাকে। বিস্তৃত বারান্দার অপর প্রান্তে ভবেশবাবু একধারে বসে ইংরাজী একখানা সংবাদ-পত্র পাঠ করছিলেন। মণ্টু হঠাৎ দেখতে পেয়ে নীলুর হাত ধরে লাফাতে লাফাতে হাজির হলো গিয়ে ভবেশবাবুর সামনে। অতি উৎসাহের সঙ্গে বলে উঠলো মণ্টু, বারোয়ারি তলায় থিয়েটার হবে জেঠামশায়, যাবেন আপনি দেখতে?

ভবেশবাবু কাগজ পড়া বন্ধ ক'রে পাশের দিকে একটু তাকালেন, বললেন, থিয়েটার, হচ্ছে নাকি ?

মণ্টু একটু আশ্চর্য হয়ে বললে,—বাঃ—তাও বুঝি আপনি জানেন না ! বারোয়ারি তলায় মস্ত বড় স্টেজ বাঁধা হচ্ছে। নীলু আর আমি উদ্বোধন-সঙ্গীত গাইবো যে।

নীলু বললে,—ব্যোমকেশদা অর্জুন সাজবেন জেঠামশায় আর খাজাঞ্চীবাবু ভীম।

ভবেশবাবু একটু মৃদু হেসে বললেন,—তাই নাকি, তাহলে ত একটা কুরুক্ষেত্র না বেধে আর যায় না। ভীম অর্জুন কে ছিলেন বল দেখি ?

মণ্টু একটু বুক ফুলিয়ে জবাব দিলে,—মস্ত বড় লড়ুয়ে বীর। ভীমের হাতে ইয়া এক গদা, আর অর্জুনের হাতে ধনুর্বাণ। ওদের সঙ্গে কেউ লড়তে পারতো না, নারে নীলু !

ভবেশবাবু একটু কৌতুক করে বললেন,—কিন্তু ভীম আর অর্জুনের মধ্যে হঠাৎ যদি লড়াই বেধে যায়, কে জিতবে বল দেখি ?

নীলু বললে, অর্জুন জিতবে। ওর বাণের যা তেজ, লক্ষ্যভেদে পারবে কেউ ওর সঙ্গে।

মণ্টু ঘোর প্রতিবাদ জানিয়ে বললে,—কক্ষনো না, আমি বলছি ভীম জিতবে। ওর গায়ে কত জোর। সেইজন্যেই ত খাজাঞ্চীবাবুকে ভীমের পার্ট দিয়েছে। ব্যোমকেশদা পারবে ওর সঙ্গে।

তর্কের মোড় ফিরিয়ে নীলু হঠাৎ বলে উঠলো,—কিন্তু জেঠামশায়, ভীম আর অর্জুন ওরা ত দুই ভাই, ভাইয়ে ভাইয়ে কখনো যুদ্ধ হয়। ওরা লড়বেই না।

ভবেশবাবু নীলুর পিঠ চাপড়ে বললেন,—ঠিক বলেছিস মা-মণি, ভাইয়ে ভাইয়ে কি যুদ্ধ হয়, এ কখনও হতেই পারে না।

শশীমুখী দেবী একটা হাঁক দিয়ে বললেন,—তোরা এবার খেয়ে নিবি আয় মেডেল পাওয়ার গল্পটা পরে শোনালেও চলবে।

নীলু আর মণ্টু ছুটতে ছুটতে গিয়ে জলখাবারের থালা দু'টো নিয়ে চটপট খেতে বসে গেল।

সদর ফটকের বাইরে বড় রাস্তার মোড়ে একখানা গাড়ী এসে থামলো। ব্যোমকেশ নেমে এলো গাড়ী থেকে। বাড়ী ঢুকেই মণ্টু আর নীলুকে দেখে খুশী হয়ে বলে উঠলো;—এই যে তোমরা এসে পড়েছ। ওঠ গিয়ে এবার গাড়ীতে, রিহার্সালে যেতে হবে।

নীলু আর মণ্টু বহুক্ষণ থেকেই তৈরি হয়ে আছে। তাড়াতাড়ি খাবারগুলো শেষ ক'রে হৈ-হৈ ক'রে বাড়ী থেকে ছুটে বেরুলো। মোড়ে গিয়ে টান দিয়ে দরজা খুলে উঠে বসলো ক্যাডিলাকে।

ভৃত্য বাণেশ্বর একটা বাজার করা থলেয় ক'রে কতকগুলো কি হাতে ঝুলিয়ে সদর দোর দিয়ে বাড়ী ঢুকলো। কর্তাবাবু জিজ্ঞাসা করলেন,—বাইরে গাড়ী কার রে?

—আজ্ঞে কোম্পানী সাহেবের।

—কোম্পানী সাহেবের, কোথাকার কোম্পানী?

—আজ্ঞে মোহনপুর কুঠির, ওই যে সেই ছোকরামত সাহেবটা। আজকাল উনি প্রায়ই আসেন, জামাইবাবুর সঙ্গে খুব ভাব কিনা।

ভবেশবাবু কতকটা যেন নিজের মনেই বলে উঠলেন,—জামাইবাবুর সঙ্গে আজকাল ত বহু লোকের ভাব। কিন্তু কে এই কোম্পানী সাহেবটি! সাহানীর ছেলে নাকি, কাপ্তেনি ক'রে বেড়াচ্ছেন বুঝি ব্যবসা বাণিজ্য ছেড়ে।

বাণেশ্বরকে তামাক দিতে আদেশ করলেন।

ধোপদস্ত ফুলবাবুটি সেজে তাড়াতাড়ি বাড়ী থেকে বেরিয়ে এলো ব্যোমকেশ। সন্ধ্যা হয়ে আসছে, রিহার্সালে যেতে হবে। কর্তাবাবুর সামনা সামনি এগিয়ে আসতেই মুখ তুলে একটু চাইলেন ভবেশবাবু। ব্যোমকেশকে লক্ষ্য ক'রে বললেন,—কোথাও বেরুচ্ছো?

থমকে একটু দাঁড়ালো ব্যোমকেশ। বললে,—আজ্ঞে হ্যাঁ, বাইরে একটু দরকার আছে। আমরা একটা ছোটখাটো ক্লাব অর্গ্যানাইজ করেছি কিনা, মাঝে মাঝে তাই এটেও করতে হয়।

ভবেশবাবু শুনে বললেন,—ভালই ত, জিনিসটা বেশ ভালই। কিন্তু আমি একটা প্রস্তাব করছিলাম, তোমাদের ঐ ক্লাবঘরটা আর একটু ভাল জায়গায় অন্য কোথাও সরিয়ে আনা যায় না!

অতি আকস্মিক প্রশ্ন। ব্যোমকেশ একটু ভেবে বললে, কিন্তু তেমন কোন ঘর পাওয়া ত মুস্কিল। তার চেয়েও মুস্কিল ঘরভাড়া দিয়ে ক্লাব চালানো। ক্লাবের আর্থিকসঙ্গতি এমন কিছু ভাল না।

ভবেশবাবু ভরসা দিয়ে বললেন,—সে জন্য তোমাদের ভাবতে হবে না। আমি স্থির করেছি বাইরের ঘরের ওপাশটায় কোম্পানীর যে ব্যারাকখানা খালি পড়ে আছে, ওটাকে তোমাদের ক্লাবঘরের জন্য ছেড়ে দেওয়া হবে। দরকার হলে একটা লাইব্রেরি আর আর রিডিংরুম ওইখানেই করে দেব আমি। তোমাদের উঠে আসতে কোন বাধা নাই ত!

ব্যোমকেশ একটু ইতস্ততঃ ক'রে বললে, আজ্ঞে না, বাধার কোন কারণ দেখি না। তবে আপনাদের একটু অসুবিধা ঘটতে পারে। ক্লাব মানেই যে একটা হৈ-হুল্লোড় সমারোহের ব্যাপার।

ভবেশবাবু বললেন,—তা হলোই বা একটু সমারোহ, মন্দ কি। বাণেশ্বর কাছাকাছি রয়েছে, তোমাদের ফাইফরমাশটা খেটে দিতে পারবে। কোম্পানী থেকে একটা চৌকিদার পর্যন্ত ঠিক করে দেব আমি, তোমাদের ক্লাবঘর পাহারা দেবার জন্য। সে সব কোন অসুবিধা হবে না, ও দুর্ভাবনা-গুলো নিশ্চিন্তে আমার উপর ছেড়ে দিতে পার।

চারদিক থেকে বার দুই তিন হর্ণ মারলে ক্যাডিলাক। ব্যোমকেশ বলে উঠলো,—কিন্তু সামনে যে আমাদের ড্রামাটিক ফাংশন, খুব তাড়াতাড়ি উঠে আসা কি সম্ভব হবে।

ভবেশবাবু জবাব দিলেন,—বেশ ত, ফাংশনটা চুকে যাক, তার পর ধীরে সুস্থে উঠে এলেই চলবে।

প্রসঙ্গটা তাড়াতাড়ি শেষ করবার জন্য সায় দিয়ে বলে উঠলো ব্যোমকেশ,—আজ্ঞে হ্যাঁ—তা হতে পারে, ফাংশনটা চুকে গেলে আর আসতে অসুবিধা কি।

ক্যাডিলাক ককাচ্ছে। ভবেশবাবু পুনরায় বললেন,—বাড়ীর সকলের ইচ্ছে তুমি যাতে সব সময়ই আমাদের একটু কাছাকাছি থাকো, বুঝলে।

বোঝবার কিন্তু আর সময় নাই ব্যোমকেশের, সাড়ে ছ'টা বেজে গেছে। তাড়াতাড়ি সায় দিয়ে বললে,—আজ্ঞে হ্যাঁ—আমিও ত সেই কথাই ভাবছিলাম,—সে এক রকম মন্দ হবে না। প্রস্তাবটা আজই আমি তুলবো গিয়ে ক্লাবে, দেখি কদ্দুর কি করতে পারি।

ব্যোমকেশ বেরিয়ে গেল। ভবেশবাবু আর একটুখানি গম্ভীর হয়ে উঠলেন।

বাণেশ্বর কলকেয় ফুঁ দিতে দিতে কর্তাবাবুর সামনে গড়গড়াটা নামিয়ে দিলে। থলে হাতে আর একদফা বাজারে বেরুচ্ছে বাণেশ্বর। ভবেশবাবু জিজ্ঞাসা করলেন,—সাত তাড়াতাড়ি আবার চললি কোথায়?

বাণেশ্বর ফিরে দাঁড়ালো। হাত জোড় করে জবাব দিলে,—আজ্ঞে কোম্পানী সাহেবের জন্যে বাজার থেকে দুটো মুর্গি কিনে কেলাব-ঘরে পৌছে দিয়ে আসতে হবে। জামাইবাবু হুকুম ক'রে গেলেন কিনা।

থলে-হাতে জামাইবাবুর হুকুম তামিল করতে বেরিয়ে গেল বাণেশ্বর। কর্তাবাবু নিজের মনেই গড়গড়াতে ঘন ঘন টান দিতে লাগলেন।

কলিয়ারির সর্বজনীন কালীপূজা উপলক্ষে যে বিরাট ধূম-ধামটা এবার হয়ে গেল বারোয়ারিতলায়, বহুদিন তা মনে রাখবার মত। তরুণ-সঙ্ঘের কৃতী সদস্যগণ থিয়েটারের অভিনয়ে যে অভিনব কলাকৌশল ও মৌলিক নাট্যপ্রতিভার পরিচয় দিতে সক্ষম হয়েছে, শৌখিন নাট্যসম্প্রদায়ের পক্ষে তা কম কৃতিত্বের কথা নয়। প্রথম দু'দিন বাইরের দলের যাত্রাগানের আসরে লোক সমাগম হয়েছিলো যতখানি তৃতীয় দিন তরুণ-সঙ্ঘের অনুষ্ঠানে দর্শক সংখ্যা তাকেও যেন ছাপিয়ে গেল। অক্লান্ত সঙ্ঘকর্মিগণ রাস্তায় রাস্তায় চোঙা ফুঁকেছে, কলিয়ারির সারা অঞ্চল ঘুরে হাণ্ডবিল পর্যন্ত বিলি করেছে, লোকসংখ্যা একটু বাড়বারই কথা। সন্ধ্যার পর থিয়েটারের অভিনয় যখন

আরম্ভ হয়, দেখা গেল বারোয়ারিতলায় আর তিলধারণের জায়গা নাই। অবশ্য দর্শকদের একটা বৃহৎ অংশ কয়লাখাদের কুলিকামিন, মালকাটা ও অন্যান্য ধাওড়াবাসী শ্রমিক। কিন্তু সেই সঙ্গে স্থানীয় ভদ্রমহোদয় ও ভদ্রমহিলাদের সমাগমও কম হয় নি। বারোয়ারি কমিটির বিশেষ আমন্ত্রণে কলিয়ারির পদস্থ ব্যক্তিরাও অনেকেই উপস্থিত ছিলেন।

অভিনয় রজনী তরুণ-সঙ্ঘের। দর্শকদের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রে সর্বপ্রথম যে বস্তুটি তাদের চমক লাগিয়ে দিয়েছে, সেটি হলো রঙ্গমঞ্চের আলোকসজ্জা। মঞ্চের সামনের দিকটায় রঙ-বেরঙের ইলেকট্রিক ডুম দিয়ে সুন্দর একটি আলোক-তোরণ সাজানো হয়েছে। মাথার উপর ঠিক মধ্যস্থলে নিওন সাইনের সবুজ হরফে লেখা 'তরুণ-সঙ্ঘ'। কলিয়ারির জন দুই-তিন ইলেকট্রিক এ্যাপ্রেন্টিস দিন চার পাঁচ অক্লান্ত পরিশ্রম ক'রে বিশেষ এই দর্শনীয় বস্তুটিকে খাড়া ক'রে তুলেছেন। কয়েকখানা তক্তাপোশের উপর রকমারি খানকয়েক দৃশ্যপট সাজানো। নিতান্তই সাময়িক একটি শৌখিন নাটমঞ্চ। কিন্তু এর রচনাসৌষ্ঠব ও আলোকসজ্জার পরিকল্পনা সত্যই অনবদ্য। দর্শকদের চোখের সামনে স্টেজখানা ঝলমল করছে। ভিতরে এর যা-ই থাক, বাইরের এই চমকটার দাম দেয় কে।

অতঃপর উদ্বোধন সঙ্গীতের সূচনায় যবনিকা উত্তোলনের সঙ্গে সঙ্গে দিলো আর একটা চমক। ফুটফুটে নধর-কান্তি অতি অল্পবয়সী দু'টি ছেলেমেয়ে অপরূপ রূপসজ্জায় সজ্জিত হয়ে সুকুমার নৃত্যের ভঙ্গিমায় গান গেয়ে চলেছে সুমধুর কণ্ঠে। বয়স তাদের সবে মাত্র আট আর দশ। চমক একটু লাগবারই কথা। এর উপর আবার রঙ্গমঞ্চে রকমারি আলোর খেলা। এই লাল ত এই নীল, পরক্ষণেই দেখা গেল সমস্তটা সবুজ হয়ে গেছে। রঙ্গমঞ্চে একেবারে অন্ধকার ক'রে পাশ থেকে হঠাৎ ফোকাস করা হলো সাইড লাইটের তীব্র আলোক। মাথার উপর মাঝে মাঝে ফ্লাড লাইটের ঝিলিক দিচ্ছে। আলোর তরঙ্গে যেন ভাসছে দু'টি ক্ষুদে শিল্পীর হাসি হাসি কচি দুখানি মুখ। সেও হঠাৎ উবে গেল কখন, পিছনের পর্দায় ফুটে উঠলো নৃত্যচপল দু'টি কৃষ্ণবর্ণ ছায়া। ছায়ানৃত্য চলছে। গান গেছে বন্ধ হয়ে, অর্কেস্ট্রায় সুরটুকু শুধু

বাজছে। নাচতে নাচতে ছায়া দু'টো হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে গেল। নূপুরের গুঞ্জন গেল থেমে। পর্দা পড়ে গেল সামনের দিকে। রঙিন আলোর তোরণটা সঙ্গে সঙ্গে আবার জ্বলে উঠলো।

দু'নম্বর পিটের ইনচার্জ বাগচী বাবুর শালা শহর থেকে হঠাৎ এসে পড়েছিলেন। রঙ্গমঞ্চের কলাকৌশল সম্বন্ধে যথেষ্ট তাঁর অভিজ্ঞতা আছে। ছায়া-নৃত্যের পরিকল্পনা ও প্রযোজনাটুকু তাঁরই। অনুষ্ঠানের সূচনায় দর্শকদের সামনে হঠাৎ-আসা এই বড়কুটুমটি অভিনব চমক একটা দিয়ে গেলেন বটে।

সঙ্গে সঙ্গে আবার পর্দা তুলে নীলু আর মণ্টুকে মঞ্চের উপর টেনে আনা হলো। তরুণ-সঙ্ঘের বয়ঃপ্রবীণ হাজারিদা বেহালাখানা ঘাড়ে ক'রে দাঁড়ালেন এসে এক পাশে। প্রবীণত্বের মর্যাদা-সূত্রে তাঁরই উপর কিছু বক্তব্যনিবেদনের ভার পড়েছে। কিন্তু হাজারিদার পা দুটো হঠাৎ থর থর করে কাঁপছে কেন। একটুখানি সামলে নিয়ে বললেন,—সমবেত ভদ্র-মহোদয়গণ আমি অতি আনন্দের সঙ্গে ঘোষণা করছি যে শ্রীমান ও শ্রীমতী মণ্টু ও নীলু চৌধুরীর নৃত্যগীতে মুগ্ধ হয়ে আমাদের তরুণ-সঙ্ঘের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক—কি যেন নামটি আপনার মশায়?···

পাশের দিকে উৎকর্ণ হয়ে একটু তাকালেন হাজারিদা, পুনরায় বলে উঠলেন,—ঠিক—ঠিক, আমাদের ঐ প্রেমকিংকর ভায়া এই সমস্ত দেখে শুনে যারপরনাই খুশী হয়েছেন। তাই দু'টি রৌপ্যপদক দিয়ে এদের তিনি পুরস্কৃত করতে চান। কি মশায়, রুপোর ত? কি বললেন, তা আপনি নিজেই একটু এগিয়ে এসে বলে যান না। কি বলতে চান বলুন।

প্রেমশংকরজী স্বয়ং এসে অবতীর্ণ হলেন রঙ্গমঞ্চে। ঢুকেই তিনি সুরু করলেন:

Ladies and Gentlemen, I am highly charmed with the musical performance of these two little artists who have displayed a brilliant show of a very high standard. I am sure, the laudable item must have impressed you to the very core of your hearts. I feel very much pleased to offer my

congratulation to them and as a token of my appreciation two gold-centred medals are awarded herewith. My hearty thanks to you all.

মেডেল দুটো নীলু ও মণ্টুর গলায় ঝুলিয়ে দিয়ে গুডবাই ক'রে বিদেয় হয়ে গেলেন প্রেমশংকরজী।

দর্শকদের মধ্যে তুমুল একটা আনন্দমুখর হুল্লোড়ের ঢেউ বয়ে গেল। সুরু হলো করতালির উপর করতালি বর্ষণ। হাজারিদা একটা হুঙ্কার দিয়ে বললেন, অর্ডার—অর্ডার।

প্রেক্ষাগৃহ একটু শান্ত হতেই হাজারিদা পুনরায় আরম্ভ করলেন,—মহামান্য ভদ্রমহোদয়গণ, এবার আমাদের সপ্তরথী নাটকের অভিনয় সুরু হচ্ছে। প্রযোজনা তরুণ-সঙ্ঘ। অবশ্য আমাকে দেখে আপনারা যেন একটু ভুল বুঝবেন না। আমাদের এই সম্প্রদায় আমি ছাড়া বাদবাকি সকলেই তরুণ। তরুণ-সঙ্ঘের এই নাটকখানির পরিচালক শ্রীমান ব্যোমকেশ বন্দ্যোপাধ্যায়। আপনারা হয়ত অনেকেই তাঁকে চেনেন। এক্ষুনি তিনি এসে পড়বেন অর্জুন সেজে, কয়েক মিনিটের মধ্যেই। একটা কথা শুধু আপনাদের কাছে নিবেদন করতে চাই। সপ্তরথী নাটকের অন্যতম মহারথী অস্ত্রগুরু দ্রোণাচার্যের ভূমিকাটি অভিনয় করবার জন্য দৈবক্রমে এই অধীনকেই আজ আপনাদের সামনে টেনে এনে হাজির করা হয়েছে। এসব আমার কস্মিনকালে অভ্যাস নাই মশায়, শেষ পর্যন্ত পেরে উঠলে হয়। যদি কোন ভুলভ্রান্তি ঘটেই যায়—নিজ গুণে মার্জনা করবেন। জয় হিন্দ্।

দর্শকদের মধ্যে হঠাৎ একটা হালকা হাসির হুল্লোড় পড়ে গেল। পুনশ্চ করতালি বর্ষণ। রঙ্গমঞ্চের ভিতর থেকে কে যেন হঠাৎ চাপাগলায় বলে উঠলো,—ড্রপসিন ফেলে দাও, ড্রপসিন ফেলে দাও, দাঁড়িয়ে সব করছো কি!

অন্তরালে আর একদফা ঐকতান বাদ্য সুরু হয়ে গেল।

সপ্তরথীর অভিনয় যে শেষ পর্যন্ত এতখানি জমে উঠবে, আগে থেকে ঠিক ভাবতে পারা যায় নি। প্রথম অঙ্ক তৃতীয় দৃশ্যের সুরু থেকে ওই যে নাটকের টেম্পো গেল উঠে—সপ্তরথীর বেড়াজালে ঘিরে গাণ্ডীব-ধম্বা তৃতীয় পাণ্ডবের

একমাত্র বংশদুলাল বীর অভিমন্যুর নিধন দৃশ্য পর্যন্ত দর্শকদের চোখে আর পলক পড়তে দেয় নি। অভিনয় পরিসমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে দ্রোণাচার্য-বেশী হাজারিদা দর্শকদের সামনে এসে আর একটিবার বিশেষ ঘোষণায় জানিয়ে দিলেন,—তরুণ-সঙ্ঘের পরবর্তী আকর্ষণ 'রাবণবধ' প্রভৃতির পথে।

দর্শকরা বাইরে থেকে আর একদফা হৈ-চৈ ক'রে উঠলো। অতঃপর শেষবারের মত যবনিকা পতন। রাত তখন প্রায় দু'টো।

আট

বারোয়ারি তলার ফাংশন কবে শেষ হয়ে গেছে! ব্যোমকেশ কিন্তু পুরাতন ক্লাবঘরের মায়া এখনো কাটাতে পারে নি। কোম্পানীর খালি ব্যারাকটা চুনকাম করিয়ে বিজলিবাতি জ্বেলে দেওয়া হয়েছে। ভৃত্য বাণেশ্বর কর্তাবাবুর নির্দেশমত কয়েকখানা চেয়ার টেবিল পর্যন্ত সাজিয়ে দিয়ে এসেছে, জামাইদাদাবাবুর নতুন কেলাব-ঘরে। ভবেশবাবু ব্যোমকেশকে জানিয়ে দিয়েছেন ক্লাবঘর প্রস্তুত, যত শীগগির সম্ভব এইখানেই তাদের উঠে আসতে হবে। ব্যোমকেশ কিন্তু ক্রমাগত গড়িমসি করছে। আদৌ সে এখানে আসতে চায় কিনা, ঠিক বোঝা যাচ্ছে না।

ভবেশবাবু এজন্য একটু ক্ষুব্ধ হয়ে আছেন। শেষ পর্যন্ত জামাতা বাবাজীবন তাঁর এ প্রস্তাবে যদি রাজী না হন, বাধ্য হয়ে তাঁকে আর একটুখানি কঠোর হতে হবে। কোম্পানী থেকে নোটিশ দিয়ে বর্তমান ক্লাব ঘরটা ওদের তুলে দিতে হবে ওখান থেকে। এইভাবে বাবাজীবনকে বয়ে যেতে দেওয়া কোনমতেই চলে না। শ্রীমানকে একটু সংযত করতে না পারলে অদূর ভবিষ্যতে ভবেশবাবুকে যে বিশেষ একটা অসম্মানকর অবস্থার মধ্যে পড়তে হতে পারে, সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নেই। ভবেশবাবুর একমাত্র কন্যা, একমাত্র স্নেহের আধার, জীবনের ঐ একটিমাত্র অবলম্বন—তার অনির্দিষ্ট ভবিতব্য নিয়ে এভাবে আর ছিনিমিনি খেলা যায় না। বাবাজীবনের

খামখেয়ালির প্রশ্রয় দেওয়া কোনমতেই আর সম্ভব নয়। ভবেশ মুখুজ্যের জামাই বলে পরিচয় দিতে হলে আগে তাকে ভদ্র হতে হবে, জনসমাজে মানুষ বলে পরিচয় দেবার যোগ্যতা অর্জন করতে হবে। এর ব্যতিক্রম তর্সহ্য করতে পারবেন না ভবেশবাবু। না-না এতখানা তিনি সহ্য করতে প্রস্তুত নন।

কার যে কোথায় কতটুকু সহের সীমা অতিক্রম ক'রে ক্রমাগত বাইরের দিকে ছিটকে পড়ছে ব্যোমকেশ, সে খবর সে কোনদিনই রাখে না। ওটা তার অভ্যাসের বাইরে। শ্বশুরবাড়ীর অনারারি সার্ভিস শৌখিন এই জামাইগিরির অনাবশ্যক দায়িত্বভার থেকে ইচ্ছে করলেই সে যে কোন মুহূর্তে মুক্ত হয়ে যেতে পারতো। সে চেষ্টা এ পর্যন্ত সে করে নি কিন্তু আত্মসম্মান বজায় রেখে তাকে চলতেই হবে। সেদিক থেকে এতটুকু ব্যতিক্রম সে কোনমতেই সইবে না। এ বিষয়ে ব্যোমকেশ অতিমাত্রায় সজাগ। কোনরকম অসম্মানকর অবস্থার সঙ্গে আপস ক'রে চলা তার পক্ষে অসম্ভব।

এই সমস্ত অনাবশ্যক কূটপ্রশ্ন নিয়ে কোনদিনই মাথা ঘামায় নি ব্যোমকেশ। তেমন কোন প্রয়োজনও ঘটে নি। কিন্তু সম্প্রতি কেমন কেমন যেন একটু ঠেকছে ব্যোমকেশের কাছে। কোথায় যেন একটু টান পড়ছে।

শ্বশুর মশায় ফতোয়া দিয়েছেন তরুণ-সঙ্ঘের ক্লাবটিকে শিকড়সুদ্ধ উপড়ে এনে কোম্পানীর ওই ব্যারাকের কম্পাউণ্ডে টবের মাটিতে পুঁততে হবে। তা সে বাঁচতে পারে ভালই, মরলেও কোন ক্ষতি নাই। এখানে আসার অসুবিধা যে কতখানি, ব্যোমকেশ তা কেমন ক'রে বোঝাবে। বড় জোর একটা নির্ভেজাল গানবাজনার আসর এখানে কোনরকমে চলতে পারে। কিন্তু মুস্কিল হবে নাটকের মহলা দেবার সময়। সপ্তরথী পালাখানা যখন তৈরি করা হয়, পুরো চারটি মাস বামাপদর বৈঠকখানায় কুরুক্ষেত্র কোলাহলের ঝড় বয়ে গেছে। ঠিক সেই টেম্পো বজায় রেখে এখানে এসে কি রাবণ-বধের মহলা দেওয়া সম্ভব। হেড কম্পাস গণপতিবাবুর দশমুণ্ড দশানন, আর বদন সরকারের পবনপুত্র হনুমান, কে কাকে সামলায়, রাত দুপুরে পাড়ার লোকের ঘুম ভেঙ্গে গেলে আসবে হয়ত লাঠি নিয়ে তাড়া ক'রে।

ভাববে বুঝি ডাকাত পড়েছে। শেষ পর্যন্ত ওরা শ্বশুরমশায়ের কাছে জয়েণ্ট পিটিশন না ক'রে কি ছাড়বে। ব্যস্—তাহলে আর দেখতে হবে না, ওইখানেই ক্লাবসুদ্ধ যবনিকা পতন! এমন একটা চালু ক্লাব, এই সমস্ত দায়িত্বের মধ্যে টেনে আনা কি উচিত হবে। ব্যোমকেশ কিন্তু ভাল বুঝছে না।

বারোয়ারিতলায় তরুণ-সঙ্ঘের নাট্যানুষ্ঠানের পর ব্যোমকেশের নাম কিন্তু চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। কাছাকাছি কয়েক জায়গা থেকে অনুরোধ পর্যন্ত এসে গেছে শৌখিন নাট্যসম্প্রদায়ের পরিচালনা ভার গ্রহণ করবার জন্য। পাশের গ্রামের কয়েকজন সঙ্গীতানুরাগী তরুণ যুবক গ্রামে একটি সঙ্গীত-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মহান সঙ্কল্প নিয়ে সম্প্রতি ব্যোমকেশ বাবুর সঙ্গে গভীরভাবে আলোচনা করে গেছে। তাদের একান্ত ইচ্ছা ব্যোমকেশ বাবুকে ধরে নিয়ে গিয়ে উক্ত সঙ্গীতভবনের প্রধান আচার্যের পদটি অলঙ্কৃত করা। এখন দয়া ক'রে ব্যোমকেশ বাবু যদি রাজী হন।

রাজী অবশ্য এতদিন হয়েই যেতো ব্যোমকেশ। কিন্তু হাতে সম্প্রতি জরুরী কিছু কাজ রয়েছে। প্রেমশংকরজী বিরাট এক জলসার আয়োজন করেছেন মোহনপুর কুঠিতে। মাঝে আর কয়েকটি দিন মাত্র বাকি। প্রযোজনা ও পরিচালনার যাবতীয় দায়িত্বভার ব্যোমকেশকেই গ্রহণ করতে হয়েছে, বন্ধুবরের একান্ত অনুরোধে। বিভিন্ন স্থান থেকে কয়েকজন কলারসিক কালোয়াত সঙ্গত শিল্পীকে আহ্বান করা হয়েছে অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য। এর সর্বাঙ্গীন সাফল্য ও বন্ধুবরের সম্মানরক্ষা সব কিছু এখন নির্ভব করছে একমাত্র ব্যোমকেশের উপর। অঞ্চলটা প্রায় চষে ফেললে ব্যোমকেশ প্রেমশংকরজীর ক্যাডিলাকে চড়ে। ভদ্রলোককে কথা দিয়ে নিশ্চেষ্ট বসে থাকা ত চলে না।

প্রেমশংকরজী রসিক এবং রসগ্রাহী ব্যক্তি। ব্যোমকেশকে তিনি বহুকষ্টে আবিষ্কার করেছেন। জহুরী নইলে রতন চিনবে কে। সামনের এই জলসার লাইম লাইটে মিঃ ব্যানার্জিকে একটু বুম করতে চান তিনি। উপরন্তু মিসেস ব্যানার্জিকেও যেমন ক'রে হোক ধরে আনবার তালে আছেন। এই মজলিসে দু'একখানা গান তাঁকে গাওয়াতেই হবে।

শাহানীজীর একান্ত অনুরোধে সে কথা কিন্তু ব্যোমকেশকে স্বীকার করে নিতে হয়েছে। উপায় ছিলো না। মিসেস ব্যানার্জি, অর্থাৎ কিনা ব্যোমকেশ-বধূ শ্রীমতী সরযূ বন্দ্যোপাধ্যায় যে বিশেষ একজন প্রতিভাময়ী সঙ্গীতশিল্পী, একথা ব্যোমকেশ বহুবার গেয়ে রেখেছে প্রেমশংকরজীর কাছে। কাজের বেলা সে পিছিয়ে পড়বে কেমন করে। আনতেই হবে সরযূকে ধরে। গান তাকে গাওয়াতেই হবে। প্রেমশংকরজীর মত বিশেষ একজন সম্মানী বন্ধুলোকের কাছে কথা দিয়ে কথার খেলাপ ত করা চলে না।

সেদিন বারোয়ারি-তলার অনুষ্ঠানে সপ্তরথীর অভিনয় দেখতে গিয়েছিলো সরযূ। ব্যোমকেশের মধ্যস্থতায় বন্ধুপত্নীর সঙ্গে শাহানী সাহেবের ক্ষণিকের জন্য দেখা-সাক্ষাৎ। শুধু নমস্কার ও প্রতিনমস্কারের মধ্যে দিয়ে সেদিনকার মত আলাপ-পরিচয়ের পরিসমাপ্তি। প্রেমশংকরজী কিন্তু মুগ্ধ হয়ে গেলেন ভদ্রমহিলার সৌজন্য দেখে। হাসি হাসি মুখ, ছোট্ট একটি নমস্কার। চলে গেলেন যেন সঙ্গীতের একটি মূর্ছনা, ধীরে ধীরে যেন মিলিয়ে গেলেন বাতাসের বুকে। এ চার্মিং বিউটি। ব্যোমকেশবাবু সেদিক থেকে যে বিশেষ একজন ভাগ্যবান ব্যক্তি, সে বিষয়ের সন্দেহ কি। সামনের এই জলসা উপলক্ষে সরযূ দেবীর সম্মানার্থে সেই সঙ্গে একটা 'এ্যাট হোম পার্টি'র ব্যবস্থা পর্যন্ত ক'রে ফেলেছেন প্রেশংকরজী। সে ব্যবস্থা না করে কি পারেন তিনি! অনুষ্ঠানের কর্মসূচী ও কয়েকশত নিমন্ত্রণের কার্ড ইতিমধ্যে ছাপতে দেওয়া হয়ে গেছে। সময় যে আর বেশি নাই মোটেই।

ব্যোমকেশ ছিনে-জোঁকের মত ছেঁকে ধরছে সরযূকে। মোহনপুর কুঠির জলসায় তাকে যেতেই হবে। এ আবার এক নতুন উপসর্গ। সরযূ কিছুতেই রাজী হতে চায় না। কিন্তু রাজী না হবে তার রেহাই কোথায়। প্রচারপত্রের একেবারে গোড়ার দিকে মোটা হরফে তার নাম পর্যন্ত যে ছাপা হয়ে গেছে—"কণ্ঠ ও যন্ত্রসঙ্গীতে বুলবুলকণ্ঠী শ্রীমতী সরযূ বন্দ্যোপাধ্যায়।" অন্যান্যদের মধ্যে আছেন ;"—নৃত্যে শ্রীরাজারাম কাহাল ও শ্রীমতী ছবিরাণী পৈতুণ্ডা। হাস্য কৌতুক অভিনয়ে নবদ্বীপের প্রখ্যাত শিল্পী শ্রীগৌরাঙ্গ হালদার।" ইত্যাদি আরও অনেকেই। একেবারে চার ঘণ্টার ঠাসা

প্রোগ্রাম। ব্যোমকেশ ছাপার অক্ষরে ধরে দিলে সরযূর চোখের সামনে। এর পর আর কথা চলে কি। এ অনুষ্ঠানে ব্যোমকেশ সস্ত্রীক যোগদান করতে না পারলে শাহানী সাহেবের কাছে সে মুখ দেখাবে কেমন ক'রে।

সরযূর মুখখানা শুকিয়ে যেন এতটুকু হয়ে গেল। বললে,—তুমি একলাই যাও, আমাকে নিয়ে এই সমস্ত ছেলেমানুষি তুমি করো না।

ব্যোমকেশের স্বামীত্বের অভিমানে একটু বুঝি ঘা লাগলো। তবু মনের ভাব চেপে রেখে কিছুটা যেন সহজ কণ্ঠেই বলে উঠলো ব্যোমকেশ,—বেশ,—যেতে যদি একান্তই না চাও, আমি তোমায় জোর করবো না। কিন্তু একটা কথা তোমাকে স্মরণ করিয়ে দিই। একমাত্র তোমারই অনুরোধে নেশা পর্যন্ত ছাড়তে আমি রাজী হয়েছি। আজ যদি এইভাবে আমাকে শাহানীর কাছে অপদস্থ হতে হয়, তাহলে কিন্তু আমার সে প্রতিশ্রুতি সম্বন্ধে আর আমার কোন দায়িত্ব রইলো না, ভবিষ্যতে এই নিয়ে যেন কোনদিন আর অনুযোগ করো না।

সরযূ বিব্রত হয়ে উঠলো। এ আবার কি হিতে বিপরীত। ব্যোমকেশকে একটু সামলে নেবার চেষ্টা ক'রে বললে,—কিন্তু তোমার আমার ইচ্ছেই কি সব। বাড়ীতে যে গুরুজনেরা রয়েছেন, তাঁদের একটা অনুমতি নেওয়া দরকার ছিলো না কি।

ব্যোমকেশ বুঝি একটুখানি আশ্বস্ত হলো। যাক, সেও এক মন্দের ভাল। শান্তভাবেই আবার বলে উঠলো ব্যোমকেশ,—সেজন্য তোমার চিন্তার কোন কারণ নাই। ওদিকটা আমি ঠিক ক'রে নেব। এখন তুমি শুধু রাজী হলেই হয়।

সরযূ এবার নিরুত্তর হয়ে গেল। ব্যোমকেশ পুনরায় বললে, তাহলে এই কথা রইলো। কাল বেলা চারটের মধ্যে তৈরি হয়ে থেকো। গাড়ী এলেই চটপট গিয়ে উঠে পড়বে। যন্ত্রগুলো সব ঠিক আছে ত?

সরযূ জবাব দিলে,—সে সব ঠিকই আছে। শুধু এস্রাজে একটা তার বেঁধে নিতে হবে।

ব্যোমকেশ বললে,—তারটা এক সময় মনে করে লাগিয়ে নিয়ো। আমায় আবার কাল সকালের দিকেই বেরুতে হবে কিনা, ফিরবো সেই বিকেলে।

সরযূর মনের মধ্যে এখন থেকেই কেমন যেন একটু ভয় ভয় করছে। কোথায় যে সে মোহনপুরের কুঠি, কে জানে। শাহানী সাহেবের সঙ্গে এতখানা মাখামাখিই বা কিসের। কোনদিক থেকেই ব্যবস্থাটা বেশ ভাল বুঝছে না সরযূ।

জলসার দিন। বেলা চারটের কিছু আগেই এসে বাড়ী ঢুকলো ব্যোমকেশ। সরযূ তখনো বাইরে বেরুবার মত সাজগোজ কিছু করে নি। ব্যোমকেশ ঘরে ঢুকেই বলে উঠলো,—একি, এখনো তৈরি হও নি যে! একটু তাড়াতাড়ি কর, বাইরে গাড়ী দাঁড়িয়ে আছে। চটপট আমি মুখ-হাতটা ধুয়ে আসি।

সরযূ বললে,—কিন্তু বাড়ীর কাউকে এ কথা ত কই জানালে না তুমি।

ব্যোমকেশ জবাব দিলে,—সে আমি এক্ষুনি সব ঠিক ক'রে ফেলছি। তুমি শুধু তৈরি হলেই হয়।

ব্যোমকেশ বেরিয়ে গেল কলতলায় মুখ হাত ধুতে। শশীমুখী দেবীর সঙ্গে সামনা-সামনি দেখা হয়ে গেল রান্নাঘরের রকে। এই সুযোগে ব্যোমকেশ প্রসঙ্গটা তুলেই ফেললে। সরযূকে সঙ্গে নিয়ে ব্যোমকেশকে আজ বেরুতে হবে একটা গানের জলসায়। শশীমুখী দেবীকে তাই অনুরোধ করলে ব্যোমকেশ, তিনি যেন সরযূকে একটু বুঝিয়ে বলেন যাতে সে আর কোন আপত্তি করতে না পারে।

শশীমুখী দেবী জলখাবারের আয়োজন নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। ব্যোমকেশের দিকে চেয়ে বললেন,—কদ্দূর যেতে হবে বাবা, আজকেই ফিরবে ত ?

ব্যোমকেশ চটপট বলে উঠলো,—আজ্ঞে হ্যাঁ, এই যাবো আর আসবো, খুব বেশী দেরি হবে না।

বাণেশ্বরের হাত দিয়ে কর্তাবাবুর চা জলখাবারটা পাঠিয়ে দিলেন শশীমুখী দেবী। ব্যোমকেশ গেল মুখহাত ধুতে।

সরযূ কেশ প্রসাধন শেষ ক'রে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে গাল দু'টোতে স্নো ঘষছিলো। ঘরে ঢুকেই বলে উঠলো ব্যোমকেশ—ছাড়পত্র মঞ্জুর হয়ে

গেছে, মাকে আমি রাজী ক'রে ফেলেছি। তুমি আর দেরি করো না, চটপট জামাকাপড়টা ছেড়ে নাও।

সরযূ একটু মৃদু হেসে বললে,—তুমি তাহলে ওঠ, চেয়ারখানা চেপে আবার বসলে কেন ?

সঙ্গে সঙ্গে আবার বলে উঠলো ব্যোমকেশ,—আমার জন্যে ভাবছো কেন, ধুতি চাদর পাণ্টাতে আমার বড়জোর তিন মিনিট। তুমি ত আগে সেরে নাও।

আবার বললে সরযূ মুচকি একটু হেসে, তুমি গিয়ে একটু বাইরে দাঁড়াও, কাপড় ছাড়বো যে।

ব্যোমকেশ একটু সজাগ হয়ে উঠলো—ঠিক ঠিক—রাইট। কিন্তু কোন্ শাড়ীটা আজ পরছো, আসমানী বেনারসী, না মাদুরাই বুটি ?

সরযূ বললে, শান্তিপুরি ডুরে।

ব্যোমকেশ কিছু না বুঝেও বলে উঠলো—চমৎকার মানাবে। কিন্তু খোঁপাটা যে তোমার খালি, বাগান থেকে দুটো শ্বেতকরবী তুলে নিয়ে আসি।

তাড়াতাড়ি আবার বেরিয়ে গেল ব্যোমকেশ।

বাণেশ্বর গড়গড়ায় তামাক সেজে কর্তাবাবুর ঘরে গিয়ে ঢুকলো। তামাক সেজে অতি বিনীত ভাবে নিবেদন করলে বাণেশ্বর—আজ্ঞে চাবিটা কি এখন আমার কাছেই থাকবে ?

ভবেশবাবু বাণেশ্বরের দিকে তাকালেন। বললেন, কিসের চাবি ?

—আজ্ঞে বেরাক ঘরে কেলাব ত এখনো খোলা হলো না। দু'বেলা শুধু ঝাড়ু দেওয়াই সার হচ্ছে। তাই বলছিলাম চাবিটা এখন আপনার কাছেই না হয় থাক।

ভবেশবাবু নিশ্চিন্তে আরাম-কেদারায় হেলান দিয়ে বললেন, ও—এই কথা। হবে হবে—ব্যারাক ঘরেই ক্লাব খোলা হবে। আচ্ছা ব্যোমকেশকে ডেকে আর একবার আমি বলে দিচ্ছি।

—আজ্ঞে উনি ত এখন গাওনা করতে বেরুচ্ছেন।

—গাওনা করতে বেরুচ্ছেন, কোথায় ?

—আজ্ঞে সেটা ঠিক বলতে পারবো না। তবে দিদিমনিও সাজগোজ করছেন দেখলাম, ওঁরা বোধ হয় একসঙ্গেই বেরুবেন।

ভবেশবাবু একটু বিস্মিত হলেন। কি যেন একটু ভেবে বললেন,—দিদিমনি, দিদিমনি আবার কোথায় বেরুবেন ?

বাণেশ্বর একটু ভারিক্কী ভাবে জবাব দিলে,—তা আজ্ঞে বেরুতে হবেন বৈকি, তেনাকেও যে আজ নাচগান কি সব করতে হবেন সেখানে গিয়ে। সেই রকমই ত শুনলাম।

ভবেশবাবু একটু অপ্রসন্ন হয়ে উঠলেন। বললেন—যাকগে—যেখানে খুশি যেতে দে। চাবিটা কিন্তু তোর কাছেই থাকলো,—ওটা আবার হারাস না যেন !

বাণেশ্বর জবাব দিলে,—আজ্ঞে না, চাবি আমার কাছে হারাবে না, ঘুনসিতে বাঁধা আছে কিনা। কেলাব ঘরে তাহলে ঝাড়ুটা আর একবার দিয়েই আসি। থাকলো চাবি আমার কাছে।

ব্যোমকেশ একেবারে ফিটফাট রেডি হয়ে গেছে। সাজগোজ ক'রে সরযূও তৈরি। মনের ভিতর থেকে সরযূ কিন্তু বেশ সাড়া পাচ্ছে না। ব্যোমকেশ এস্রাজখানা সরযূর হাতে ধরিয়ে দিয়ে সেতারটা নিলে নিজের ঘাড়ে ফেলে। শশীমুখী দেবী তবু একটু ইতস্তত করে বললেন,—কর্তামশায়কে একটু বলে গেলে হতো না, বাবা !

ব্যোমকেশ বললে,—আর সময় কোথায়, আপনি তাঁকে জানিয়ে দিলেই ত চলবে।

সরযূকে আর একটা তাড়া দিয়ে বললে ব্যোমকেশ,—এসো এসো, আর দেরি করো না, কখন থেকে গাড়ী দাঁড়িয়ে আছে। সেতারখানা ঘাড়ে ফেলে এগিয়ে গেল ব্যোমকেশ। সরযূ তার পিছু পিছু নামলো গিয়ে উঠানে। শশীমুখী দেবী কি আর করতে পারেন। সরযূর পিছু পিছু তিনিও খানিকটা এগিয়ে গিয়ে দাঁড়ালেন উঠানের এক পাশে। সদর দোরের কাছাকাছি

পৌঁছে গেছে ব্যোমকেশ, কর্তাবাবু গৃহাভ্যন্তর থেকে বেরিয়ে এলেন। সাড়া দিলেন দূর থেকে,—একটুখানি দাঁড়াও।

ব্যোমকেশ দাঁড়ালো একটু থম্‌কে। ভবেশবাবু ধীরে ধীরে বেরিয়ে এলেন ঘর থেকে। বারান্দার নীচে গিয়ে দাঁড়ালেন, বললেন,—কোথায় যেতে হবে?

ব্যোমকেশ জবাব দিলে,—আজ্ঞে মোহনপুর কুঠিতে গানবাজনার একটা জলসা আছে।

ভবেশবাবু জিজ্ঞাসু দৃষ্টি মিলে পুনরায় বললেন,—গানবাজনার জলসা! তা সরযূ গিয়ে কি করতে পারে সেখানে?

—সরযূকে তাঁরা বিশেষভাবে নিমন্ত্রণ করেছেন। তাকেও দু'একখানা গান গেয়ে শুনাতে হবে কিনা।

—সরযূ গিয়ে গান শোনাবে, মোহনপুরের কুঠিতে!

—আজ্ঞে হ্যাঁ, ভয়ের কোন কারণ নাই, রীতিমত প্র্যাকটিস করেছে।

- কিন্তু তুমি গোড়াতেই একটু ভুল করছো বাবাজী। আমাদের বাড়ীর মেয়েরা এইভাবে কখনো বাইরে কোনদিন গাইতে বেরোয় নি। এটা তাদের শিক্ষা-সহবতের বাইরে। জলসায় গিয়ে তারা নাচে না।

ভবেশবাবুর বনিয়াদী আভিজাত্যের ইতিহাসের পাতায় এ জাতীয় দৃষ্টান্ত সত্যই খুঁজে পাওয়া মুস্কিল। ব্যোমকেশের এ প্রস্তাব কোনমতেই সমর্থন-যোগ্য বলে মনে করেন না তিনি। ব্যোমকেশ পুনরায় বলে উঠলো,—কিন্তু প্রেমশংকরজীকে আমি কথা দিয়েছি, এই জলসায় সরযূ গিয়ে তাঁদের গান শোনাবে।

ব্যোমকেশের দিকে আর একটিবার ফিরে দাঁড়ালেন ভবেশবাবু, বললেন—, গান যদি শোনাতেই হয়, তাঁদের নিমন্ত্রণ ক'রে একদিন নিয়ে এসো আমার বাড়ীতে, অভ্যর্থনা ক'রে বৈঠকখানা ঘরে বসাও, একটা কেন—যত খুশি গান তাঁরা শুনে যান, আমি কোন আপত্তি করবো না।

ভবেশবাবুর এ প্রস্তাব যে অতি উত্তম, সে কথা ব্যোমকেশ অস্বীকার করছে না। কিন্তু আপাতত এসব গভীর যুক্তির সারবত্তা গ্রহণ করবার মত

ব্যোমকেশের মনের অবস্থা নয়। হাত-ঘড়িতে ঘন ঘন সময় দেখতে লাগলো। পুনরায় বলে উঠলো ব্যোমকেশ,—আজ কিন্তু আমাদের যেতেই হবে, সেখানে আমরা কথা দি'য়েছি, অকারণ আপনি ক্ষুব্ধ হবেন না।

সরযূকে লক্ষ্য ক'রে কড়া একটা তাগিদ দিয়ে বলে উঠলো ব্যোমকেশ, হাঁদার মত চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলে কেন, পা চালিয়ে একটু এগিয়ে এসো না।

ভবেশবাবু এতক্ষণ ক্ষুব্ধ হন নি, এবার কিন্তু সত্য সত্যই ক্ষুব্ধ হয়ে উঠলেন। বললেন,—শোন বাবাজী, এগুলো একটু বাড়াবাড়ি হচ্ছে। যেতে হয় তুমি একলা যাও, সরযূর কিছুতেই যাওয়া হবে না।

ব্যোমকেশের জামাতৃসুলভ আভিজাত্যের ধ্বজাটা চিলেকোঠা ভেদ ক'রে আকাশপানে বুঝি ফুঁড়ে উঠলো। তার আত্মসম্মানে চোট লাগলো নাকি?

মরীয়া হয়ে বলে উঠলো ব্যোমকেশ,—কিন্তু সরযূকে যেতেই হবে, তাকে না নিয়ে আমি এখান থেকে একটি পাও নড়বো না।

—তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি বাবাজী! আমি আবার বলছি—সরযূর কিছুতেই যাওয়া হবে না।

ভবেশবাবুর ভ্রূ দু'টো কুঞ্চিত হয়ে উঠলো। সরযূকে লক্ষ্য ক'রে বলে উঠলেন,—তুই এখান থেকে একটু সরে যা ত মা, আমি জানি—এসব তুই সইতে পারবি না।

সরযূ একটু হকচকিয়ে গেছে। কয়েক পা সে পিছিয়ে গিয়ে দাঁড়ালো।

ব্যোমকেশ যেন গ্যাসলাইটের বার্নারের মত দপ্ ক'রে একবার জ্বলে উঠলো। ফেটে পড়বে নাকি? তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলে উঠলো ব্যোমকেশ,—কিন্তু একটা কথা আপনি ভুলে যাচ্ছেন, সরযূ আমার বিবাহিতা স্ত্রী, দরকার হলে আমি তাকে জোর ক'রে ধরে নিয়ে যাব।

—জোর ক'রে ধরে নিয়ে যাবে! ভবেশ মুখুজ্যের চোখের সামনে থেকে! অবাক হয়ে গেলেন ভবেশবাবু। ব্যোমকেশের দিকে তীব্র একটা দৃষ্টি হেনে পুনরায় বলে উঠলেন,—জোর ক'রে ধরে নিয়ে যাবে, না! আমি এখনো বেঁচে আছি, না মরে গেছি ভেবেছো।

পুনরায় বললে ব্যোমকেশ,—সরযূর উপর এভাবে খবরদারি করবার আপনার কোন অধিকার নেই। আমি তাকে জোর করেই ধরে নিয়ে যাব।

—কি বললে, অধিকার! এ তুমি কি বলছো বাবাজীবন! আমার সামনে থেকে জোর ক'রে তাকে ধরে নিয়ে যাবে, না!

ব্যোমকেশ বলে উঠলো,—নিশ্চয়, আপনার এই সমস্ত বাড়াবাড়ি সহ্য করতে আমি কিছুতেই রাজী নই।

স্পর্ধার চরম। বিচলিত হয়ে উঠলেন ভবেশবাবু। পিছন দিকে চেয়ে তীব্রকণ্ঠে হাঁক দিলেন, বাণেশ্বর, বাণেশ্বর, আমার চাবুকটা একবার নিয়ে আয় দেখি।

শশীমুখী দেবী তাড়াতাড়ি ছুটে এসে বললেন,—এ তুমি কি বলছো! ভবেশবাবু শশীমুখী দেবীকে মৃদু একটু ধমক দিয়ে বললেন, সরে যাও—সরে যাও তোমরা এখান থেকে, এ সময় আর বাজে বকতে এসো না, বাবাজীর একটু শিক্ষা হওয়া দরকার।

তীর-বিদ্ধ সজারুর মত দাঁড়াগুলো উঁচিয়ে রুখে দাঁড়ালো ব্যোমকেশ। হঠাৎ কি মনে ক'রে নিজেকে আবার সঙ্গে সঙ্গে গুটিয়ে নিলে যেন। ব্যোমকেশ পুনরায় বলে উঠলো,—বেশ, তাহলে একটা বোঝাপোড়াই আজ হয়ে যাক আপনার সঙ্গে। রইলো আপনার মেয়ে, আহ্লাদী পুতুলের মত রাংতা দিয়ে মুড়ে আলমারিতে সাজিয়ে রাখুন। কিন্তু দেশে এখনো আইন-কানুন আছে, সরকারী আদালত আছে। ওই মেয়ে একদিন ঘাড়ে করে আমার কাছে পৌঁছে দিয়ে আসতে হবে, এই আমি আপনাকে বলে গেলাম।

স্তম্ভিত হয়ে গেলেন ভবেশবাবু। শশীমুখী দেবীকে লক্ষ্য ক'রে বললেন, শুনছো—শুনছো গিন্নী, বাবাজীবন আমাদের চোখ রাঙিয়ে আইন আদালতের ভয় দেখাচ্ছেন। এর চেয়ে বিচিত্র আর কি হতে পারে।

ভবেশবাবুর চোখ দিয়ে যেন আগুন ঠিকরে পড়লো। ব্যোমকেশের দিকে আর একটুখানি এগিয়ে গিয়ে বজ্রকণ্ঠে বলে উঠলেন,—বেরিয়ে যাও—বেরিয়ে যাও এখান থেকে, বেরিয়ে যাও স্কাউণ্ড্রেল। গেট আউট—গেট আউট—

ব্যোমকেশ আর এক মুহূর্ত দাঁড়ালো না। সরযূর সেতারখানা বারান্দার একপাশে নামিয়ে দিয়ে ঝড়ের বেগে বেরিয়ে গেল বাড়ী থেকে।

শশীমুখীদেবী কান্নায় যেন ভেঙ্গে পড়লেন, বললেন,—এ তুমি কি করলে, ছেলেটাকে একেবারে তাড়িয়ে দিলে বাড়ী থেকে!

ভবেশবাবুর মনের উপর চারিদিক থেকে চাপ পড়ছে। উত্ত্যক্ত কণ্ঠে বলে উঠলেন,—সরে যাও—সরে যাও আমার সামনে থেকে। ঘরের মধ্যে গিয়ে হাত-পা ছুঁড়ে যত খুশি কাঁদোগে। আমাকে আর এভাবে তোমরা দগ্ধ করতে এসো না।

দালানের একপাশে হতাশ হয়ে গিয়ে বসে পড়লেন শশীমুখী দেবী। মেয়েটার অদৃষ্টে শেষ পর্যন্ত যে কি আছে, ভগবান জানেন। কিন্তু সরযূ এ সময় গেল কোথায়!

ঘরের মধ্যে পালঙ্কের উপর উপুড় হয়ে বালিশের উপর মুখ গুঁজে কখন শুয়ে পড়ছে সরযূ। গোলাপী রঙের সিল্কের কাপড় জড়ানো নতুন তারে স্বর-বাঁধা তার এস্রাজখানা পালঙ্কের উপর নির্জীব হয়ে পড়ে আছে একপাশে।

শশীমুখীদেবী চোখে আঁচল চাপা দিয়ে নিজের মনেই একবার রুদ্ধকণ্ঠে বলে উঠলেন,—ওরে ফিরে আয়—ফিরে আয়, এই ভাবেই কি রাগ ক'রে চলে যেতে হয়!

ভবেশবাবু তখনো উঠানে দাঁড়িয়ে উত্তেজিত ভাবে পায়চারি করছিলেন। বাণেশ্বর বারদিক থেকে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে এসে হাত জোড় করে বলে উঠলো,—কর্তাবাবু—কর্তাবাবু, দাদাবাবুকে হাতে পায়ে ধরে ফিরিয়ে আনবো? এখনো হয়ত চেষ্টা করলে ওঁকে ধরে আনা যায়। কিন্তু আর দেরি হলে যে গাড়ী করে উধাও হয়ে যাবে।

ভবেশবাবু নিজের হাতে সদর দরজাটা বন্ধ করে ভিতর দিক থেকে খিল এঁটে দিলেন। কঠোর কণ্ঠে আদেশ করলেন বাণেশ্বরকে,—নীচের কড়া দুটোতে বেশ শক্ত করে একটা তালা লাগিয়ে দে।

নয়

মোহনপুর কুঠিতেই কাজ শেষ পর্যন্ত একটা জুটে গেল ব্যোমকেশের। লোকাল সেল ডিপার্টমেণ্ট। ঝাঁকড়া একটা মহুল গাছের নীচে ছোট একটা গুমটিঘর। সামনের বিস্তীর্ণ ডাঙ্গাটা জুড়ে থরে থরে কয়লার গাদা সাজানো। ফুট তিরিশেক লম্বা, পনের বিশ ফুট চওড়া, আর ফুট দুয়েকের মত উঁচু এক-একটা কয়লার গাদা। দূর-দূরান্ত থেকে পল্লীগ্রামের গাড়োয়ানেরা রাতারাতি এসে মহুলবাগানের গাড়ী খুলে দেয়। সকাল বেলা গুমটিঘরের ফোকর দিয়ে কয়লার রসিদ কেটে গাদা ভেঙ্গে গাড়ী বোঝাই করে। ব্যোমকেশ গুমটির ভিতর থেকে টাকা পয়সা গুণে নিয়ে একে একে রসিদ কেটে দেয়। গুমটির সামনে বে-আইনী ভিড় করবার উপায় নাই। রসিদ বইয়ের পাতার মধ্যে কারবন কাগজ গুঁজতে গুঁজতে হঠাৎ পেন্সিলটা কানে গুঁজে গুমটির ফোকর দিয়ে বাইরের দিকে তাকায় ব্যোমকেশ, গাড়োয়ানদের হাঁক দিয়ে বলে ওঠে,—লাইন—লাইন, একে একে সব কিউ দিয়ে এসো। হুড়োহুড়ি ঠেলাঠেলি করলে কাউণ্টার আমি বন্ধ করে দেব।

গুমটিবাবুর তাড়া খেয়ে গাড়োয়ানেরা আবার একের পর এক সার দিয়ে দাঁড়ায়। ফোকর বন্ধ হয়ে গেলে কয়লা পাওয়া যাবে না।

কোম্পানির ভার-প্রাপ্ত মুন্সী রামরূপ সিং গজকাঠি দিয়ে মাপ ক'রে কয়লার গাদার উপর চকখড়ি দিয়ে দাগ টেনে দেয়, গরুর গাড়ীতে কয়লা বোঝাই করে। নির্দিষ্ট সীমার বাইরে একটি চাং কয়লা তুলবার উপায় নাই। মুন্সীজীর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি সেদিক পানে অতি মাত্রায় সজাগ। তেমন ধারা এক-আধটা অবৈধ ব্যাপার মাঝে মাঝে চোখেও পড়ে যায়। চোখ তেড়ে বলে ওঠে রামরূপ,—এত্তো বড় চাংটা ফোকটেই মারিয়ে লেবে নাকি হে, গিরাও—গিরাও ফিন গাদামে।

অসতর্ক গাড়োয়ান একটু অপ্রস্তত হয়ে কয়লার ফালতু চাংটা আবার গাদার মধ্যেই ফেলে দেয়। আট মনের জায়গায় পাক্কী দশ মন মাল

তোলবার হুকুম ত কেউ দেয় নি তাকে। ধরা না পড়লে অবশ্য অন্য কথা ছিলো। মুন্সীজী আপসোস ক'রে বলে উঠে,—আরে ছো ছো ছো—ধরম বোলিয়ে দুনিযামে কুছভি আর থাকলো না, কি আপসোসকা বাত।

ওরই মধ্যে আছে আবার দু'চারটে তঁ্যাদড় গাড়োয়ান, মুন্সীজীর 'ধরম তত্ত্ব' সম্বন্ধে শ্রদ্ধা যাদের অগাধ। ষোল আনা ইমানদারি বজায় রেখেও ফালতু মাল কেমন করে সরাতে হয় তারা জানে। ঠারে ঠোরে মুন্সীজীর সঙ্গে আলাপ জমিয়ে তাল বুঝে তার হাতে দাও দু'চার আনা পান খেতে গুঁজে। পারো যদি তাড়াতাড়ি সরিয়ে নাও আরও দু'চার মন পাশের গাদা থেকে। মুন্সীজী ততক্ষণ চোখ বুজে ডিউটি ক'রে যাবে। সেই ফুরসতে দশ আনা মন কয়লা রিবেট বাদ দিয়ে তিন পয়সা বেটে বিক্রি হয়ে গেল কোম্পানীর অজান্তে। গোটাগুটি এক টাকার নোট সাহস ক'রে যদি ধরিয়ে দিতে পার, টাকাটা নেহাত জলে পড়বে না। ছ'মনের রসিদের উপর মুন্সীজীর চকখড়ির অমনি দাগ পড়ে গেল বারো মনের সীমানায়। ঠেসে নাও যত পারো মোষের গাড়ীতে। গাড়ীর লিগে জোঁযাল আড়াখাট, অর্থাৎ কিনা শানা ফানা না ভাঙ্গলেই হলো। একাজ অবশ্য বেশ একটু সাবধানেই করতে হয় মুন্সীজীকে। নেহাত চেনাশুনা খরিদ্দার না হলে সহজে কাউকে পাত্তা দেয় না। কোম্পানীর নোকর হয়ে দায়িত্বের কথাও একটু ভাবতে হয় বৈকি। যার তার সঙ্গে এতবড় একটা চিটিংবাজির কাজ রামরূপ মুন্সী করে না। সেই জন্যই ত কোম্পানীর ঘরে সুনামটুকু আজ পর্যন্ত বজায় আছে রামরূপের। সকলেই জানে রামরূপ মুন্সী লোকটি বড় খাঁটি। কুঠীর মধ্যে ইমানদার বলতে যদি কেউ থাকে, সে একমাত্র ওই রামরূপ। শুধু গুমটিবাবু একটু হাতে থাকলেই হলো। মুন্সীজীর একমাত্র হিসাবদার উনিই। তাতে অবশ্য এমন কিছু ঠকা নেই। দু'চার টাকা যদি বারফটকা আমদানি হয়ে গেল, গুমটি-বাবুর হাতে ধরে দাও গিয়ে চা খেতে গণ্ডা আটেক পয়সা। ব্যস্—তা হলেই ঠাণ্ডা। বাদবাকিটা রামরূপের। এই ধারাই ইস্তক চলে আসছে মোহনপুরের কুঠিতে।

নতুন এই গুমটিবাবুটিকে রামরূপ কিন্তু এখনো হাত করতে পারে নি। কোনরকমে একবার কাত ক'রে হাত তাকে করতেই হবে। ধাতটা যদি একটু কড়াই হয় তাতেই বা কি। উঠতে বসতে তিন বেলা সেলাম ঠুকে বাবুমশায়কে শেষ পর্যন্ত অতিষ্ঠ করে তুলবে না রামরূপ! কাত না হয়ে তার উপায় আছে। সে সব কৌশল বেশ ভাল রকমই জানা আছে রামরূপের। কলিয়ারির গুমটিবাবুকে কোনদিন সে বাবু বলে না, বরাবর তার হুজুর বলাই অভ্যাস। যে লোকটাকে খাস মুলুকের কেউ কোনদিন বাবু ছাড়া ভুলেও কোনদিন হুজুর বলে ডাকলো না, রামরূপের কাছে সেই একমাত্র হুজুর। তার শ্রীবদনের গদগদ বাণী শুনলে পাষাণ পর্যন্ত গলে যায়, গুমটিবাবু ত রক্ত-মাংসে গড়া মানুষ।

ব্যোমকেশ কাজের ফাঁকে গুমটির ফোকর দিয়ে মুখ বাড়িয়ে হাঁক দেয়,—রামরূপ!

রামরূপ মুন্সী কয়লার গাদায় দাগ কাটা বন্ধ রেখে জোর গলায় জবাব দেয়,—হুজুর।

—আমায় এক গেলাস জল খাওয়াতে পার রামরূপ!

—জী হুজুর। বরফ দিয়ে নিয়ে আসবো?

ব্যোমকেশকে সে কথার আর জবাব দিতে হয় না; এক লহমায় কোত্থেকে যে বরফ জল হাজির ক'রে দেয় রামরূপ, তা একমাত্র সেই জানে। কোনদিন বা সোডাপানি। কাচের গেলাস ভর্তি ক'রে ধরে দেয় এনে গুমটি-বাবুর সামনে। ব্যোমকেশ একটু অবাক হয়ে বলে—সোডাপানি আবার কোত্থেকে নিয়ে এলে রামরূপ!

রামরূপ হাতজোড় ক'রে বলে ওঠে,—খান হুজুর, বারোনের সোডা আছে, দাওয়াই-কাভি কাম কোরবে।

এহেন রামরূপকে অগ্রাহ্য ক'রে চলা কি যেন তেন গুমটিবাবুর কাজ।

ব্যোমকেশ গুমটিঘরে তালা দিয়ে বাইরে গিয়ে মহুলবাগানে দাঁড়ায়। কয়লার গাদাগুলোয় ঘুরে ফিরে চোখ বুলিয়ে একটা আন্দাজ ক'রে নেয় মোটামুটি ঠিক আছে কি না। পিটখাদের লাগাও ওই ৭ং ঝুরিয়া খাদটা থেকে

কয়লার ঝুড়ি মাথায় নিয়ে সার দিয়ে সব আসে কয়লাখাদের কামিনরা। মহুলবাগানের চত্বরটায় গিয়ে কয়লা ঢেলে দেয়। গাদা সাজ্‌বার লোক আছে আলাদা। কামিনরা শুধু মাথায় ক'রে বয়ে দিয়েই খালাস। গুমটিবাবুর লক্ষ্য আছে কুলিকামিনদের উপর। কাজে কারো ফাঁকি দেবার উপায় নাই। কোম্পানীর কাছে রিপোর্ট হয়ে গেলে হাজরি কাটা যাবে যে।

নিশি কামিন গুমটিবাবুর কাছে হঠাৎ সেদিন একটা বিড়ি চেয়ে বসলো। মুচকি একটু হেসে বললে,—কয়লা বয়ে বয়ে থকে গেলুম বাবু, দাও কেনে একটা বিড়ি খাঁওয়াই।

ব্যোমকেশ একটু তাকালো নিশির দিকে। কলিয়ারির ফচ্‌কে একটা কামিন। বিড়ি চায়, আবার মুখ টিপে টিপে হাসে। কেস থেকে একটা সিগারেট বের ক'রে নিশির হাতে ধরিয়ে দিলে ব্যোমকেশ, বললে,—যা যা—এবার সরে পড়, কাজ কামাই করিস না।

সিগারেটটা কপালে ঠেকিয়ে গুমটিবাবুকে সেলাম দিয়ে সরে পড়লো নিশি। ব্যোমকেশ একটু অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলে রামরূপকে,—কে ও কামিনটা?

রামরূপসিং জবাব দিলে,—ও শালী ভারি বদমাস আছে হুজুর, যার তার কাছে হরদম খালি বিড়ি চায়। একদম বে-শরম। এক ঝোড়া কয়লা যদি ডেরায় গিয়ে পৌঁছে দিয়ে আসতে বলি, তুরুন্ত অমনি বোলিয়ে উঠবে, পান খাইয়ে দে। শালী এত্তো বড় বদমাস।

রামরূপের মত একজন আধাবয়সী সাধুসন্ত মানুষকে নিশির মত একটা 'ছোকড়ী' কামিন বলে কিনা পান খাইয়ে দে। সীয়ারাম, সীয়ারাম।

ব্যোমকেশ গিয়ে গুমটি ঘরের টুলে বসে হিসাবপত্রের খাতা ওল্টায়। গুণে-গেঁথে ক্যাশ অফিসে টাকাগুলো জমা দিয়ে হোটেলে যায় খেতে।

মাসখানেক এখান ওখান ঘুরে ফিরে শেষ পর্যন্ত প্রেমশংকরজীর কুঠিতেই কাজ একটা নিতে হলো ব্যোমকেশকে। কলিয়ারির অফিস স্টাফে বর্তমানে তেমন কোন কাজ খালি না থাকায় ব্যোমকেশকে মহুলতলার গুমটিঘরে গিয়ে বসতে হয়েছে। কোয়ার্টারের অভাবে এই তেপান্তরের মাঠে সম্প্রতি

আধা-কোয়ার্টার আধা-ধাওড়া গোছের ছোট একটা ঘরে কোন রকমে মাথা গুঁজে আছে। বন্ধুবর প্রেমশংকরজীর কাছ থেকে আর একটুখানি ভদ্রস্থ কিছু আশা করেছিলো ব্যোমকেশ। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তেমন কোন লক্ষণই দেখা গেল না। মাস তিনেকের জন্য বাইরে কি একটা বিশেষ কাজে বেরিয়ে গেছেন তিনি। ভরসা দিয়ে গেছেন ফিরে এসে ব্যোমকেশের জন্য আর কদ্দূর করতে পারেন ভেবে দেখবেন। সম্প্রতি কিছুদিন কয়লার ডিপোয় তাকে কাটাতেই হবে। ব্যোমকেশ তাই শেষ পর্যন্ত ধিক মেরে গুমটিবাবুর টুলখানা দখল ক'রেই বসে পড়েছে, হাতের কাছে রসিদপত্র গুছিয়ে। এ অবস্থায় হঠাৎ গিয়ে সে মাথা গুঁজে দাঁড়াবেই বা কোথায়। তার চেয়ে গুমটিবাবু গুমটিবাবুই সই, বাবু ত একটা বটে। কেটে যাক কিছুদিন। একটু শুধু অসুবিধা দেখা দিয়েছে খাওয়া দাওয়ার ব্যাপার নিয়ে। কোন এক অজ পাড়া গাঁ থেকে আনকোরা এক বামুন ঠাকুর এসে কলিয়ারিতে ছোটখাটো একটা হোটেল খুলে বসেছে। কি জঘন্য তার রান্না, মুখে দেওয়া যায় না, দেওয়া দুঃসাধ্য। প্রাণের দায়ে খাচ্ছে তবু অনেকেই। ব্যোমকেশের কিন্তু পোষালো না। তার চেয়ে নিজের হাতে ভাতে-ভাত রান্না ক'রে খাওয়া অনেক ভাল। সেই ব্যবস্থাই করছে ব্যোমকেশ, হাটিয়া থেকে রান্নার সরঞ্জাম ও যাবতীয় জিনিসপত্র কিনে এনে সব গোছ-গাছ ক'রে ফেলেছে। স্বপাক রান্না এবার চালু করলেই হয়।

রবিবারের ছুটির দিন। সকালবেলা উঠে নিজের হাতে উনুন তৈরী করতে আরম্ভ করেছে ব্যোমকেশ। কলিয়ারির নিশি কামিন ঝোড়াখানেক পোড়া কয়লা আর কতকগুলো কাঠ ঘুঁটে মাথায় ক'রে হাজির হলো এসে ব্যোমকেশের বাসায়। মাথা থেকে ঝুড়িটা এক পাশে নামিয়ে কয়লাগুলো উঠানের এক কোণে ঢেলে দিলে নিশি। ব্যোমকেশের উনুন তৈরির বাহার দেখে হো হো করে হেসে উঠলো, বললে—উ কি করে উনুন পাতছো বাবু, উন্নাতে কি আঁচ হয়। দিব নাকি আমি উনানটা পেতে।

ব্যোমকেশ নিশির দিকে ফিরে একটু তাকালো। বললে,—জানিস নাকি উনুন পাততে। দে তাহলে, ভালই হলো।

এক মগ জল নিয়ে হাতের কাদাটা ধুতে আরম্ভ করলে ব্যোমকেশ। নিশি কামিন কয়েকখানা ইট আর গোটাকয়েক লোহার শিক দিয়ে কাদা লেপে লেপে চমৎকার একটা উনুন তৈরি ক'রে ফেললে কয়েক মিনিটের মধ্যেই। ব্যোমকেশ অবাক হয়ে গেল। নিশি যে এত কাজের মেয়ে তা জানা ছিলো না। কলিয়ারির পুকুরে খাদ থেকে অন্যান্য কামিনদের সঙ্গে ঝোড়া মাথায় ক'রে নিশি শুধু কয়লা চোলাই করে না, উনুন পাততেও জানে।

ব্যোমকেশ বুঝি একটু কৃতজ্ঞ হয়ে উঠলো নিশির কাছে। বললে, চা খাবি, নিশি! বোস তাহলে, কাঠ কুঁচো দিয়ে জল একটু গরম ক'রে ফেলি।

নিশি একটু ইতস্ততঃ করতে লাগলো। কিন্তু গুমটিবাবুর অনুরোধ উপেক্ষা করতে পারল না। বেতের ঝুড়িটা দাওয়ার উপর উল্টে নিয়ে তারই উপর পা ছড়িয়ে বসে পড়লো।

নতুন পাতা উনুনটার মধ্যেই কয়েক টুকরো কাঠ ফেলে দিয়ে কেরোসিন ঢেলে দেশলাইয়ের জলন্ত একটা কাঠি ঠেকিয়ে দিলে ব্যোমকেশ। হু হু ক'রে আগুন জলে উঠলো। কিন্তু কেটলিটা এবার প্রচণ্ড ওই আগুনের শিখার উপর ধরে থাকা যায় কেমন ক'রে। ব্যোমকেশ অসহায় দৃষ্টি মেলে নিশির দিকে তাকালো একবার, বললে—এইবার কি করা যায় নিশি? জলটা একটু গরম ক'রে দিতে পারিস।

নিশি একটু চোখ তেড়ে বলে উঠলো—ই বাবারে, আমরা যে ছোট জাত বাবু!

ব্যোমকেশ নিশির দিকে কেটলিটা বাড়িয়ে দিয়ে বললে—জাত আবার ছোটবড় হয় নাকি, ধর-ধর—কেটলিটা ধর। চা একটু তৈরি ক'রে খাইয়ে দিয়ে যা।

নিশি জিভ কেটে আবার বলে উঠলো, ই বাবারে, লোকে শুনতে পেলে বলবেক কি বাবু! বলবেক ওই নিশি হারামজাদী গুমটিবাবুর জাত মেরে দিয়ে গেল।

ব্যোমকেশ হাসতে হাসতে বললে,—তা বলুক, ওতে কারো জাত যায় না।

সাঁড়াশি দিয়ে কেটলিটা ধরে জল খানিকটা গরম ক'রে ফেললে নিশি। দু'কাপ চা তৈরি ক'রে কাপ ডিশটা বাড়িয়ে দিলে ব্যোমকেশের দিকে। এলুমিনিয়মের গেলাসটা তার নিজের জন্য।

ব্যোমকেশ চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে বললে—বাঃ—এমন চমৎকার চা তৈরি করতে শিখলি কোথায় নিশি।

হাসতে হাসতে জবাব দিলে নিশি, মেয়েছেলেকে ইসব কাজ আবার শিখতে হয় নাকি বাবু, ঘরকন্না করতে করতে আপনা থেকেই হয়ে যায়।

—তা ঘর কন্নাটি বেশ জমিয়ে ফেলেছিস মনে হচ্ছে। স্বামীটা তোর কি কি কাজ করে ?

নিশি একটু লজ্জা পেয়ে গেল, মুখ টিপে একটু হেসে বললে,—সোয়ামী আবার পেলে কুথা বাবু, খালভরা যে আজ চার বছর মরছে।

—এ্যাঁ—মারা গেছে! কিন্তু তোদের ত আবার সাঙা চলে শুনেছি, করলি না কেন ?

—কই আর করলোম বাবু। আমি সাঙা করলে আমার মা বুড়ীকে দেখবেক কে, চোখে দেখতে পায় না ; হাত ধরে এঘর ওঘর করাতে হয়। কে জানে বাবু, শেষ পর্যন্ত কাণা হয়ে যাবেক নাকি!

চায়ের বাসনগুলো মেজে রকের একপাশে নামিয়ে দিলে নিশি। মা বুড়ী তার চোখে ভাল দেখতে পায় না। তাকে ছেড়ে যায় কেমন ক'রে নিশি। ব্যোমকেশের শ্রদ্ধা যেন বেড়ে গেল নিশির উপর। নিশির প্রাণ আছে। অবাক বিস্ময়ে নিশির দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছে ব্যোমকেশ। তার আপাদ-মস্তক লক্ষ্য ক'রে পুনরায় সে বলে উঠলো—কিন্তু এতখানি ফিটফাট—এত. সাজগোজ, এসব তুই কার জন্যে করিস নিশি! ধপধপে জামাকাপড়, হাত ভরতি বেলোয়ারি চুড়ি, খোঁপায় গোঁজা ঝুমকোফুলী কাঁটা, এসব তোর কার জন্যে বল্ দেখি।

নিশি একটু লজ্জা পেয়ে গেল, বললে—ওই দেখ, সব কথাই তোমাকে খুলে বলতে হবেক নাকি। তা হলে বলি শোন, নইলে হয়ত আবার অন্য কিছু ভাববে। ময়লা অপরিষ্কার আমি থাকতে পারি না বাবু, আমার

কস্মিনকালে অব্যেস নাই। গায়ের রঙটা একটু ময়লা হলেও লোকে বলে আমার চেহারাটা নাকি এমন কিছু মন্দ না। ভগবানের দেওয়া এমন একটা সুন্দর জিনিসকে কালিঝুলি মাখিয়ে রাখি কেমন ক'রে বল ত। অথচ লোকে কিন্তু অন্যরকম ভাবে। তুমিই বল না কেনে বাবু, ফরসা একখানা কাপড় পরলে আর মাথায় দুটো ফুল গুঁজলেই কি কেউ খারাপ হয়ে যায় ?

নিশির প্রাণ আছে, রুচি আছে, সৌন্দর্যবোধ আছে। আবার গুছিয়ে গাছিয়ে বেশ চমৎকার ক'রে কথা বলাও অভ্যাস আছে নিশির। ব্যোমকেশের মনের মধ্যে সাড়া দিয়ে গেল একটা অকারণের খুশি। নিশির কথার জের টেনে বললে ব্যোমকেশ,—তাও কখনো হয়, লোকের কথায় খারাপ হতে যাবি কেন। কিন্তু আমার যে একটা ঠিকের ঝি দরকার নিশি, পারবি তুই ফুরসৎ-মত বাসনপত্রগুলো মেজে দিয়ে যেতে।

নিশি একটু ভেবে বললে,—মাকে তাহ'লে শুধাই গিয়ে, আসতে যদি বলে ত আসবো। কিন্তু ইভাবে তোমার চলবেক নাই বাবু, বৌদিদিকে নিয়ে এসো কেনে।

ব্যোমকেশ একটু চোখ তেড়ে হতাশ ভাবে বললে,—বৌদিদি! সে কি আজও আছে।

—নাই নাকি ? বিয়ে কর নি বুঝি।

—বিয়ে একদিন করেছিলাম নিশি, তোর কাছে মিথ্যে বলবো না। কিন্তু আমার বরাতে টিঁকলো কই।

নিশির মুখখানা বিমর্ষ হয়ে গেল। ভাগ্যটা বেশ ভাল না গুমটিবাবুর। নইলে এই বয়সে বৌ মারা যাবে কেন। নিশি একটু সান্ত্বনা দিয়ে বললে,—দুঃখ ক'রে আর কি হবেক বাবু, আবার তুমি বিয়ে করগা। নইলে তোমার ঘর সংসার সামলাবেক কে।

ব্যোমকেশ এবার হেসে উঠলো,—একটা বিয়ের ঠেলা এখনো সামলাতে পারি নি আবার বিয়ে। বিয়ে আর আমি করবো না নিশি, সংসারের ওপর আমার ঘেন্না ধরে গেছে।

নিশি একটু অবাক হয়ে গেল, বললে,—কি জানি বাবু, মুখ্যু-সুখ্যু মানুষ আমরা, অতশত আমরা কি বুঝবো। এবার কিন্তু আমি যাই বাবু, আমার মা বুড়ী আবার খুঁজে বেড়াবেক।

ব্যোমকেশ একটা সিগারেট ধরিয়ে বললে,—বিড়ি খাবি না?

ব্যোমকেশের হাত থেকে একটা সিগারেট নিয়ে খোঁপার মধ্যে গুঁজে ফেললে নিশি, বললে,—ঘরে যেয়ে খাবগা, মা বেটিতে আলাপালি ক'রে। আমার মা বুড়ী আবার কাগজের বিড়ি খেতে খুব ভালবাসে কিনা।

ব্যোমকেশের টাটকা-পাতা-উনুনটায় কতকগুলো ঘুঁটে আর কয়লা ফেলে দিয়ে খালি ঝুড়িটা মাথায় ক'রে বেরিয়ে গেল নিশি।

ব্যোমকেশ অবাক হয়ে যায়। কি বিচিত্র এই জীবনের গতি। কে জানতো যে মোহনপুর কয়লাকুঠিতে গুমটিবাবুর কাজ নিয়ে আবার তাকে নতুন ক'রে জীবন শুরু করতে হবে। চোখের সামনে এতটুকু আলো নাই, আশা নাই, ভরসা নাই, নাই কোন নূতনতর সান্ত্বনা। জীবনের বোঝা তবু টেনে যেতে হবে। হাঁপিয়ে পড়লে ত চলবে না ব্যোমকেশের। দুঃখের কাছে নতি স্বীকার কোনদিন সে করে নি, আজও করবে না। জীবনের সুখ-স্বপ্ন যদি ভেঙ্গে গিয়ে থাকে তাতেই বা কি এসে যায়। ভাঙ্গনের স্বপ্ন দিয়ে জীবনের সে ক্ষয়-ক্ষতি ভরে তুলবে ব্যোমকেশ। দুঃখ যদি আসে আসুক, ব্যোমকেশ তাকে ভয় করে না। ঐশ্বর্যের সোনার খাঁচায় স্বেচ্ছায় নিজেকে ধরা দিতে গিয়ে কি ভুলই না সে করেছিলো। তার চেয়ে এ মুক্ত জীবন অনেক ভাল, অনেক সুখের! দুঃখকে ঠেকাবার জন্য জীবনের আনন্দকে খুঁজে নিতে হবে, সৃষ্টি ক'রে নিতে হবে তাকে হাতের কাছে যা এলো তার সহজলভ্য সত্বা দিয়ে, আপন মনের ছাঁচে ফেলে। নিজস্ব সেই আনন্দটুকুর মধ্যেই ডুবে থাকতে চায় ব্যোমকেশ, এর বেশী কোন আশা রাখে না।

কলিয়ারির কম্পাসবাবুর ভাগ্নের কাছ থেকে সেকেণ্ড হ্যাণ্ড হারমোনিয়ম একটা যোগাড় ক'রে ফেলেছে ব্যোমকেশ। বহুদিনের অভ্যাস, চর্চাটা তাই

একেবারে ছাড়তে পারছে না। নেহাত যেদিন মনটা চঞ্চল হয়ে ওঠে, সন্ধ্যার সময় বসে এক একদিন হারমোনিয়মখানা নিয়ে। নিজের মনেই সুর বাজিয়ে যায়, কোনদিন বা গুন্ গুন্ ক'রে গেয়ে উঠে পুরোনো গানের দু'একটা কলি। নেশার মাত্রা একেবারে কমিয়ে ফেলেছিলো ব্যোমকেশ, এখানে এসে আবার সেটা বাড়াতে হয়েছে। কান্ট্রি লিকারটা পাওয়া যায় খুব হাতের কাছেই। নিঃসঙ্গ ব্যোমকেশকে মাঝে মাঝে বেশ খানিকটা সঙ্গ দেয় এই মনোমোহিনী কুহকিনী নেশা। বামাপদর হাত-যশ আছে। ব্যোমকেশকে দুঃখ ভোলবার মোক্ষম একটা পথ কিন্তু সে খরিয়ে দিয়েছে। জয় গুরু, জয় হোক তোমার গুরুবংশের।

কলিয়ারির এই অভদ্র খাটুনিটা কিন্তু সইছে না ব্যোমকেশের ধাতে। তাই নেহাত যেদিন শরীরটা ভেঙ্গে পড়ে, এই সুরা দেবীর শরণাপন্ন না হয়ে উপায় থাকে না। সঙ্গে সঙ্গে চাঙ্গা হয়ে ওঠে ব্যোমকেশ এই সর্বসন্তাপহারিণীর অমোঘ আশীর্বাদে।

কলিয়ারির অফিসে খাজাঞ্চীর কাছে টাকা-কড়িগুলো জমা দিয়ে আজ একটু সকাল সকাল বাসায় ফিরছে ব্যোমকেশ। সন্ধ্যার আগেই দু' এক পাত্র টেনে নিয়ে হারমোনিয়মখানা খুলে বসছে। একটানা আলাপ চলছে পূরবী। কী উদাস, কী করুণ, দিনান্তের মর্মভেদী উচ্ছ্বাস রক্তরাঙা গোধূলির বেদনায় থেকে থেকে যেন খান খান হয়ে ভেঙ্গে পড়ছে। ঘরের এক কোণে চৌকির উপর বসে বসে নিজের মনেই একটানা বাজিয়ে যাচ্ছে ব্যোমকেশ। নিশি কামিন কখন যে এসে উনুনে আঁচ দিয়ে বাসন মাজতে শুরু ক রেছে, কিছুমাত্র ভ্রুক্ষেপ নাই।

দাদাবাবুর বাজনার সুরটি বড় মিঠে। কলতলায় বাসন মাজতে মাজতে উৎকর্ণ হয়ে শুনে যায় নিশি। মনের মধ্যে কোথায় যেন একটা টান পড়ে।

মহল তলার গুমটিবাবু নিশির কাছে আজ আর গুমটিবাবুটি নাই, কিছুদিনের আলাপেই হয়ে উঠেছে দাদাবাবু। হয়ত বা তার কণোচ্চারিত বৌদিদির পরমাত্মীয়তার সুবাদে। কেটলি ক'রে চায়ের জল চাপিয়ে লণ্ঠনের আলোটা জেলে ফেললে নিশি। ঘরের মধ্যে আলো দিতে গিয়ে দেখে

ব্যোমকেশ তন্ময় হয়ে হারমোনিয়মে সুর বাজাচ্ছে। নিশি একটা ডাক দিলে,—দাদাবাবু!

ব্যোমকেশ চোখ মেলে তাকালো। বললে,—কে? ও নিশি, কতক্ষণ এসেছিস?

—অনেকক্ষণ এসেছি দাদাবাবু। বাজনায় তুমি মশ্‌গুল হয়ে ছিলে তাই লক্ষ্য কর নি। দাদাবাবু, তোমার চোখ দিয়ে জল পড়ছে কেন?

—এঁ্যা—জল পড়ছে, কৈ না ত।

ব্যোমকেশ রুমাল দিয়ে মুখটা একটু মুছে নিল। কি সুর যে এতক্ষণ ধরে সে বাজালে, কেনই বা ওসব দুঃখের স্মৃতি নিয়ে মনটাকে নাড়া দিতে গেল ব্যোমকেশ। ওসব চিন্তা ছাড়তে হবে ব্যোমকেশকে, আর একেবারেই বন্ধ করে দিতে হবে এই গানবাজনার চর্চাটা। পূরবী আর ভৈরবী রাগে বুকের কান্না ঢেলে দিয়ে এভাবে সে চোখের জলের অপচয় করতে চায় না।

চায়ের পেয়ালাটা এনে ব্যোমকেশের হাতে ধরিয়ে দিলে নিশি। বললে,—রাত্রের জন্য রুটি, না পরোটা দাদাবাবু!

ব্যোমকেশ চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিয়ে বললে, দু'চার খানা রুটিই কর। দুধটা যেন জাল দিয়ে ঢেকে রেখে যাস।

নিশি খুব চটপটে মেয়ে। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই দাদাবাবুর রাত্রের আহার প্রস্তুত ক'রে ফেললে। খাবারগুলো টেবিলের উপর ঢাকা দিয়ে বললে,—খাবার সময় জল এক গেলাস গড়িয়ে নিয়ো। আমি এখন যাই দাদাবাবু।

ব্যোমকেশ এতক্ষণ ধরে কি যেন ভাবছিলো। নিশির সাড়া পেয়ে যেন তার সম্বিত ফিরে এলো। বললে,—এর মধ্যেই চলে যাবি নিশি, আর একটুখানি বসে যা না।

নিশি কোন আপত্তি করলে না। শুধু আব্‌দার ক'রে বলে উঠলো,—তাহলে একটি গায়েন শোনাও।

কেরোসিন কাঠের ছোট্ট-মত বাক্স একটা টেনে নিয়ে ব্যোমকেশের চৌকি ঘেঁসে বসে পড়লো নিশি। ব্যোমকেশ হাসতে হাসতে বললে,—গান শুনবি, কিন্তু কি গান তোকে শোনাই বল্ দেখি।

—যা তোমার খুশি। কিন্তু সেদিন যে একটা গাইছিলে গুন্ গুন্ ক'রে, ও গান যেন গেয়ো না দাদাবাবু। ও কি গান, ইনিয়ে বিনিয়ে কে যেন ফুলে ফুলে কাঁদছে, ও কান্নার গান আমি সইতে পারি না। তার চেয়ে একটা ডাঙ্গালে গান গাও না, দাদাবাবু!

—কি বললি নিশি, ডাঙ্গালে গান, মানে ঝুমুর? তুই ঠিক বলেছিস নিশি, এবার থেকে ডাঙ্গালে গানই গাইবো। তোর খুব ভাল লাগে বুঝি?

—খুব ভাল লাগে, দাদাবাবু।

ব্যোমকেশ চৌকির নীচে থেকে মদের বোতলটা টেনে নিয়ে বললে,—থাম তা হলে, মনটা একটু চাঙ্গা ক'রে নি আগে। গলাটা একটুখানি ভিজিয়ে নেওয়া যাক, কি বল্। খাবি একটু নিশি!

নিশি মাথা নেড়ে বলে উঠলো,—না দাদাবাবু, ফটকে মদের নেশা আমার সয় না, তার চেয়ে আমাদের এক আধ ঢোক ওই কাঁচি নেশাই ভাল।

ব্যোমকেশ বললে,—খেয়েই দেখ না একটুখানি।

ঢক ঢক ক'রে বোতলের মুখেই বেশ খানিকটা পান ক'রে ফেললে ব্যোমকেশ। বাকিটুকু নিশির দিকে এগিয়ে দিয়ে বললে,—খা—খেয়ে নে এইটুকু।

—যদি মাথা ঘুরোয়, বুক ঢাই ঢাই করে।

—কিছু করবে না, খুব অল্প দিয়েছি।

এ কোন্ নেশায় নিশিকে হঠাৎ পেয়ে বসলো আজ। দাদাবাবুর অনুরোধ সে উপেক্ষা করবে কেমন ক'রে। হাত বাড়িয়ে মদের বোতলটা নিয়ে বারান্দায় এককোণে গিয়ে অবশিষ্ট পানীয়টুকু শেষ ক'রে দিলে নিশি। মুখটা বেশ ভাল ক'রে মুছে নিয়ে ফিরে এসে হাসতে হাসতে বললে,—বামুনের পেসাদ, তাই না বলতে পারলাম না। এবার কিন্তু একটা গান শোনাও দাদাবাবু। আচ্ছা দাদাবাবু; সেই যে সেই ঝিঙে-ফুলের গায়েনটা তুমি জান? সেই যে গো—'ঝিঙে-ফুল লিলেক জাতি কুল'।

হো হো করে হেসে ফেললে ব্যোমকেশ, বললে,—গানটা তুই জানিস নাকি। কৈ গা দেখি একবার শুনি।

নিশির চোখ দুটো ঢু'ল ঢু'ল করছে। খিল্ খিল্ ক'রে হেসে উঠে বললে,—ই-বাবারে, তোমার কাছে গাইবো কি ক'রে দাদাবাবু, উটা যে অসের গান গো।

ব্যোমকেশের মনে বুঝি রঙ ধরে এলো। রসের গানই যে শুনতে চায় ব্যোমকেশ। নিশির দিকে একটু আড় চোখে চেয়ে বললে,—ধর ধর – আর দেরি করিস না,—

'ঝিঙে ফুল, ঝিঙে ফুল লিলেক জাতি কুল লো,
পিরীতি হলো শূল।'

হারমোনিয়মখানা কোলের কাছে টেনে নিয়ে প্রথম কলিটা গেয়ে দিলে ব্যোমকেশ—'ঝিঙে ফুল লিলেক জাতি কুল'।

পরের কলিটা ধরলে এবার নিশি,—

'ও তার রূপ দেখে সই কুল হারালাম
একি মনের ভুল লো—পিরীতি হলো শূল'।
ঝিঙে ফুল, ঝিঙে ফুল লিলেক জাতি কুল লো,
পিরীতি হলো শূল।'

হারমোনিয়মে টিপ দিচ্ছে ব্যোমকেশ। গেয়ে চললো নিশি,—

'সে যে আমার বুকের জ্বালা,
সে যে আমার গলার মালা ;
ও তার পিরীতি হলো মাথার কাঁটা
পিরীত কানের দুললো—পিরীতি হলো শূল।
ঝিঙে ফুল লিলেক জাতি কুল লো—

ব্যোমকেশ অবাক হয়ে গেল। নিশি যে এত চমৎকার গান গাইতে পারে, এটা তার ধারণাই ছিলো না। আজ থেকে নিশিকে ঝুমুর গানের সাগরেদ ক'রে নেবে নাকি ব্যোমকেশ!

খেয়ালের ঝোঁকে গানখানা হঠাৎ গেয়ে ফেলে নিশি বুঝি একটু লজ্জা পেয়ে গেছে। মুখখানা একটু নীচু করে বললে,—তোমার কাছে বেয়াদপি অনেক করলাম দাদাবাবু, কিছু মনে করলে না ত?

কিছু মনে করবার মত ব্যোমকেশের আর মনের অবস্থা নাই। সামাজিক বাধা-বন্ধন ও মজ্জাগত সংস্কারের বেড়াজাল ছিন্ন ক'রে বাইরে গিয়ে একটু দাঁড়াতে পেলে বেঁচে যায় যেন ব্যোমকেশ। ভদ্রস্থের এই মুখোসটা না হয় খসেই পড়লো, তাতে এমন কিছু ক্ষতি আছে কি!

নেশার ঘোরে ব্যোমকেশ বুঝি কি যেন একটা স্বপ্ন দেখছে। নিশি তাড়াতাড়ি উঠে পড়লো, বললে, এবার আমি যাই দাদাবাবু, অনেকখানি রাত হয়ে গেল।

ব্যোমকেশ বিহ্বল দৃষ্টি মেলে নিশির দিকে চেয়ে হঠাৎ বলে উঠলো,—যদি বলি আজ আর তোর যাওয়া হবে না, এইখানেই থেকে যা।

বুকের ভিতরটা ছাঁৎ ক'রে উঠলো নিশির। বললে,—কি যে তুমি বল দাদাবাবু, পাগলের মত এসব কি বকছো।

ব্যোমকেশের সতৃষ্ণ দৃষ্টি নিশির নীলাঞ্জন আঁখি দু'টি ঘিরে চকিতের মত কি যেন খুঁজছে। আদিমতম পুরুষের বাধাবন্ধ-হীন উদ্দীপ্ত যৌবন ভেঙ্গে-চুরে যেন লুটিয়ে পড়তে চায় বীর্যশুল্কা এক মায়াবিনী নারীর সুকুমার একখানি তনুদেহ ঘিরে। নিশির দিকে স্বপ্নালু দৃষ্টি মেলে ব্যোমকেশ আবার বলে উঠলো,—এখন থেকে তোকে নিয়েই যদি ঘর বাঁধতে চাই, তোর কি কোন আপত্তি আছে, নিশি!

হঠাৎ যেন একটা তড়িৎ প্রবাহ নিশির দেহ মনে ধাক্কা দিয়ে মুহূর্তের জন্য তাকে দুলিয়ে দিয়ে গেল। চমকে উঠলো নিশি। কোনরকমে নিজেকে একটু সামলে নিয়ে বললে,—ছি ছি দাদাবাবু, আমি যে একটা ছোট জাতের মেয়ে, কয়লা খাদের সামান্য একটা কামিন। আমাকে নিয়ে তোমার ঘরবাঁধা কি চলে? লোকে যে তোমাকে ছি ছি করবেক দাদাবাবু!

ব্যোমকেশের কণ্ঠে ফুটে উঠলো অসহায় একটা বেদনার সুর। নিশির দিকে চেয়ে পুনরায় সে বলে উঠলো,—আমি বড় ক্লান্ত, বড় অবসন্ন হয়ে পড়েছি নিশি। আমার এ দুঃসহ অবস্থার কথা অন্য কেউ বুঝবে না। তোর মধ্যে যদি এতটুকু আনন্দের উৎস, একটুখানি সান্ত্বনা আমি খুঁজে নিতে পারি, কার তাতে কি বলবার আছে। বাজে লোকের বাজে কথায় কিছুমাত্র আমার এসে যায় না।

—কিন্তু আমার যে একটু আসে যায় দাদাবাবু, ওই বাজে লোকেরাই গেয়ে বেড়াবেক,—কুলভাঙ্গানী নিশি হারামজাদী গুমটি বাবুকে গুণ ক'রেছে; ভদ্দনোকের ছেলেকে জহল নামে দিয়ে তবে ছাড়লে। একথা লোকে বলবেক কিনা বল!

—কিন্তু আমার জন্যে এটুকু তুই সয়ে নিতে পারবি না, নিশি!

—তোমার জন্য আমি অনেক কিছু সইতে পারি, দাদাবাবু! কিন্তু তোমার বদনাম? সেটাও কি সইতে হবেক। তোমার যে এতে অসম্মান হবেক, দাদাবাবু আমাকে তুমি ঢাকবে কেমন ক'রে।

নিশির মনের মধ্যে একটা ঝড় বইছে। দাদাবাবু তার শিরায় শিরায় এমন ক'রে আগুন ধরিয়ে দিলে কেন। কিন্তু এ প্রলোভন যেমন ক'রেই হোক জয় করতে হবে নিশিকে। নিশি যে একটা এঁটো পাতা– আঁস্তাকুড়ের এঁটোপাতা—সগ্গে যাবে সে কেমন ক'রে। এও কখনও হয়।

মনের আবেগ চেপে রেখে কোন রকমে আবার বলে উঠলো নিশি,—তুমি যে আমাকে এতখানি দয়া কর, এতখানা আস্কারা দাও, এ আমার চোদ্দ পুরুষের ভাগ্যি। কিন্তু আমার মন বলছে এতে তোমার ভাল হবে না। তুমি অথৈ জলে পড়ে যাবে দাদাবাবু, ভরা কলসী গলায় বেঁধে হড়পা বানে ঝাঁপ দিতে যেয়ো না। এ আমি পারবো না দাদাবাবু, এ আমি কিছুতেই পারবো না।

বলতে বলতেই সচকিতে উঠে দাঁড়ালো নিশি। বুকখানা তার দুর দুর ক'রে কাঁপছে। ব্যোমকেশের দুর্নিবার আকর্ষণ চুম্বকের মত টানছে যেন নিশিকে। নিশিকে এবার পালাতে হবে। তাড়াতাড়ি দরজা দিকে পা বাড়িয়ে ব্যোমকেশের সামনে থেকে এক মুহূর্তে ছিটকে যেন বেরিয়ে গেল নিশি।

পিছন দিক থেকে আর একটা ডাক দিলে ব্যোমকেশ, নিশি, নিশি!

একটিবার শুধু পিছন ফিরে ব্যোমকেশের দিকে তাকালো নিশি, দূর থেকেই বলে উঠলো,—কাল সকাল বেলা দেখা হবেক, আজ আর কিছুতেই না।

কিছুদিন থেকে ব্যোমকেশের শরীরটা বেশ ভাল যাচ্ছে না। অতিরিক্ত খাটুনি আর নানাবিধ অনিয়মের ফলে ব্যোমকেশ ক্রমশই অসুস্থ হয়ে পড়তে লাগলো। একটু একটু মাথাধরা আর গা-হাতের বেদনা নিয়ে দু'একটা দিন কোন রকম কাজকর্ম চালিয়ে গেল ব্যোমকেশ। কিন্তু তার পরের দিন থেকেই রীতিমত শয্যা নিতে হলো। জ্বর উঠলো একশ দুইয়ের উপর বিদেশ বিভূঁইয়ে এই ব্রহ্মডাঙ্গার মাঝখানে এমন কেউ নাই যে ব্যোমকেশের এই অসময়ে বিশেষ কোন কাজে লাগতে পারে। আছে শুধু নিশি, নবাগত দাদাবাবুর স্বজন বলতে একমাত্র ওই নিশি কামিন। ব্যোমকেশ শয্যা নিয়েছে, নিশির কিন্তু দুশ্চিন্তার শেষ নাই। কোথায় ওষুধ কোথায় পথ্য এই নিয়েই সে ব্যস্ত হয়ে উঠলো। দাদাবাবুর আপনার বলতে এখানে কেউ নাই যে, এ দায়িত্বটুকু না নিয়ে কি পারে নিশি ?

কলিয়ারির হাসপাতাল থেকে একশিশি ওষুধ আর গোটা-কয়েক ট্যাবলেট এনে ব্যোমকেশকে খাওয়ালে নিশি। জ্বর কিন্তু কমলো না তাতেও। হাসপাতালের বড় ডাক্তারকে ধরে এনে ব্যোমকেশকে একবার দেখিয়ে নেবার ইচ্ছা ছিলো নিশির, কিন্তু কিছুতেই তাঁকে ধরা গেল না। তার দেখা পেলে ত। ডাকতর শুধু নামেই, কাজের বেলা খুঁজে পাওয়া যায় না। সত্যি সত্যি বড় ডাকতর বলে' এখানে কেউ আছে কিনা কে জানে।

নিশির ধারণাটা কিন্তু ঠিক নয়, ডাক্তারবাবু আছেন ঠিকই। কোম্পানীর ঠিকের ডাক্তার, পার্ট-টাইম সার্ভিস, সপ্তাহে তাঁর দু'তিন দিনের বেশী হাজিরা দেবার কথা নয়। আসেন তিনি ঠিক দিন তারিখ ধরেই, ঘণ্টা দু'ই ক'রে কাটিয়ে যান হাসপাতালে। গোটাকয়েক নাড়ী টিপে আর কয়েকখানা প্রেসক্রিপশন লিখে দিয়েই সাইকেল চড়ে আবার রওনা হয়ে যান গাঁয়ের দিকে, প্রাইভেট কল এটেণ্ড করতে। এইটাই এখানকার ব্যবস্থা। তাতে অবশ্য হাসপাতালের এমন কিছু ক্ষতি হয় না। ডাক্তার বাবুর অনুপস্থিতি-কালীন তাঁর ব-কলমে কাজ চালিয়ে যায় রাখহরি কম্পাউণ্ডার। ধরতে গেলে রাখহরিই এখানকার ডাক্তার। একে একে রুগী দেখে ওষুধ লিখে দেয় রাখহরি। নাড়ীটা হয়ত একবার টিপলে, জীবটা একটু দেখলে,

বড়জোর তলপেটের আশেপাশে গোটাকয়েক গুঁতো দিয়ে দেখে নিলে পিলে টিলে কিছু আছে কিনা। ব্যাস্—যথেষ্ট হয়ে গেল ডাইগোনিসিস, মিনিট-দেড়েকের মধ্যেই। তেমন কোন সিরিয়স কিছু বুঝলে স্টেথিস্কোপটা কাঁধের উপর ঝোলানোই আছে রাখহরির, নিলে একবার কানে লাগিয়ে। মিনিট-খানেক পরীক্ষা ক'রে ফতোয়া দিলে,—চাপা একটু সর্দি জমেছে, কিম্বা হয়ত কিছুই জমে নি।

নিজের হাতে ওষুধ তৈরি করে দেয় রাখহরি কম্পাউণ্ডার। চাপা সর্দি বা ছোটখাট জ্বর-জ্বালা গুলো সেরেও যায় তার ওষুধের গুণে। হাতে হাতে ফল দেখিয়ে দেয় রাখহরি। ঔষধ-পত্র কোম্পানী থেকে ফ্রি। ইনজেক্শন দিতে হলেই রাখহরি কিন্তু ফি চায়! একটা টাকা ধরিয়ে দিলেই খুশী। দিন দুই তিন বাড়ী বয়ে পরম যত্নে ছুঁচ ফুঁড়ে দিয়ে আসবে। কলিয়ারির কুলি-কামিনদের কাছে রাখহরি কম্পাউণ্ডারের নাম আছে যথেষ্ট। এ কুঠির ডাক্তার কাগজে কলমে যে-ই থাক, কম্পাউণ্ডার রাখহরি তার চেয়ে ঢের উঁচুতে।

নগদ একটি টাকা ভিজিট দিয়ে রাখহরিকে ধরে নিয়ে এলো নিশি। থার্মোমিটার আর স্টেথিস্কোপ দুটিই ছিলো তার সঙ্গে। ব্যোমকেশকে যথানিয়মে পরীক্ষা ক'রে ওষুধ পথ্যের ব্যবস্থা ক'রে দিলে রাখহরি। যাবার সময় সংক্ষেপে শুধু জানিয়ে গেল,—চিন্তার কোন কারণ নাই ওষুধ এবং পথ্য যেমন চলেছে চলুক।

রাখহরির পিছু পিছু ঘর থেকে বেরিয়ে এলো নিশি। বাইরে এসে পুনরায় জিজ্ঞাসা করলে,—কেমন বুঝেছেন কম্পাউণ্ডার বাবু, তাড়াতাড়ি সেরে উঠবেন ত?

রাখহরি সেই একই জবাব দিলে,—চিন্তার কোন কারণ নাই। বাড়তি কথা যেটুকখানি বাকি ছিলো এই সুযোগে সেরে নিলে রাখহরি। বললে,—রুগী যখন আমার হাতে এসে পড়েছে, নাকে তেল দিয়ে ঘুমো গিয়ে। তোর বাবুকে আমি তিনটি দিনে চাঙ্গা ক'রে দেব। আমার ইনজেক্শনের ফিটা?

নিশি কাপড়ের খুঁট থেকে দু'টাকার একখানি নোট বের ক'রে রাখহরির পাওনা গণ্ডা খাড়া করে দিলে। রাখহরি একটু উৎসাহিত হয়ে বলে

উঠলো,—ওষুধের শিশিটা তাড়াতাড়ি নিয়ে আয়, আমি এগোলাম। তোর বাবুকে আজ এমন একটা তেজী ওষুধ দিয়ে দিব নিশে যে জ্বর বাপ বাপ ক'রে পালাবার পথ পাবে না।

নিশি একটু আশ্বস্ত হয়ে বললে,—মনে ক'রে যেন সেই ওষুধটাই দিয়ো বাবু, শিশি নিয়ে আমি এলুম বলে।

নিশি গিয়ে আবার ব্যোমকেশের চৌকির একপাশে বসে পড়লো। বললে,—এখন কেমন লাগছে দাদাবাবু, মাথাধরাটা কিছু কমলো?

তিনদিন একটানা জ্বরে ভুগে ব্যোমকেশ একটু দুর্বল পড়েছে। মুখে তবু ম্লান একটু হাসি টেনে বললে,—আমার জন্যে এত ব্যস্ত হবার কি আছে নিশি। সামান্য একটু জ্বর-জ্বালা, এমনটা ত প্রায় সকলেরি হয়ে থাকে। তার জন্যে ডাক্তার বদ্যি ডাকবার কোন দরকার ছিলো না।

নিশি একটু ভয়ে ভয়ে বললে,—কিন্তু দাদাবাবু, জ্বরের ঘোরে কাল রাত্রে যে তুমি ভুল বকছিলে। ডাকতর বদ্যি না ডাকলে কি চলে। ভালোয় ভালোয় এখন সেরে উঠলে বাঁচি।

অতি হালকা ভাবে বললে ব্যোমকেশ,—সেজন্যে তোর দুশ্চিন্তার কারণ নাই নিশি, এত সহজে মরছি না আমি।

নিশি চোখ তেড়ে বলে উঠলো,—ও সব অলক্ষুণে কথা মুখে আনছ কেনে দাদাবাবু। একদাগ ওষুধ খেয়ে নিয়ে এবার একটু ঘুমোও দেখি।

ওষুধের শিশিটা খালি ক'রে ছোট্ট একটা কাচের গেলাসে ঢে'লে নিলে নিশি। ধীরে ধীরে ব্যোমকেশের মুখের মধ্যে ঢেলে দিয়ে তোয়ালে দিয়ে মুখখানা মুছিয়ে দিলে। কিন্তু এসব কাজ কি নিশির দ্বারা হয়, এ সময় যে অন্তরঙ্গ আপন জনের দরকার। নিশি একটু ভয়ে ভয়ে বললে,—বৌদিকে একটা খবর দিলে ভাল হতো না, দাদাবাবু।

আবার সেই বৌদিদি, তুই কি আমাকে পাগল না ক'রে ছাড়বি না নিশি!

ব্যোমকেশ একটা দাবড়ি দিয়ে উঠলো। নিশি একটু আমতা আমতা ক'রে বললে,—এই অবস্থায় তোমার যদি কোন বাড়াবাড়ি হয়, তখন তোমাকে সামলাবেক কে দাদাবাবু!

ব্যোমকেশ একটু উত্তেজিত ভাবে জবাব দিলে,—তার জন্যে সরকারী হাসপাতাল আছে। দরকার হয় সেখানে গিয়ে চোখ বুজে পড়ে থাকবো। দুনিয়ায় কারো ভরসা আমি করি না, নিশি !

নিশি এবার চুপ হয়ে গেল। এ অবস্থায় কথা বাড়িয়ে লাভ নাই। কিন্তু বৌদির নাম করলে বাবু এত চটে যায় কেন। নিশির কাছে এ যেন একটা হেঁয়ালি। হয়ত কোন ঝগড়া-ঝাঁটি হয়ে থাকবে। দূর থেকে তাই বৌয়ের উপর আড়ি ক'রে বসে আছেন দাদাবাবু। এ আড়ি কি ওদের ভাঙ্গবে না ? নিশির দিক' থেকে চেষ্টা ক'রে একবার দেখলে কেমন হয়। ক্ষতি আছে কিছু !

ব্যোমকেশকে একটু খানি ডাবের জল খাইয়ে দিয়ে ওষুধের শিশিটা নিয়ে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়লো নিশি। ওষুধ আনতে যেতে হবে।

ব্যোমকেশ চুপচাপ পড়ে আছে বিছানার উপর। কত কি যেন ভাবছে। নিশিকে সেদিন খোলাখুলি এতটা না বললেই ভাল হতো। তার পর থেকে ক্রমাগত সে তাড়া দিচ্ছে—বৌদিদিকে নিয়ে এসো। ওরই যেন মাথাব্যথা সবচেয়ে বেশী। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ব্যোমকেশের শ্বশুর বাড়ীর ঠাঁই-ঠিকানাটি পর্যন্ত জেনে নিয়েছে। এইখানেই একটু ভুল হয়ে গেছে ব্যোমকেশের, নিশিকে ওকথা জানানোই উচিত হয় নি। যাকগে, নিশির কথায় ব্যোমকেশই বা কোন্ যেচে সেধে মাথায় ক'রে আনতে যাচ্ছে তার সাত-পুরুষের বৌদিকে। সে আর হয় না।

হয়ত সে আর হয় না। কিম্বা হয়ত কি যে হয়, আর কি যে হয় না সে কথা কি জোর ক'রে কেউ বলতে পারে।

এ অবস্থায় কাকের মুখে একটা সংবাদ পেলে সরযূ হয়ত আপনা থেকেই হুড়মুড় ক'রে এসে পড়তো মাথায় ক'রে বয়ে আনবার দরকারই হতো না। সরযূকে ব্যোমকেশ ভাল ক'রেই চেনে যে। কিন্তু যাগকে সে সব কথা, অতীত দিনের জের টেনে আর লাভ কি।

ব্যোমকেশের মনের মধ্যে হঠাৎ ভেসে উঠে সেদিনের সেই বিসদৃশ ঘটনার স্মৃতি। চমকে উঠলো ব্যোমকেশ, কি সাংঘাতিক, কি অসম্মানকর সে

অবস্থা। কে যেন ব্যোমকেশের কানের কাছে এসে গর্জে উঠল,—'গেট আউট' —'গেট আউট'। ব্যোমকেশকে যেন পাগল ক'রে দিয়ে গেল। না-না এ দুনিয়ায় ব্যোমকেশের আপন জন বলতে কেউ কোন দিন ছিলো না, আজও কেউ নাই। দুনিয়ায় সে একা।

ভাঙ্গনের কূলে ঘর বাঁধবার চেষ্টা ক'রে কি ভুলই না করেছিলো ব্যোমকেশ। ঝড় তুফানের ঘুর্ণিপাকে পড়ে দু'দিনের সে সুখনীড় ভূমিসাৎ হয়ে গেল এক মুহূর্তে। সে দুঃস্বপ্নের কথা কিন্তু ভুলে যেতে চায় ব্যোমকেশ, পিছন পানে চেয়ে চেয়ে চোখের জলে সে গলে পড়তে চায় না। মাঝে মাঝে তবু সরযূর করুণ মুখখানি চোখের সামনে এমন ক'রে ভেসে ওঠে কেন! জল-ভরা আঁখি দু'টি তার কাকুতি ভরা দৃষ্টি দিয়ে ব্যোমকেশকে যেন বারে বারে এসে তীরের মত বিঁধে যায়। এ দুর্বলতাটুকু ব্যোমকেশ যে কোন মতেই কাটাতে পারলে না আজও। কাটাতেই হবে, মন থেকে একেবারে মুছে ফেলতে হবে ভবেশ বাবুর কন্যার স্মৃতি,—'গেট আউট', 'গেট আউট', মন থেকে সব গেট আউট। দরকার হলে সরযূকে ডাইভোর্স করবে ব্যোমকেশ। আদালতে গিয়ে স্বেচ্ছায় সে নিজের হাতে মুক্ত-পত্র লিখে দিয়ে আসবে। সেও ভাল। এর চেয়ে সেও অনেক ভাল।

ব্যোমকেশের জ্বরটা কি বাড়তির মুখে। বিকারের ঘোরে আবার সে ভুল বকছে না ত। অবসন্ন ব্যোমকেশ একেবারে নেতিয়ে পড়লো।

সকাল থেকে আর দেখা নাই নিশির। কোন্ সেই ভোরবেলা ব্যোমকেশকে একদাগ ওষুধ খাইয়ে দুধ সাবু তৈরি করে টেবিলের উপর ধরে দিয়ে গেছে নিশি। এতখানি বেলা হলো, নিশি ত কই ওষুধ নিয়ে ফিরলো না।

রাত্তিরটা বেশ ভাল কাটে নি ব্যোমকেশের। জ্বরের ঘোরে তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় সারাটা রাত্ত ছটফট করেছে। সকাল থেকে অনেকটা ভাল, কিছুটা যেন সুস্থ বোধ করছে। জ্বরটা বুঝি রেমিশন হলো।

বাইরে দরজা খোলার শব্দ পেয়ে ব্যোমকেশ একটু পাশ ফিরে তাকালো। রামরূপ সিং গোটা-কয়েক কচি ডাব আর একশিশি ওষুধ নিয়ে ঘরে ঢুকলো। শয্যাশায়িত ব্যোমকেশের দিকে চেয়ে সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলো রামরূপ,—হামরাকে থোড়া খবর পাঠিয়ে দেন নি কেন হুজুর, এত্তো তকলিফ করবার কি জরুরৎ ছিলো।

ব্যোমকেশ প্রশ্ন করলে,—হঠাৎ কেমন করে খবর পেলে রামরূপ!

ডাবগুলো মেঝের উপর নামিয়ে রেখে ওষুধের শিশিটা টেবিলের উপর ধরে দিয়ে রামরূপ সিং জবাব দিলে,—নিশি কামিন গিয়ে হামরাকে খবর দিলে হুজুর, বললে বাবু সাবকা বুখার আছে। এই না শুনিয়ে তুরুন্ত হামি চলিয়ে এলুম। খাজাঞ্চীবাবুর বাগানসে ডাব পাড়তে উঠিয়ে দিলুম হামরা ভাতিজাকে, গেটা কয়েক নিয়ে এলুম হুজুর।

বাইরের দিকে তাকিয়ে একটা হাঁক দিয়ে আবার বলে উঠলে রামরূপ,—আরে হেই ছেদিলাল, উল্লুকের মোতন দাঁড়িয়ে আছিস কেন রে, হুজুরকে এক খোরক দাওয়াই খাইয়ে দে না। কি আফসোসকা বাত, এ আদমি, না পায়জামা!

রামরূপের তাড়া খেয়ে এগিয়ে এলো ছেদিলাল, সে যে সত্যি সত্যি একটা পায়জামা নয়, আস্ত একটা আদমী, এ কথা প্রমাণ করবার জন্য সঙ্গে সঙ্গে কাচের গেলাসে বাবু সাহাবের দাওয়াই ঢালতে আরম্ভ করলে ছেদিলাল।

ব্যোমকেশ রামরূপের দিকে চেয়ে পুনরায় জিজ্ঞাসা করলে,—নিশি এলো না, গেল কোথায় সে?

রামরূপ জবাব দিলে,—কি জানি হুজুর, মাসীর বাড়ী না কোথায় যেন ভাগলো, আট বাজেকা লড়িসে। বললে—সামতক হাম ফিরবে। ও লিয়ে আপনি ভাববেন না হুজুর, আমি একলাই দেখিয়ে লিবে, কুছভি তকলিফ হতে দিবে নাই।

ব্যোমকেশ হেসে বললে,—তকলিফ কিসের, তোমরা ত রয়েছ।

রামরূপ একটু চোখ তেড়ে বললে,—বড়া ডাকটর সাবকো হাম পাকড়ে লিয়ে আসবে হুজুর। শুনলাম নাকি এক রোজভি হুজুরকে সে দেখতে

আসলো না। ওর দেমাক হামি দূর করিয়ে দেবে, তব হামারা নাম রামরূপ সিং। কোম্পানীকা তন্‌খা খায় না!

ব্যোমকেশ বাধা দিয়ে বললে,—ডাক্তার আর দরকার হবে না রামরূপ, আমি ত প্রায় সেরে উঠেছি। তুমি বরং মাঝে মাঝে একটু খবর রেখো, তা হলেই যথেষ্ট।

কচি এক্টা ডাব কেটে হুজুরের হাতে কাচের গেলাসটা ধরিয়ে দিলে রামরূপ। বললে,—কয়লাকে গাদা দু'ঠো তুরন্ত্ হামি খালাস করিয়ে দিয়ে আসি হুজুর। গাড়োয়ান লোক সব খাড়া আছে কিনা। আরে এ ছেদিলাল, হুজুরের গোড়হাতগুলো থোড়া দাবাই-আবাই করিয়ে দেনা উজবুক, হাঁ করিয়ে দেখছিস কি!

সঙ্গে সঙ্গে বসে পড়লো ছেদিলাল ব্যোমকেশের চৌকির একপাশে। রামরূপ বলে উঠলো,—আপনি কুচভি ঘাবড়াবেন না হুজুর, হামি যাবে আর আসবে।

আর একটা সেলাম ঠুকে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল রামরূপ। হুজুর যে তার এতখানি অসুস্থ একথা সে আজ পর্যন্ত জানতেই পারে নি। কি আফসোসকা বাত।

রামরূপ সিং লোকটা নেহাৎ মন্দ না। কোম্পানীর ঘরে নকরি ক'রে নির্দিষ্ট তন্‌খায় কোনদিন তার মন ভরে না। উপরি দু'পয়সা রোজগারের ধান্দায় বকের মত নিষ্ঠা নিয়ে সব সময় সে অতিমাত্রায় সজাগ। ঘুষ-ঘাষ বেশ ভালই খায় রামরূপ। কিন্তু অন্তরটা তার পরিষ্কার, একেবারে খোলামেলা মানুষ। পরের দায় বিপদে রামরূপ সিং জান দিয়ে এগিয়ে আসে আর সকলের আগে। সে দিক থেকে লোকটা খুব খাঁটি।

ছেদিলাল তার কর্তব্যটুকু যথারীতি শেষ ক'রে বেরিয়ে গেল কিছুক্ষণ পর। শীতকালের সকাল। লেপখানা আবার মুড়ি সুড়ি দিয়ে চোখ বুজে পড়ে রইলো ব্যোমকেশ বিছানার উপর। অবাক হয়ে ভাবছে। তার জীবনের মূল্য যে এতখানি, একথা সে নিজে স্বীকার না করলেও এরা কিন্তু সেটা প্রমাণ করবার জন্য উঠে পড়ে লেগে গেছে। এদিকে নিশি, আর

একদিক থেকে জুটলো এসে স-ভাতিজা রামরূপ। এদের আতিশয্যের মাঝখানে পড়ে ব্যোমকেশ কিন্তু রেহাই পেয়ে গেল বহু দুঃখের হাত থেকে। হঠাৎ এরা জুটেও ত যায় এসে, আশ্চর্য! এই নিশি আর রামরূপের দল আছে বলেই প্রবাস জীবনের দুঃসহতা আজও মানুষকে কাবু ক'রে ফেলতে পারে নি। ব্যোমকেশের মত দুর্ভাগ্য যারা, পথে-প্রবাসে নানান কিছু বিপর্যয়ের ধাক্কা খেতে খেতে শুধু এদের জোরেই কোন রকমে তারা টাল সামলে টিকে আছে আজও! এরা না থাকলে দুনিয়াটা চলতো কেমন ক'রে।

বেলা পড়ে আসছে। পাতলা একখানা র‍্যাগ গায়ে দিয়ে তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় চোখ বুজে পড়ে ছিলো ব্যোমকেশ। বাইরে একখানা গাড়ীর আওয়াজ পেয়ে সজাগ হয়ে উঠলো। ত্রস্ত পদে ঘরে ঢুকলো এসে নিশি। বললে,—এখন কেমন আছ দাদাবাবু!

ধীরে ধীরে চোখ বুজে তাকালো ব্যোমকেশ, বললে,—ভালই আছি। সারাদিন আজ ছিলি কোথায় নিশি!

নিশির এবার জবাবদিহির পালা। একটুখানি থমকে গিয়ে বললে,—আমি, আমি আজ বৌদিদিকে আনতে গিয়েছিলুম, দাদাবাবু! বাণেশ্বরকে সঙ্গে নিয়ে তিনি এসে পড়েছেন। আমি ওদের নিয়ে আসি।

ব্যোমকেশ কিছু বলবার আগেই হাওয়ার বেগে ঘর থেকে আবার বেরিয়ে গেল নিশি। ফিরে এলো সরযূ আর বাণেশ্বরকে সঙ্গে নিয়ে। বাণেশ্বর একটা তোরঙ্গ মাথায় ক'রে নামিয়ে দিলে এসে বারান্দার একপাশে।

সরযূ এসে ঘরে ঢুকলো ধীরে ধীরে চৌকির উপর বসলো গিয়ে ব্যোমকেশের পাশে। ব্যোমকেশ বিস্ময়ে হতবাক।

নিশি আব বাণেশ্বর বেরিয়ে গেল আবার সঙ্গে সঙ্গে। বাদবাকি জিনিস-পত্রগুলো গাড়ী থেকে নামাতে হবে।

বিস্ময় বিমূঢ় দৃষ্টি মেলে তাকালো একবার ব্যোমকেশ সরযূর দিকে। বললে,—তুমি হঠাৎ এখানে?

অভিমানক্ষুব্ধ সরযূর চোখ দু'টো ছেপে উঠলো জলে। বললে,—কেন, আমাকে কি আসতে নাই। আজ তিনমাস ধরে কাগের মুখে একটা

খবর পর্যন্ত দাও নি। কি এমন অপরাধ আমি করেছি তোমার কাছে, বলতে পার।

সরযূর অপরাধ সে বিত্তশালী ভবেশবাবুর কন্যা। ব্যোমকেশকে যিনি মানুষ বলেই মনে করেন না। কিন্তু সরযূর চোখে এত জল কেন? ব্যোমকেশকে কোথায় যেন ভাসিয়ে নিয়ে যেতে চায়। ব্যোমকেশের এতবড় শত্রুতা করবার জন্য কেন তাকে এমন ক'রে নিয়ে এলো নিশি। এতখানি সাহস সে পেলে কেমন করে।

ব্যোমকেশের মুখ দিয়ে কিন্তু আর একটি কথাও সরলো না। সরযূ তার কপালে হাত রেখে দেহের উত্তাপটা অনুভব করবার চেষ্টা করলে। জ্বর নাই, কিন্তু দেহ খানা যেন ভেঙ্গে পড়েছে। সরযূর নিরুদ্ধ কণ্ঠ চাপা একটা আবেগে যেন ভেঙ্গে পড়লো। বললে,—কেন তুমি এর আগে আমাকে খবর দাও নি। এই ক'দিনে শরীরের অবস্থাটা কি ক'রে ফেলেছ বলত।

—সংবাদ দিলে তুমি আসতে কেমন ক'রে।

—যেমন ক'রে আজ এলাম। তুমি কি মনে কর তোমার মত দুনিয়ায় আর সকলেই নিষ্ঠুর। কিন্তু সে কথা এখন যাক, আগে আমাকে একটু গুছিয়ে নিতে দাও। তোমার জন্য কোন খাবার করতে হবে?

কিছু না, এইমাত্র একটু ফলের রস খেয়েছি।

—ওষুধ-পত্র কিছু?

—সন্ধ্যার পর।

নিশি কামিন উনুনে আঁচ দিয়ে দিয়েছে। দাদাবাবুর সাবু তৈরি করতে হবে। এদের জন্যে একটু চা জল-খাবারের ব্যবস্থা করা দরকার। বাইরে থেকে সাড়া দিয়ে ঘরে ঢুকলো নিশি। বললে, বৌদিদি, এবার মুখে হাতে একটু জল লিবে নাই গো!

সরযূ বললে,—আমি গা ধোব, জল তোলা আছে?

নিশি বললে,—সব আছে, এসো আমার সঙ্গে।

ব্যোমকেশ ক্রুদ্ধ একটা দৃষ্টি মেলে তাকালো একবার নিশির দিকে। তীব্রকণ্ঠে একটা ডাক দিলে,—নিশি!

নিশি কিন্তু ভয় পেলে না। দাদাবাবুর রাগের ঘটা দেখে নির্লজ্জের মত খিল খিল ক'রে হেসে উঠলো। কোন রকমে হাসি চেপে বললে,—দোষ যদি কিছু ক'রে থাকি, সে আমি। বৌদিদিকে তুমি যেন কিছু বলো না, দাদাবাবু।

ব্যোমকেশ পুনরায় চোখ তেড়ে বলে উঠলো,—কাজটা কিন্তু ভাল হয় নি নিশি। আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি, এতবড় স্পর্ধা তোর হলো কেমন ক'রে। এখান থেকে তোকে আমি দূর ক'রে দেব।

সরযূ ব্যোমকেশকে থামিয়ে দিয়ে বললে,—থাক, এই দুর্বল অবস্থায় আর কথা বলো না। তাড়াতাড়ি গা-টা আমি ধুয়ে আসি। চল নিশি আমার সঙ্গে। তার পর কে তোকে দূর ক'রে দেয়, সে আমি দেখবো এখন।

নিশিকে নিয়ে বেরিয়ে গেল সরযূ। উঠানের এক কোণে ছোট্ট মত পাঁচিলের একটা আড়াল। বালতি দুই জল নিয়ে গিয়ে সেইখানে নামিয়ে দিলে নিশি। সামনের দিকটায় পর্দার মত ক'রে একখানা কাপড় ঝুলিয়ে একটুখানি আড়াল ক'রে দিলে। সরযূ তোয়ালে আর সোপকেশটা হাতে নিয়ে বাথরুমে ঢুকলো। বললে,—যা তুই এখন, ঘর-দোরগুলোয় একটু ঝাঁট দিয়ে দে।

ব্যোমকেশ নিশিকে দেখে আর একটিবার পাশ ফিরে বললে,—বাণেশ্বর কোথায় নিশি?

—ওই যে দাদাবাবু, বারান্দায় বসে আছে।

—ডাক একবার বাণেশ্বরকে।

বাণেশ্বর গিয়ে চৌকির পাশে টুলটার উপর ধীরে ধীরে বসলো। প্রশান্ত একটা দৃষ্টি মেলে বাণেশ্বরের দিকে তাকালে একবার ব্যোমকেশ, বললে,—খবর সব ভাল বাণেশ্বর!

বাণেশ্বর একটু ভাঙ্গা গলায় জবাব দিলে,—খবর আর ভাল হবেন কেমন ক'রে জামাইবাবু। আপনি চলে আসার পর থেকে কি ভাবে যে সেখানে দিন রাত কাটছে, ঈশ্বর জানেন। গিন্নি মা ঠাকরোণ ত কেঁদে কেটে সেদিন শয্যে নিলেন, তিন দিন ধরে হাঁড়ি চাপলো না বাড়ীতে। কর্ত্তাবাবুকে খোঁজ খবর করতে বলেন, আর লুকিয়ে লুকিয়ে ছাপুস নয়নে কাঁদতে থাকেন মা-ঠাকরোণ।

ব্যোমকেশ আর একটিবার চোখ বুজল। বলে চললো বাণেশ্বর,—কত্তাবাবু একটু রাশভারি মানুষ কি না, জানেন ত আপনি সবই। সে দিন থেকে ওই যে, তিনি নিঝুম মেরে গেলেন ত আজো গেলেন, কালও গেলেন। তার পর থেকে না রাম না বিষ্টু। আর কোন উচ্চি-বাচ্চিই করলেন না কত্তাবাবু।

পাশে ফিরে আবার তাকালো ব্যোমকেশ। ঈষৎ ব্যঙ্গের স্বরে বলে উঠলো,—তোমাদের কত্তাবাবুকে আমি চিনি বাণেশ্বর, উনি দরকার হলে ভাঙ্গবেন, তবু কিন্তু মচকাবেন না।

বাণেশ্বর বলে উঠলো,—ওকথা আর বলবেন না জামাইবাবু, বলি তাহলে বিত্তান্ত শুনুন। কত্তাবাবু যে এবার মচকাবেন সে কথা আমি সবচেয়ে আগে টের পেয়েছিলুম। যে কত্তাবাবুকে গুণে গুণে আমি দিনের মাথায় সতের বার তামাক সেজে দিই, তেনার কিনা শেষ পর্যন্ত গড়গড়াতে অরুচি ধরে গেল। তখনই আমি ঠাউরেছিলাম জামাইবাবু, কত্তাবাবুর একটা কিছু ঘটেছে। শেষ পর্যন্ত হলোও তাই।

—কি হলো, তাঁর আবার কি হলো বাণেশ্বর!

—এমন কিছু অবিশ্যি হয় নি, ইস্তক তিনি দম ধরেই ছিলেন কিনা। কিন্তু গোল বেধে গেল আপনার অসুখের খবর পাওয়ার পর। নিশি গিয়ে খবরটা যেই দিলে, শোরগোল পড়ে গেল বাড়ীর মধ্যে। কত্তাবাবু গিন্নিমাকে একটু ধমক দিয়ে বললেন,—থামো খবরটা আগে জানি ভাল ক'রে। টেলিফুন করলেন এইখানকার কুঠিতে। খোঁজ খবর নিয়ে এরা জানলেন অসুখ তেমন বাড়াবাড়ি নয় কিছু, ভালই আছেন আপনি।

ব্যোমকেশ একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললে,—যাক, তাহলে ত ঝামেলা একরকম মিটেই গেল।

বাণেশ্বর ঘাড় নেড়ে বললে,—ঝামেলা আর মিটলেন কই জামাইবাবু। গিন্নিমা আমাকে হুকুম করলেন—এক্ষুনি গিয়ে খবর নিয়ে আয়, টেলিফুনের কথা বিশ্বাস করি না। মা-ঠাকরোণের বিকুলি দেখে ফতুয়াটা ত আমি সঙ্গে সঙ্গে গায়ে দিলুম। ঠিক বেরুতে যাব, এমন সময় আর এক কাণ্ড।

উৎকর্ণ হয়ে উঠলো ব্যোমকেশ-বাণেশ্বরের 'আর এক কাণ্ড' শুনে। বাণেশ্বর বলে চললো,—খুকীদিদিমণি এগিয়ে এসে বললেন, আমিও যাব বাণেশ্বরদার সঙ্গে। কত্তাবাবুর সামনে গিয়ে কান্নাকাটি করতে লাগলেন; গম্ভীর হয়ে বলে উঠলেন কত্তাবাবু, তুই-ও যাবি, বেশ খুশী হয় চলে যা, কাউকে আমি ধরে রাখতে চাই না। কত্তাবাবুর গাড়ীটা ছিলো বিগড়ে, চৌধুরী সায়েবের গাড়ীখানা এসে গেল সঙ্গে সঙ্গে। তার পর যা ঘটলে জামাইবাবু, সে আর আমি বলতে পারছি না।

ব্যোমকেশ তন্ময় হয়ে শুনে যাচ্ছে বাণেশ্বরের কাহিনী। মুখ তুলে বলে উঠলো,—তার পর—তার পর কি হলো বাণেশ্বর!

কত্তাবাবু ত গম্ভীর হয়ে আবার বসলেন গর্জে একবার তাকালেন আমার দিকে, দূর থেকেই একটা হুঙ্কার দিয়ে বলে উঠলেন,—বাণেশ্বর, তামাক দিয়ে যা হারামজাদা। গড়গড়া নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে আমি ছুটলাম জামাইবাবু। গিন্নীমা তখন দিদিমণির বাক্‌সো গোছাচ্ছেন। খুকুদিদিমণি কাপড় ছেড়ে কত্তাবাবুকে প্রণাম করতে এলো। কত্তাবাবুর গড়গড়ার ঢিমেতেতালা আওয়াজ আর ফিকে ধোঁয়া দেখেই তক্ষুনি আমি টের পেয়ে গেলুম জামাই-বাবু, যে কত্তাবাবু এবার কাবু হয়ে পড়েছেন।

ব্যোমকেশ যেন রুদ্ধশ্বাসে চেয়ে আছে বাণেশ্বরের দিকে, অপলক দৃষ্টি মেলে। এগিয়ে চললো বাণেশ্বরের কাহিনী, দিদিমণি গিয়ে প্রণাম করলে কত্তাবাবুকে, কত্তাবাবুর ভ্রূক্ষেপ নাই; যেন কিছুই হয় নি। খুকীদিদিমণি চোখে আঁচল দিয়ে বললে, আমি যাচ্ছি বলে দুঃখ করো না বাবা, যাবার সময় আমাকে তুমি একটু আশীর্বাদ কর। কত্তাবাবু এবার উঠে দাঁড়ালেন, দিদিমণিকে বুকের মধ্যে হঠাৎ জড়িয়ে ধরে বলে উঠলেন, মারে—তোকে ছেড়ে আমরা কেমন ক'রে থাকবো, মা! কচি খুকীর মত দিদিমণির মাথায় হাত বুলিয়ে খানিক আদর ক'রে বললেন,—শিগ্‌গীর যেন ফিরে আসিস মা, আমরা যে তোর পথ চেয়ে থাকবো। দিদিমণি জবাব দিলে, আসবো, খুব শিগ্‌গীর আমি ফিরে আসবো বাবা, তোমাদের ছেড়ে বেশীদিন কি দূরে গিয়ে আমি থাকতে পারি। বেরোবার আগে গিন্নীমা-ঠাকরোণ মা মঙ্গল চণ্ডীর প্রসাদী ফুল ঠেকিয়ে দিলেন দিদিমণির

মাথায়। ঘর ছেড়ে যখন গাড়ীতে গিয়ে উঠলুম—পিছন ফিরে দেখি গিন্নীমা চোখে আঁচল দিয়েছেন। রুমাল দিয়ে বারে চোখ মুছছেন কর্ত্তাবাবু।

বাণেশ্বর কাপড়ের খুঁট দিয়ে চোখ দুটো একবার মুছে নিলে। ব্যোমকেশ তাড়াতাড়ি বলে উঠলো,—থাক্ বাণেশ্বর, এসব কাহিনী শুনে আর কোন লাভ নাই।

—কাহিনী শোন্‌বার কি আর সময় আছে জামাইবাবু। গিন্নীমা আমার পথ চেয়ে বসে আছেন। যতক্ষণ না ফিরে গিয়ে তাঁর কাছে আপনার সংবাদ-টুকু পৌছে দিচ্ছি, ততক্ষণ তিনি জলগ্রহণ করবেন না। এক্ষুনি আমাকে ফিরে যেতে হবে।

সরযূ একবাটি দুধ সাবু তৈরি ক'রে ব্যোমকেশের পাশে টেবিলের উপর নামিয়ে দিয়ে বললে,—খেয়ে নাও, আমি ততক্ষণ বাণেশ্বরদাকে একটু চা জলখাবার খাইয়ে দিই।

টাটকা তৈরি এক ডিশ মোহনভোগ আর এক কাপ চা নিয়ে বাইরে গিয়ে ড্রাইভারকে দিয়ে এলো বাণেশ্বর। খুকীদিদিমণির একান্ত অনুরোধ বাণেশ্বরকেও একটুখানি মুখে দিতে হলো। বেরোবার জন্য তৈরি হলো বাণেশ্বর। সরযূকে কাছে ডেকে বললে,—আমি তাহলে এবার যাই দিদিমণি। কিন্তু তোমাদিকে এখানে এইভাবে ফেলে রেখে সেই খালি বাড়ীটায় গিয়ে আমি আবার ঢুকবো কেমন ক'রে।

—যাবার সময় চোখের জল আর ফেলো না বাণেশ্বরদা। মাকে গিয়ে বলো - বাবাকে বলো আমরা ভালই আছি।

—বলবো বৈকি দিদিমণি, সবই বলবো। আমি কিন্তু ভাবছি এখানে তুমি থাকবে কেমন ক'রে। জামাইবাবুকে বুঝিয়ে পড়িয়ে আবার তাঁকে সেই বাড়ীতে ধরে নিয়ে যাওয়া যায় না?

—সে চেষ্টা আমি করবো বাণেশ্বরদা। কিছুদিন ত যাক, তার পর সে চেষ্টা আমি নিশ্চয় করবো।

ব্যোমকেশ দুধ সাবু খেয়ে আবার শুয়ে পড়েছে। বাণেশ্বর গিয়ে নমস্কার ক'রে বিদেয় নিয়ে এলো। সরযূ গিয়ে সদর দোর পর্যন্ত এগিয়ে দিলে

বাণেশ্বরকে। বাণেশ্বর গিয়ে গাড়ীতে উঠলো। পিট-সাহেবের নতুন কেনা গাড়ীখানা সরযূকে যথাস্থানে পৌঁছে দিয়ে মোহনপুর কুঠি ছেড়ে গেল ঠিক কাল-সন্ধ্যার মুখোমুখি। বাণেশ্বরের বাঁ চোখটা হঠাৎ নাচছে কেন! এইভাবে কি বাংলা মাসের পয়লা তারিখে কেউ কখনও মেয়ে বিদেয় করে!

কয়েকদিনের মধ্যেই সেরে উঠলো ব্যোমকেশ সরযূর অক্লান্ত সেবা-যত্নে। কলিয়ারির কাজকর্ম আবার শুরু ক'রে দিলে। কিন্তু মোহনপুরের কুঠিতে ব্যোমকেশের আর থাকা চলে না। অসুবিধা এর নানান দিক থেকে। যে ক'টা দিন অজ্ঞাতবাসে কেটেছে, সে-পর্যন্ত না হয় চললো কোন রকমে। কিন্তু আর না. এখান থেকে এবার সরতে হয়েছে। মাইনেপত্র এমন কিছু বেশী নয়, চাকরিটাও তেমন লোভনীয় বলে মনে করবার কোন কারণ নাই। যে দৈবাৎ কোন রকমে হাতছাড়া হয়ে গেলে তার জন্য ভবিষ্যতে আফসোসের কোন কারণ ঘটতে পারে। প্রেমশংকর লোকটাকে এতদিন চিনতে পারে নি ব্যোমকেশ। এক নম্বর ব্লাফার, ধাপ্পা দিয়ে সরে পড়লো। কবে যে তিনি দয়া ক'রে সফর থেকে ফিরে এসে ব্যোমকেশকে দিয়ে লাট সাহেবের ভ্যাকান্সিটা ফিল-আপ ক'রে নেবেন, তার জন্য আর একটি দিনও বসে থাকা চলে না। অন্য কোথাও চাকরি একটা যোগাড় ক'রে নিতেই হবে ব্যোমকেশকে। তেমন কোন ভদ্রস্থ একটা কিছু জুটে গেলেই এখান থেকে সরে পড়বে। মোহনপুর কুঠি তাকে ছাড়তেই হবে। সমস্যা এখন সরযূকে নিয়ে। অবার কোন্ এক নতুন জায়গায় হঠাৎ গিয়ে কি অবস্থার মধ্যে যে পড়তে হবে ব্যোমকেশকে, কিছুমাত্র জানা নাই। এ অবস্থায় সরযূকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়া মানেই একটা বিড়ম্বনার ব্যাপার। ওকে বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দেওয়া ছাড়া উপায় নাই।

সেদিন অফিসে গিয়ে হঠাৎ একখানা চিঠি পেলে ব্যোমকেশ। তার এক বিশেষ বন্ধু কাতরাস থেকে লিখেছেন। চাকরি একটা জুটে যেতে পারে সেখানে। অবিলম্বে একখানা দরখাস্ত লিখে পাঠিয়ে দেবার জন্য

ব্যোমকেশকে তিনি অনুরোধ করেছেন। চেষ্টা তদ্বির সেখানে থেকেই যথারীতি করা হবে।

সন্ধ্যার সময় এই প্রসঙ্গে সরযূর সঙ্গে কিছুটা আলোচনা পর্যন্ত হয়ে গেল ব্যোমকেশের। খোলাখুলি অবশ্য তেমন কিছু বললে না ব্যোমকেশ। শুধু এইটুকুই জানিয়ে দিলে যে মোহনপুরে তার বেশিদিন আর থাকা চলবে না।

হাতের কাজগুলো শেষ করে সরযূ এসে চৌকির উপর চেপে বসলো। ব্যোমকেশের হাতে চায়ের পেয়ালাটা ধরিয়ে দিয়ে বললে,—আবার কোথায় যেতে হবে শুনি।

ব্যোমকেশ চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে বললে,—তা অবশ্য এখনো ঠিক হয় নি। কিন্তু যেতেই হবে আমাকে এ মুল্লুক ছেড়ে, বেশ একটু দূরে কোথাও।

সরযূ একটু উৎসুক হয়ে বললে,—বেশ ত—তাই চল না, নতুন একটা দেশ দেখে আসা যাবে। আমাকেও সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছো ত।

ব্যোমকেশ একটু বেকায়দায় পড়লো। আমতা আমতা ক'রে বললে,—তুমি আমার সঙ্গে যেতে চাও নাকি। কিন্তু আমার নিজের যে কোন চাল-চুলোর ঠিক নাই। তুমি সুদ্ধ গিয়ে অনর্থক সেখানে কষ্ট পাও সেটা কি ভাল।

সরযূ হাল্কা সুরেই বলে উঠলো,—কে বললে চাল-চুলো নাই। চাল দু'টো তুমি কোন রকমে যোগাড় ক'রে নিয়ে এসো, আর চুলোটা ত আমার হাতেই, ওটা তৈরি করে নেব। তার জন্যে কষ্ট পেতে হবে কেন শুনি।

ব্যোমকেশ একটু ম্লান হেসে বললে,—কথাটা যত সহজ মনে করছো, সত্যিই কি তাই, তার চেয়ে আমি প্রস্তাব করেছিলাম—তুমি এবার বাপের বাড়ী ফিরে গেলে কেমন হয়।

সরযূ কি যেন একটু ভেবে বললে,—খুব ভাল হয়, এ অতি উত্তম প্রস্তাব। অবশ্য তোমাকেও আমার সঙ্গে যেতে হবে। তাই চল না গো, কালই আমরা এখান থেকে চলে যাই।

ব্যোমকেশের মনের কোণে কোথায় যেন খ্যাঁচ ক'রে একটা টান পড়লো। সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলো ব্যোমকেশ,—সে আর হয় না সরযূ, না-না—সেখানে আর আমার যাওয়া চলে না। তুমি যেতে পার, আমার কিন্তু যাওয়া হবে না।

সরযূ সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলো,—তাহলে আমারও যাওয়া হবে না। এখন হিল্লি-দিল্লী কোন্ মুলুকে পাড়ি দিতে চাও বলো। আমি কিন্তু যাব তোমার সঙ্গে।

রামরূপ সিং দরজায় কড়া নাড়ছে। সরযূ গিয়ে খুলে দিয়ে এলো। একটা আড়াই-সেরা রুইমাছ হাতে ঝুলিয়ে ঢুকলো এসে রামরূপ। ব্যোমকেশকে একটা সেলাম ঠুকে বললে,—খাদতালাও আজ বাঁইচ হইয়ে গেল হুজুর, ম্যানেজার সাব বহুৎসে আজ মছলি পাকড়ে নিলে। হুজুরের জন্যে লিয়ে এলাম একটা বাগিয়ে, জালিয়া বেটাদের কাছ থেকে।

রামরূপ খুব কাজের লোক। ব্যোমকেশ হেসে বললে,—এ যে একেবারে ভোজের আয়োজন ক'রে দিলে রামরূপ। বসো-বসো একটু চা খাও।

রামরূপ সিং ব্যস্তবাগীশ মানুষ, বসবার কি তার উপায় আছে! সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলো ছেদিলালকে আজ একটা ভঁইস কিনতে পাঠিয়েছি হুজুর, দ্বারভাঙ্গিয়া লোককে খাটালসে। আভি তক কাহে লুটলো না, থোড়া খবর লিয়ে আসি। সেলাম হুজুর, সবের ফিন ভেট হবে। নমস্তে মাইজী।

রামরূপ ব্যস্তসমস্ত হয়ে তক্ষুনি আবার বেরিয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে রুই-মাছটা কুটতে বসে গেল সরযূ। কিন্তু বঁটিটা যে বড্ড ছোট, এই দিয়ে কি এতবড় একটা রুইমাছ কাটা যায়!

ব্যোমকেশ বললে,—ডাব কাটা দা টা দিয়ে চলবে!

সরযূ একটু হেসে বললে,—বঁটির কাজ কখনো দা দিয়ে চলে নাকি। এই বুদ্ধি নিয়ে তেপান্তরের মাঠে তিনটে মাস তুমি কাটালে কেমন ক'রে।

কথাটা খুব সত্য। গোড়াতেই যে একটু ভুল করছে ব্যোমকেশ। বঁটির মর্ম সে কি বুঝবে, দা দিয়ে শুধু ডাব কাটাই চলে।

কয়েকদিন পর কাতরাস থেকে ব্যোমকেশের নামে হঠাৎ একখানা টেলিগ্রাম এসে পৌছল,—চাকরির ব্যবস্থা হয়ে গেছে, অবিলম্বে রওনা হয়ে এসো।

ব্যোমকেশ এই সুযোগটুকুর প্রতীক্ষায় ছিলো। এর পর আর দেরি করা চলে না। বিকেল বেলা অফিস থেকে ফিরে এসে সঙ্গে সঙ্গে জিনিসপত্র গোছ-গাছ করতে লেগে গেল ব্যোমকেশ। সরযূ খুঁটিনাটি এটা ওটা দিয়ে বাক্সো তোরঙ্গ বোঝাই ক'রে ফেললে। কাপ-ডিশ আয়না-চিরুনী সিন্দুর-কৌটো থেকে আরম্ভ ক'রে ছুঁচ সুতোটি পর্যন্ত নিজের বাক্সোবন্দী ক'রে ফেললে সরযূ। একটা কিছু ছেড়ে গেলে বিদেশ বিভুঁয়ে হাতে কাছে হঠাৎ পাওয়া যাবে কোথায়। ব্যোমকেশ বিছানা পত্রগুলো হোল্ড-অলের মধ্যে কায়দা ক'রে বেঁধে ফেলেছে। এবার রওনা হলেই হয়।

রাত প্রায় আটটা নাগাদ রামরূপ সিং ট্যাক্সি নিয়ে এসে হাজির হলো। আধঘণ্টার মধ্যেই ওরা পৌছে গেল স্টেশনে। রাত্রের ট্রেন ধরে কাতরাস গড় রওনা হয়ে গেল ব্যোমকেশ। এবার কিন্তু আর একলা নয়, সস্ত্রীক।

ভোর বেলা নিশি এলো বাসন মাজতে। সূর্য তখনো ওঠে নি। পূব দিগন্তে ঈষৎ একটু লালের আভা লেগে আছে। ঠিক এই সময়েই নিশি এসে হাজির হয় রোজ। বাইরে এসে কড়া নাড়ে। রাত্রে সবদিন ভাল ক'রে ঘুম হয় না নিশির। বিছানায় পড়ে পড়ে ভাবতে থাকে কত কি। দাদাবাবু কি গুণ করলে নিশিকে। দিনান্তে অন্তত একটিবার তাকে না দেখলে যে হাঁপিয়ে ওঠে নিশি। স্বপ্ন দেখে ঘুমের ঘোরে। কাক কোকিল ডাকতে না ডাকতে ধড়মড়িয়ে উঠে বসে নিশি। পাট করতে যেতে হবে দাদাবাবুর বাসায়। এ যেন এক নিশির ডাক, ভূতের মত পেয়ে বসেছে নিশিকে। দাদাবাবুর বাড়ী বাসন মাজাটা আজ আর তার পেশার মধ্যে নয়, নেশায় দাঁড়িয়ে গেছে।

ব্যোমকেশের বাড়ীর সামনে এসে থমকে হঠাৎ দাঁড়ালো নিশি। বাইরের দরজাটা একেবারে খোলা। ভিতরে ঢুকে নিশি যেন অবাক হয়ে

গেল। কারো কোন সাড়া শব্দ নাই। বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালো। ভিতর দুয়ার হাঁ হাঁ করছে। উঁকি মেরে দেখে ঘর একদম ফাঁকা। বাক্সো বিছানা স্যুটকেশ থেকে আরম্ভ ক'রে খাবার জলের কুঁজোটা পর্যন্ত চোখে পড়লো না নিশির। শুধু ব্যোমকেশের খালি চৌকিখানা মেঝর উপর পড়ে আছে এক পাশে। নিশি স্তম্ভিত হয়ে গেল। হঠাৎ এরা গেল কোথায় !

ঘর থেকে সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে গেল নিশি। পিছনের কুলিধাওড়ায় গিয়ে খোঁজ-খবর নেবার চেষ্টা করলে। সঠিক খবর কেউ দিতে পারলে না, শুধু এইটুকুই জানা গেল যে রাত্রের গাড়ী ধরে ওরা ধানবাদ না কোথায় যেন রওনা হয়ে গেছে। এখান থেকে চলে গেছে ওরা।

নিশির বুকের ভিতরটা ছাঁৎ ক'রে উঠলো। হতাশ হয়ে পড়লো নিশি। দাদাবাবু একটা খবর পর্যন্ত দিয়ে গেল না !

কুলিধাওড়া থেকে তখনিই আবার ফিরে এলো নিশি। পাগলের মত টলতে টলতে ঢুকলো গিয়ে আবার ব্যোমকেশের ফাঁকা বাসাটায়। বাইরের দোরটা ভিতর দিক থেকে বন্ধ ক'রে দিলে। ঘরটাই শুধু ফাঁকা পড়ে আছে, দাদাবাবু নাই। নিশির বুকের শিরাগুলোয় কে যেন মোচড় দিয়ে টানছে। ঘরের মধ্যে গিয়ে আর একটিবার চারিদিক বেশ ভাল ক'রে চোখ বুলিয়ে দেখে নিল নিশি। দেখবার আর কিছু নাই। নিশির মুখখানা বৃন্ত-ছেঁড়া শুকনো একটা শালুকের কুঁড়ির মত বিবর্ণ হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে। শূন্য ঘরের অতলান্ত উদ্বেল মৌনতাকে নাড়া দিয়ে নিজের মনেই ভাঙ্গা গলায় একবার ডেকে উঠলো নিশি,—দাদাবাবু—দাদাবাবু !

কে যেন হঠাৎ সাড়া দিয়ে উঠলো নিশির বুকের ভিতর থেকে,—নাই, দাদাবাবু নাই, সে চলে গেছে।

চলে গেছে ! দাদাবাবু চলে গেছে !

নিশির সর্বাঙ্গ যেন শিথিল হয়ে আসছে। পিছন দিকের দেওয়ালটায় ঠেস দিয়ে সেইখানেই ধপ্ ক'রে বসে পড়লো নিশি, মেঝের উপর হাত পা ছড়িয়ে। চোখবুজে কি যেন ভাবতে লাগলো। হঠাৎ যেন তার চোখের সামনে ভেসে উঠলো দাদাবাবুর হাসি হাসি মুখখানি। চোখ বুজেই যে

দেখতে পাচ্ছে নিশি। মুখ নয়, যেন কোজাগরী পুন্নিমের একখানি চাঁদ। এমন দিব্যাঙ্গি রূপ, এতখানি বুকভরা মায়া নিয়ে কেন তুমি নিশির সামনে এসে দাঁড়িয়েছিলে দাদাবাবু! কেন তুমি নিশিকে এতখানা আস্কারা দিলে।

ধীরে ধীরে আবার চোখ মেলে তাকালো নিশি। দু'চোখ বেয়ে তার ছলকে উঠলো দু'কূল-ভাঙ্গা দামোদরের ঢেউ।

কার জন্যে এমন ক'রে কাঁদছে নিশি? কেনই বা কাঁদছে! সে প্রশ্নের উত্তর হয়ত দিতে পারবে না নিশি। সেকথা তার নিজেরই যে জানা নাই।

নিশির সারা অন্তর মথিত ক'রে ভেসে উঠলো শুধু এক কলি পুরানো গানের সুর। নিজের মনেই হঠাৎ গুন্ গুন্ ক'রে গেয়ে উঠলো নিশি :—

'ও তার রূপ দেখে সই কুল হারালাম
একি মনের ভুল লো—পিরীতি হলো শূল'—

থামলে, একটু। পরক্ষণেই আবার উদ্‌ভ্রান্তের মত গেয়ে উঠলো ওই গানেরই আর একটা কলি :—

'তার পিরীত হলো মাথার কাঁটা
পিরীত কানের দুল লো—পিরীতি হলো শূল'—

নিজের মনেই গাইছে আর খিল্ খিল্ ক'রে হাসছে।

নিশি পাগল হয়ে গেল নাকি!

দশ

দু'মাস গেল, ছ'মাস গেল, দেখতে দেখতে বছর ঘুরতে যায়। ব্যোমকেশ কিন্তু ফিরলো না। সরযুকে সঙ্গে নিয়ে কোথায় যে সে গেল, সে খবর কেউ জানে না। মনে কারো শান্তি নাই, এতটুকু স্বস্তি নাই। এ গৃহের সেই উচ্ছ্বসিত প্রাণস্পন্দন যেন আজ স্তব্ধ হয়ে গেছে। শশীমুখী দেবী কন্যা-জামাতার বিচ্ছেদবেদনায় অতিমাত্রায় কাতর হয়ে উঠেছেন। প্রতিদিনের প্রতিটি মুহূর্ত তাঁর উদ্বেল আগ্রহে ভরা। এই বুঝি কোন খবর এলো। খবর কিন্তু আসে না। মোহনপুর কুঠি ছেড়ে কোথায় যে তারা গেল, সে

বার্তাটুকু এ পর্যন্ত আর জানাই গেল না। মাঝে একখানা মাত্র চিঠি লিখেছিলো সরযূ, এখান থেকে যাওয়ার প্রায় মাস তিনেক পর। তাতে তার ঠিকানার কোন উল্লেখ নাই। খামের উপর রেলগাড়ীর 'আর. এম. এস.'-এর ছাপ। মনটা যেদিন অতিশয় চঞ্চল হয়ে উঠে শশীমুখী দেবীর, সেই পুরোনো চিঠিখানাই বাক্সো থেকে বের ক'রে আর একটিবার পড়তে বসেন। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কতবার যে পড়া হলো সেই একখানা চিঠি তার কোন হিসাব নাই। সরযূ লিখেছে :—

মা গো—

আমাদের জন্য তোমরা যে খুব চঞ্চল হয়ে উঠেছ তা বুঝতে পারছি। কিন্তু করবার কিছু নাই। আমি যে কোথায় আছি, সে খবরটুকু পর্যন্ত তোমাদের আমি জানাতে পারছি না। ওঁর সেটা ইচ্ছে নয়। এইটুকু শুধু জেনে রাখো যে শারীরিক আমরা ভালই আছি। আমাদের জন্য চিন্তার কোন কারণ নাই। আর একটা কথা জানাই, সামনের আরও কয়েকটা মাস তোমাদের সঙ্গে আমার দেখা-সাক্ষাতের কোন সম্ভাবনা নাই। অন্তত আমার বাড়ী থেকে আসা যতদিন না এক বৎসর পূর্ণ হচ্ছে। এর মধ্যে আমার কোন চিঠিপত্রও আর হয়ত পাবে না। তার জন্য কোন দুঃখ করো না মা, ঠিক সময় হলেই আবার আমি বাড়ী ফিরবো। এর বেশি আর কিছু শুনতে চেয়ো না, আমি নিরুপায়। আমাকে তোমরা এর জন্য ক্ষমা করো। বাবাকে বলো তিনি যেন কোন দুঃখ না করেন। তোমরা আমার প্রণাম নিয়ো। ইতি—

সরযূ

পুনশ্চ—একটা কথা তোমাকে লিখতে ভুলেছি। খুব সম্ভব আমি সন্তান-সম্ভবা।

এ চিঠিখানি শশীমুখীদেবীর বহুবার পড়া হয়ে গেছে। তবু কিন্তু বারে বারেই চিঠিখানা খুলে বসেন। আর একটিবার হয়ত পুনশ্চটি পড়বার আনন্দে। কিন্তু এ যে বড় গোলমেলে কথা। একবৎসরের জন্য এ বাড়ীর

সঙ্গে কোন সম্পর্কই রাখতে চায় না ওরা। এত কঠোর তারা হলো কেমন ক'রে।

ভবেশবাবু চিঠিখানা পেয়েই মন্তব্য করেন—জামাই বাবাজীবন আমাদের শাস্তি দিয়েছেন গিন্নী, এক বৎসরের জন্য মেয়ে পাঠানো বন্ধ, এই সোজা কথাটা বুঝতে পারছো না? এক বৎসর কাল তাকে অজ্ঞাতবাসে রেখে দিয়ে আমাদের মনের উপর পীড়ন চালিয়ে মর্মে মর্মে বুঝিয়ে দিতে চান যে শাস্তি দেবার ক্ষমতা তাঁর আছে।…বাবাজীবনের এই মৌলিক প্রতিভার কাছে আমাদের যে হার না মেনে উপায় নাই গিন্নী।

শশীমুখী দেবী তবু কিন্তু বলে ওঠেন,—তুমি একটু ভাল ক'রে খোঁজ-খবর নাও। দরকার হলে আমি নিজে গিয়ে ওদের ধরে নিয়ে আসবো।

—দেখা পেলে ত ধরে নিয়ে আসবে। দেখা এখন পাচ্ছো কোথায়। তার চেয়ে যেমন আছে আরো কিছুদিন থাকতে দাও। নিজেই ত ওরা আসবে লিখেছে।

শশীমুখী দেবীর মন কিন্তু আর এক মুহূর্ত অপেক্ষা করতে চায় না। বিশেষ ক'রে সরযুর এই অবস্থায়। কর্তামশায়ের কাছে তাই অনুযোগ ক'রে বলেন,—সরযুর সন্তান হবে, আর আমি কিনা সে সময় তার কাছে থাকতে পাব না। এ কেমন ক'রে হতে পারে।

সরযুর সন্তান হবে। ভবেশবাবু চোখ বুজে কি যেন ভাবতে থাকেন। তাঁর পক্ষে এ যে কতখানি আশার—কতখানি আনন্দের—সে কথা কি তাঁকে বুঝিয়ে বলবার প্রয়োজন আছে। নবজাতক ভূমিষ্ঠ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই শুভ মুহূর্তটিকে চিহ্নিত ক'রে বেজে উঠবে মঙ্গল শঙ্খ। পুরবধূ কুলকন্যাগণ এসে উলুধ্বনি ক'রে অভিনন্দন জানাবে সেই বহুবাঞ্ছিত নবজীবনের আবির্ভাবকে, আর ভবেশবাবু সস্ত্রীক গিয়ে সোনা দিয়ে তার মুখ দেখবেন। এ আকাঙ্ক্ষা এ সাধটুকু যে গৃহিনীর চেয়ে ভবেশবাবুর কিছুমাত্র কম নয়, একথা তিনি আর কাউকে বোঝাবেন কেমন ক'রে। সে আশা কিন্তু আশা হয়েই রয়ে গেল, ও নিয়ে আর হায় হায় ক'রে লাভ কি। শশীমুখী দেবীকে এ অবস্থায় মৌখিক দুটো সান্ত্বনা দেওয়া ছাড়া তার বেশী কি করতে পারেন

ভবেশবাবু। তারা যে একদিন আপনা থেকেই ফিরে আসবে সে বিষয়ে মনে মনে তাঁর ভরসা আছে যথেষ্ট। গৃহিনীকেও তিনি সেই কথা বিশ্বাস করতে বলেন।

মনে সুখ নাই, গৃহে শান্তি নাই, সবই যেন হঠাৎ কেমন ক'রে এলোমেলো হয়ে গেল। শুধু মনের বিশ্বাস নিয়ে নিশ্চিন্তে বসে থাকা কি সম্ভব শশীমুখী দেবীর পক্ষে। কর্তাকে না জানিয়ে গোপনে গোপনে তিনি নানাভাবে খোঁজ নিতে লাগলেন। কত জায়গায় লোক পাঠালেন পথ-খরচা দিয়ে। লোক কিন্তু বারে বারেই হতাশ হয়ে ফিরে এলো। মেয়ে জামাইয়ের সন্ধান কেউ দিতে পারলে না। দেবতার পায়ে মাথা খোঁড়েন শশীমুখী দেবী, মন্দিরে গিয়ে পূজো দিয়ে আসেন মেয়ে-জামাইয়ের কুশল কামনা ক'রে। মা মঙ্গল-চণ্ডীর কাছে মানত করেন, ভালোয় ভালোয় তাদের ফিরিয়ে নিয়ে এসো মা, আমি তোমার সোনার মুকুট গড়িয়ে দেব। দয়া কর মা, দয়া কর, তুমি একটু মুখ তুলে চাও।

কত সাধু সন্ন্যাসী গণৎকার এসে জুটে যায়। শশীমুখী দেবী তাঁদের পরম যত্নে অভ্যর্থনা ক'রে ভিতর-বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে বসান। হাত দেখা খড়ি পাতা থেকে আরম্ভ ক'রে তিন পুরুষের কোষ্ঠি বিচার পর্যন্ত কোন কিছুই বাদ যায় না। প্রত্যেকেই কিছু না কিছু আশার বাণী শুনিয়ে যান। সান্ত্বনা দেন শশীমুখী দেবীকে—মেয়ে জামাই তাঁর সুখেই আছে, বাড়ী ফিরতে আর তাদের বড় বেশী বিলম্ব নাই। স-দক্ষিণা দক্ষিণ হস্তের ব্যাপার সমাপ্ত করে পরিতৃপ্ত হয়ে ফিরে যান তাঁরা একে একে। আশীর্বাণী উচ্চারণ করে যান শাস্ত্রীয় শ্লোক আউড়ে। মনে মনে কিছুটা ভরসা পান শশীমুখী দেবী। এঁদের এতগুলোর মুখের কথা কি ভুল হতে পারে।

কলিয়ারি ম্যানেজার চৌধুরী সাহেবের গৃহিনী সুরমা দেবী নীলু আর মন্টুকে সঙ্গে নিয়ে মাঝে মাঝে এসে খোঁজ খবরটা নিয়ে যান। সুরমা দেবী নানাভাবে সান্ত্বনা দেন শশীমুখী দেবীকে। বুঝিয়ে বলেন, জামাই যদি কাজকর্ম কোথাও যোগাড় ক'রে থাকে—থাক না ওরা কিছুদিন মনের আনন্দে। রাগটা একটু পড়ে গেলেই আপনা থেকেই ফিরে আসবে।

শশীমুখী দেবী সেই আশাতেই যে বুক বেঁধে আছেন। কিন্তু আর দেরি যে তাঁর সহ্য হয় না। এক একটি দিন যাচ্ছে যেন এক একটি যুগ।

শ্রীমান মণ্টু এগিয়ে আসে জেঠাইমার সামনে। যত কিছু অনুযোগ তার জেঠাইমার উপর। মণ্টু হঠাৎ প্রশ্ন ক'রে,—সরযূদি কবে আসবে জেঠাইমা, কেন আপনি তাকে শ্বশুরবাড়ী পাঠিয়ে দিলেন। আমরা এবার গান শোনাব কাকে।

শশীমুখী দেবী করুণ একটু হেসে বললেন—মেয়েদের শ্বশুর বাড়ী যেতে হয় বাবা। নইলে যে তার শ্বশুরবাড়ীর লোক রাগ করবে।

মণ্টু একটু তিরিক্ষিভাবে বলে উঠলো, কে রাগ করবে, দিদির শ্বশুরবাড়ীর লোক! আসুক না একবার আমাদের সামনে, লেঙ্গি মেরে দিদির শ্বশুরকে এইখানে পটকে দেব না!

হেসে ওঠেন মণ্টুর মা আর শশীমুখী দেবী দু'জনেই। নীলু এবার বলে ওঠে,—সরযূদিকে আমরা চিঠি লিখে রেখেছি জেঠাইমা। "দিদি তুমি কেমন আছ, আমরা ভাল আছি। আমাদের এখানে খুব বৃষ্টি নেমেছে। রোজ দেখি ঝুপ ঝুপ ক'রে বৃষ্টি পড়ে, আর শালিক পাখীর ছানাগুলো পলাশ গাছের ডালে বসে মনের আনন্দে চিঁ চিঁ ক'রে গান গায়।"—আরও কত কথা লিখে রেখেছি জেঠাইমা, কিন্তু চিঠিখানা যে কেউ ডাকবাক্সে ফেলে দেয় না।

শশীমুখী দেবী আশ্বাস দিয়ে বলেন,—বেশ ত, চিঠিখানা একসময় আমার কাছে দিয়ে যেয়ো, আমি তার কাছে পাঠিয়ে দেব।

মণ্টু বলে ওঠে,—চিঠিতে আমরা দিদির ঠিকানা পর্যন্ত লিখে রেখেছি জেঠাইমা—শ্রীমতী সরযূবালা দেবী, পোষ্ট ভাটপাড়া, জেলা চব্বিশ পরগণা। কেয়ার অব শ্রীব্যোমকেশ বন্দ্যোপাধ্যায়। এই ঠিকানায় ঠিক যাবে ত?

শশীমুখী দেবী বলেন, যাবে বইকি বাবা, নিশ্চয় যাবে, তোমাদের চিঠি তাদের কাছে না গিয়ে কি পারে।

মণ্টু আবার অনুযোগের সুরে বললে,—কিন্তু ব্যোমকেশদা এখনো ফিরছেন না কেন? ক্লাবটা যে এবার উঠে যাবে জেঠাইমা, আমরা থিয়েটার করবো কেমন ক'রে। পূজোর সময় যে রাবণবধ নাটক হওয়ার কথা।

শশীমুখী দেবী এবার একটু বিচলিত হয়ে উঠলেন। চোখের পাতাগুলো তাঁর ভারী হয়ে উঠলো। সুরমা দেবী মণ্টুকে থামিয়ে দিয়ে বললেন,—থাক, ওসব কথা পরে হবে।

শশীমুখী দেবীর মুখের দিকে চেয়ে সুরমার চোখ দুটো হঠাৎ ছল ছল ক'রে উঠলো। একটু সামলে নিয়ে বললেন,— এবার আমরা যাই দিদি, এর মধ্যে পারি ত আর একদিন আসবো।

সন্ধ্যা হয়ে আসছে। শশীমুখী দেবী সুরমাকে একটু এগিয়ে দিয়ে এলেন। কারো মুখে কোন কথা নাই। শশীমুখী দেবীর চোখের কোণে বোবা অশ্রু গণ্ড ছাপিয়ে গড়িয়ে পড়বার বুঝি পথ খুঁজছে।

কর্তার কিন্তু কঠিন প্রাণ। শশীমুখী দেবী অবাক হয়ে যান। কোম্পানীর অফিস নিয়েই ব্যস্ত। কাজকর্মে এতটুকু ব্যতিক্রম হওয়ার উপায় নাই। কিছুদিন ছুটি নিয়ে নিজে তিনি বাইরে গিয়ে একটু খোঁজখবর করলে এই ভাবে কি আজও তারা আত্মগোপন ক'রে থাকতে পারতো। কর্তা বললেন, সে কাজ আমার নয়। পথে পথে হন্যে কুকুরের মত অমুক মুখুজ্যে তার জানপিটে জামাইকে এইভাবে খুঁজে বেড়াতে পারে না। ওটা নাকি তাঁর মর্যাদার বাইরে। শোন একবার কথা।

সে রাত্রে শশীমুখী দেবীর খাওয়াই হলো না। বিছানায় পড়ে পড়ে শুধু ছটফট করতে লাগলেন। চোখে ঘুমের লেশ নাই। বৈশাখ জ্যেষ্ঠ আষাঢ় গেল, ভাদ্রমাস শেষ হ'য়ে আশ্বিনে পড়লো। এ মাসটা শশীমুখী দেবী কাটাবেন কেমন ক'রে। চণ্ডীমণ্ডপে আবার নহবৎ বাজবে, পূজার আনন্দে ভরে উঠবে সারা দেশ। কত উৎসব, কত আয়োজন, ছেলেমেয়েদের হাসি-খুশিতে ভরে উঠবে আর সকলের গৃহপ্রাঙ্গণ। শুধু এই বাড়ীতেই বোধনের বাঁশি বাজবে না।

বৎসরান্তে উমা আসছেন গিরিভবন আলো করতে। গিরিরানীকে যে ঘর সাজাতে হবে। রূপের ছটায় দশদিক আলো ক'রে সিংহবাহিনী মা দশভূজা আসছেন। উমা যে আজ গৌরী হয়ে ফিরে এলো। পৃথিবীর মাটিতে তাঁর ছোঁয়া এসে লেগেছে। ধরিত্রী যেন শরতের বুকভরা আশ্বাস

নিয়ে নিবিড় ব্যথায় থর থর ক'রে কাঁপছে। বাঙলার মাতৃহৃদয় বাৎসল্যের স্তন্যরসে বুঝি সিক্ত হয়ে উঠলো মা মেনকার অধীর প্রতীক্ষায়। ঘরে ঘরে আজ মেনকার চোখে ঘুম নাই।

বীতবর্ষণ তিমিরাচ্ছন্ন রাত্রি। মেঘমেদুর আকাশের কোলে মাঝে মাঝে শুধু একটু ক'রে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। বিষাদ-মৌন বিরাট একটা শূন্যতা অন্ধ আবেগে দিক হারিয়ে শশীমুখী দেবীর মনের মধ্যে যেন গুমরে গুমরে উঠছে। উমা কি তাঁর আসবে না!

এ ব্যথা কিন্তু শশীমুখী দেবীর একার নয়। তাঁরই মত আরও কত মা বছরের পর বছর ধরে এমনি করেই অধীর আগ্রহে দিন গুণছে। কন্যা-বিরহকাতরা মমতাময়ী জননীর এ আকৃতি যে চিরন্তন। উমা কি তার আসবে না!

সেদিন সন্ধ্যাবেলা কর্তাগৃহিনীর মধ্যে আলোচনাটা আবার উঠে পড়লো মেয়ে জামাইয়ের প্রসঙ্গ নিয়ে। শশীমুখী দেবী বললেন,—আমার একটা কথা শুনবে! খবরের কাগজে একটা বিজ্ঞাপন দিয়ে দিলে হতো না, নিরুদ্দেশের পাতায়! আজও তারা ফিরলো না যে।

ভবেশবাবু জবাব দিলেন,—ফিরবে গিন্নী—ফিরবে, না ফিরে যাবে কোথায়। বাবাজীবনের এটা একটা জেদ, তারও ত একটা মূল্য আছে। সে মূল্যটুকু আরও কিছুদিন না হয় স্বীকার ক'রে নিলাম।

—কিন্তু সরযূর শারীরিক অবস্থার কথাটা একটু ভাবছো না কেন? তার পক্ষে এটা যে খুব খারাপ সময়।

—হলেই বা কি করছো। দেখ আরও মাসখানেক অপেক্ষা ক'রে। তার পর যদি দরকার হয়—দেব কাগজে বিজ্ঞাপন, হুলিয়া করতে হয় করবো। কিন্তু জান কি গিন্নী, হঠাৎ একটা সে রকমের কিছু করতে আমার আত্মসম্মানে বাধছে।

বাণেশ্বর এসে খবর দিলে,—চৌধুরী সাহেব আসছেন।

শশীমুখী দেবী একটু আশ্বস্ত হয়ে বললেন,—ভালই হলো, আসুন তিনি। তোমরা দু'বন্ধুতে যুক্তি ক'রে যা হোক কিছু একটা কর বাপু, আমি আর ভাবতে পারছি না।

চৌধুরী সাহেব অন্দরে এসে ঢুকলেন। বাণেশ্বর আর একখানা চেয়ার এগিয়ে দিয়ে গেল বারান্দায়। ভবেশবাবু প্রশ্ন করলেন,—কন্ফারেন্স থেকে ফিরলে কখন ?

চৌধুরী সাহেব আসন গ্রহণ ক'রে বললেন,—ঘণ্টাখানেক আগে। কন্ফারেন্স শেষ ক'রে ধানবাদ থেকে একটু পশ্চিমে গিয়ে পড়েছিলাম। আমার এক বাল্যবন্ধুর সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়ে গেল ধানবাদে। বের্মোয় তিনি সরকারী ডাক্তার। কিছুতেই ছাড়লে না, ধরে নিয়ে গেল একটা দিনের জন্য। ওকি, বৌদি উঠছেন যে ?

—আপনার জন্য একটু চায়ের ব্যবস্থা ক'রে আসি। কতদূর থেকে এলেন।

—চা এখন থাক, পরে খেলেও চলবে,—বসুন আপনি, বিশেষ একটু কথা আছে।

উৎসুক দৃষ্টি মেলে তাকালেন এবার শশীমুখী দেবী। চৌধুরী সাহেব একটু মৃদু হেসে বললেন,—আমি আপনার মেয়ে জামাইয়ের খবর নিয়ে এসেছি বৌদি।

শশীমুখী দেবী ব্যাকুল কণ্ঠে বলে উঠলেন,—কোথায়—কোথায় তারা, আপনার সঙ্গে দেখা হয়েছে ?

—হ্যাঁ—দেখা হয়েছে, আছে তারা বের্মোয়। জামাই সেখানে কাজ করছে।

—সরযূর খবর কি ঠাকুরপো ?

—ভাল আছে, তার সঙ্গেও দেখা হয়েছে।

—সরযূর সন্তান হবে বলে যে শুনেছিলাম ঠাকুরপো !

—হবে, খুব শিগ্গীর।

ভবেশবাবু উৎসুক হয়ে বলে উঠলেন,—তাদের সঙ্গে তোমার দেখা হলো কেমন ক'রে ?

চৌধুরী সাহেব শুরু করলেন,—কাল বিকেলবেলা বসেছিলাম ডাক্তারের বাইরের ঘরটায়। হঠাৎ চোখে পড়লো হাসপাতালের বারান্দায় একটা বেঞ্চির উপর পাশাপাশি বসে আছে ব্যোমকেশ আর সরযূ। তাড়াতাড়ি কাছে গেলাম। অবাক হয়ে গেল ওরা আমাকে দেখে।

শশীমুখী দেবী বলে উঠলেন,—অবাক হওয়ার যে কথাই ঠাকুরপো, ভাগ্যিস আপনি গিয়ে পড়েছিলেন।

পুনরায় বলে চললেন চৌধুরী সাহেব,—ব্যোমকেশ একটু হকচকিয়ে উঠলো। বললে—কাকাবাবু, আপনি হঠাৎ এখানে? বললাম, বেড়াতে এসেছি, কিন্তু তুই এখানে করছিস কি, আছিস কোথায়? বাবাজীবন জবাব দিলে—ঠিকাদারের আণ্ডারে কাজ করছি, বাজারের দিকে আছি একটা বাসা ভাড়া ক'রে।

—হাসপাতালে ওরা কি জন্য গিয়েছিলো, ঠাকুরপো?

—ডাক্তারের কাছে সরযূকে একটু এগজামিন করাতে।

শশীমুখী দেবী উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠলেন? তাড়াতাড়ি আবার প্রশ্ন করলেন, —কি হয়েছে সরযূর, অসুখ বিসুখ কিছু?

চৌধুরী সাহেব আশ্বাস দিয়ে বললেন,—না—তেমন কিছু না। ডেলিভারির জন্য প্রস্তুত হতে হবে ত, তাই ডাক্তারের সঙ্গে একটু পরামর্শ ক'রে নেওয়া। সরযূ দেখলাম বেশ ভারী হয়ে উঠেছে। সেই হাসি হাসি মুখ, আমাকে দেখে কি খুশীই যে হলো।

শশীমুখী দেবীর চোখ দুটো ছল্ ছল্ ক'রে উঠলো। বললেন,—সরযূ কি বললে ঠাকুরপো?

জবাব দিলেন চৌধুরী সাহেব,—পায়ের ধূলো নিয়ে প্রণাম করলে সরযূ, বললে—মা কেমন আছেন, বাবা কেমন আছেন কাকাবাবু। বললাম, —ভাল আছে মা, তুই বেশ ভাল আছিস ত! সরযূ ঘাড় নেড়ে বললে —হ্যাঁ—ভালই আছি। ডাক্তারকে ডেকে মেয়েটাকে একবার পরীক্ষা করিয়ে নিলাম। হাসপাতাল থেকে কয়েকটা ওষুধ ওরা দিয়ে দিলে, ডেলিভারির আগে পর্যন্ত চলবে ওগুলো।

শশীমুখী দেবী আহত কণ্ঠে বললেন,—এক কৌটা ওষুধের জন্ত মেয়েকে আমার হাসপাতালে গিয়ে দাঁড়াতে হয়। ঠাকুরপো, এমনি আমার ভাগ্য।

চৌধুরী সাহেব সান্ত্বনা দিয়ে বললেন,—তাতে কি হয়েছে বৌদি, ওখানে যে স্পেশালিস্ট বলতে ওই একটাই। সেখানে থাকতে হলে তাঁর সাহায্য নিতেই হবে। তারপর শুনুন। হাসপাতাল থেকে ওরা বেরুতেই গাড়ীটা তাড়াতাড়ি বের ক'রে ওদের বসিয়ে নিলাম। বললাম—চল্, তোদের ঘরসংসারটা একবার দেখে আসি। কোথায় আছিস—কি ভাবে আছিস —নিজের চোখে আমি দেখে যেতে চাই। সরযূ খুব খুশী হলো। ব্যোমকেশ বাবাজী বেশ আদর-যত্ন ক'রে ত বসালে তার বাসায়, তার পর সে কোথায় যেন বেরিয়ে গেল।

ভবেশবাবু প্রশ্ন করলেন,—ওরা কি মোহনপুর থেকে সোজা গিয়ে উঠেছিলো বের্মোয় ?

—না, প্রথম গিয়ে উঠেছিলো কাতরাসে। সেখানকার একটা কলিয়ারিতে ক্যাশ অফিসে চাকরি নেয় ব্যোমকেশ। ছিলো প্রায় মাস চার পাঁচ। তার পর হঠাৎ কি যেন একটা গোলমাল হলো, চাকরিটা খোয়ালো।

শশীমুখী দেবী একটু উৎকণ্ঠিত হয়ে বলে উঠলেন,—গোলমাল কিসের ঠাকুরপো, সাহেবকে ধরে মারপিট করেনি ত !

চৌধুরী সাহেব জবাব দিলেন,—না—না—সে সব কিছু না। আপনি যেন দুঃখ করবেন না বৌদি, কথাটা বেশ ভাল কথা নয়।

ভবেশবাবু একটু গম্ভীর হয়ে বললেন,—আমি বুঝেছি পিটসাহেব, আর বলতে হবে না। টাকাকড়ি কিছু তছরুপ করেছে, তাই না ?

চৌধুরী সাহেব একটু ইতস্তত ক'রে বললেন,—হ্যাঁ—কতকটা সেই রকমই, ব্যাপারটা অবশ্য মিটমাট হয়ে গেছে শেষ পর্যন্ত। কোম্পানীর পাওনা-গণ্ডা 'টু-দি-পাই' হিসেব ক'রে মিটিয়ে দিতে হয়েছে।

অধৈর্য হয়ে বলে উঠলেন ভবেশবাবু,—এই রকমেরই যে একটা কিছু ঘটবে—তা আমি জানতাম। চিরকালের বখাটে কাণ্ডজ্ঞানহীন একটা অমানুষ। ধরে চাবকালে শোধ যায় না।

চৌধুরী সাহেব তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বললেন,—তুমি আবার হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে উঠছো কেন হে সারফেস, এটা কি একটা উত্তেজনার সময় ।

শশীমুখী দেবী সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন,—আপনিই দেখুন—আপনিই দেখুন ঠাকুরপো, এই হলো ওঁর স্বভাব। তা না হলে এমনটা আজ ঘটবে কেন।

ভবেশব বু একটু সামলে নিয়ে বললেন,—তার পর ?

চৌধুরী সাহেব শুরু করলেন,—কাতরাসগড়ের চাকরিটা যাওয়ার পর এখান ওখান কিছুদিন ঘোরাঘুরি ক'রে উঠল গিয়ে শেষ পর্যন্ত বের্মোয়। মাস-চারেক হলো সেইখানেই রয়েছে।

শশীমুখী দেবী আবার প্রশ্ন করলেন,—সরযূর সংসারের কাজকর্ম কিভাবে চলছে ঠাকুরপো !

—ঠিকের একটা ঝি আছে দেখলাম, বাসনপত্রগুলো মেজে দিয়ে যায়। রান্নাবান্নার কাজটা সরযূ এখনো চালিয়ে যাচ্ছে কোন রকমে।

শশীমুখী দেবী চঞ্চল হয়ে উঠলেন,—একে তার শরীরের ওই অবস্থা, তার ওপর কি না সংসারের খাটুনি। এও কি কেউ সহ্য করতে পারে ঠাকুরপো, আপনিই বলুন।

চৌধুরী সাহেব জবাব দিলেন,—মেয়েদের যে অনেক কিছু সহ্য করতে হয় বৌদি, সহ্য করতে না শিখলে তারা মানুষ হবে কেমন ক'রে। ও নিয়ে আপনি এতটা চঞ্চল হবেন না।

কি যেন একটু ভাবলেন শশীমুখী দেবী। পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন,—আচ্ছা ঠাকুরপো, সরযূর গয়নাগাঁটি কিছু কিছু দেখলেন গায়ে? আছে এখনো কিছু ?

চৌধুরী সাহেব একটু ইতস্তত ক'রে বললেন,—আছে বৈকি, কিছু কিছু নিশ্চয় আছে। আমি আর খুঁটিয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করি নি এ সব কথা, কি জানি পাছে কোন দুঃখ পায় মেয়েটা, তাই একটু চেপে গেলাম। হ্যাঁ—যা বলছিলাম, ওদের বাসার কথা। সরযূমা চা করে খাওয়ালো। ব্যোমকেশ বাবাজী বাজার থেকে এক কাঁড়ি খাবার এনে হাজির করলে। খেলাম সব

একসঙ্গে বসে। ব্যোমকেশকে বললাম,—বাড়ী চল্ আমার সঙ্গে, কি হবে এখানে এইভাবে পড়ে থেকে। বাবাজী কিন্তু রাজী হলো না।

ভবেশবাবু বলে উঠলেন,—ওর কান ধরে টানতে টানতে গাড়ীর উপর বসিয়ে দিতে পারলে না। ছেলে একেবারে লায়েক হয়ে গেছে, পেটি একটা ঠিকাদারের আণ্ডারে চাকরি ক'রে আমার সপ্তপুরুষ উদ্ধার করছেন। তুমি দেখে নিয়ো পিট-সাহেব, ও ছেলে ভবিষ্যতে আরও বহু মনস্তাপের কারণ ঘটাবে, এ আমি তোমাকে বলে রাখলাম।

চৌধুরী সাহেব পুনরায় বলে চললেন,—আমি আবার বললাম—এ সব পাগলামি ছাড়, চল্ আমার সঙ্গে। ব্যোমকেশ বললে—যেতে আমাকে হবে কাকাবাবু, সরযূকে আমি কথা দিয়েছি, সেখানে গিয়ে তাকে পৌছে দিয়ে আসতে হবে। যাক আরও কিছুদিন।

ভবেশবাবু একটু উষ্ণ হয়ে বললেন,—অর্থাৎ মেয়েটাকে একেবারে শেষ করে দিয়ে তবে আঁন্‌বে! এর কোন মানে হয়! মেয়েটার অবস্থা কেমন দেখলে, ডেলিভারি স্ট্যাণ্ড করতে পারবে ত?

চৌধুরী সাহেব বললেন—তা হয়ত পারবে! তাছাড়া ডাক্তারকে আমি বিশেষ ক'রে বলে দিয়ে এসেছি। দুশ্চিন্তার কোন কারণ নাই। ফেরবার মুখে আজও সকালবেলা সরযূর সঙ্গে দেখা ক'রে এলাম। সরযূ কিন্তু এবার কেঁদে ফেললে। বললে—বাড়ী গিয়েই মায়ের সঙ্গে দেখা করবেন কাকাবাবু, বুঝিয়ে তাঁদের বল্‌বেন আমাদের কথা। মনটা বড় খারাপ হয়ে গেল। বললাম—বলবো রে পাগলী, সব কথাই বলবো। যাবার সময় চোখের জল ফেলে পথটা আমার পিছল ক'রে দিস না মা।

চৌধুরী সাহেবের মুখখানা করুণ হয়ে উঠলো। শশীমুখী দেবী অনেক আগেই ভেঙ্গে পড়েছেন। শুধু ভবেশবাবু গম্ভীর হয়ে কি যেন একটা ভাবতে লাগলেন। ধীরে ধীরে বলে উঠলেন,—সংবাদটা ত পাওয়া গেল, এখন করা যায় কি বল দেখি।

চৌধুরী সাহেব জবাব দিলেন, তাদের আসবার জন্ত অনুরোধ ক'রে একটা 'প্রি-পেড' টেলিগ্রাম ক'রে দিলে কেমন হয়।

—কিন্তু সরযূর এই অবস্থায় আসাটা কি সম্ভব হবে ?

প্রশ্ন করলেন ভবেশবাবু। চৌধুরী সাহেব একটু স্বর টেনে বললেন,—তা হয়ত এখনো হতে পারে, কিন্তু আর বেশী দেরি হলে শিফ্‌ট করা চলবে না।

শশীমুখী দেবী উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন বললেন,—আমি নিজে গিয়ে তাদের ধরে নিয়ে আসবো, যেমন ক'রে পারি। আজই আমাকে গাড়ীতে তুলে দিয়ে এসো, সঙ্গে একটা লোক দিয়ে।

ভবেশবাবু জবাব দিলেন,—এতটা অধৈর্য হলে ত চলবে না গিন্নী, টেলিগ্রামের জবাবটা কি আসে আগে দেখে নাও, তার পর যা হয় ভেবে-চিন্তে করা যাবে।

সম্প্রতি সেই যুক্তিই স্থির রইলো। সকালবেলা আর্জেণ্ট টেলিগ্রাম ক'রে জানানো হলো ব্যোমকেশকে—'সকলেই উদ্বিগ্ন, সত্বর বাড়ী চলে এসো।'

কেটে গেল আরও কয়েকটা দিন, টেলিগ্রামের কিন্তু জবাব এলো না। শশীমুখী দেবীর পরামর্শই শেষ পর্যন্ত গ্রহণ করতে হলো ভবেশবাবুকে। লোক পাঠানোই স্থির হলো। জমিদারী অফিসের কেরাণী পাঁচকড়ি লোকটি বেশ বুদ্ধিমান, ভবেশবাবুর বিশেষ অনুগত। মানদা ঝিকে সঙ্গে নিয়ে বের্মো রওনা হওয়ার জন্য প্রস্তুত হলো পাঁচকড়ি। দরকার হলে ভবেশবাবুও দু'চারদিনের মধ্যেই রওনা হয়ে যাবেন সস্ত্রীক।

গৌরাংডি ব্র্যাঞ্চ লাইনের ট্রেনখানা জংশন থেকে এসে পৌঁছয় সকাল সাতটা বেজে তিরিশ মিনিটে। সারাদিন আর গাড়ী নাই। ভোর চারটে থেকে তোড়জোড় করছেন শশীমুখী দেবী এদের রওনা ক'রে দেবার জন্য। খাবারের পোঁটলা হাঁড়ি, জ্যাম জেলি আমসত্ব অনেক কিছু আয়োজন। মেয়ের বাড়ী যেন পর্বদিনের তত্ত্ব পাঠাচ্ছেন। মানদা ঝিকে পই পই ক'রে বলে দিলেন তিনি, রেলগাড়ীতে ওঠা নামার সময় কোন কিছু যেন ছুট না হয়ে যায়।

মানদা খুব হুঁশিয়ার মেয়ে। এ বিষয়ে তার ভুলচুক হওয়ার কথা নয়। গিন্নীমাকে আশ্বস্ত ক'রে বললে মানদা,—আপনি নিশ্চিন্তি থাকুন মা, এর একটি দানাও আপনার খোয়া যাবে না।

শশীমুখী দেবী মানদাকে আর একটিবার সজাগ ক'রে দিয়ে বললেন,—তোকে আমি বিশ্বাস ক'রে পাঠাচ্ছি মানদা, তুই যেন আমার সরযুকে একটু দেখিস। তার যেন কোন অযত্ন না হয়।

মানদা ভরসা দিয়ে বললে,—আমি থাকতে, সেজন্যে আপনি কিছু ভাববেন না। কিন্তু একটা কথা আমি এখন থেকে আপনাকে বলে রাখছি মা, দিদিমনির খোকা হলে আমি কিন্তু তাকে কোলে করবো সব চেয়ে আগে। মধু চাটিয়ে মাসী বোনপো সম্বন্ধটা পাকা ক'রে ফেলবো একেবারে শুরুতেই।

শশীমুখী দেবী পুলকিত হয়ে উঠলেন মানদার কথা শুনে। হাসতে হাসতে বললেন,—আর যদি খুকী হয়!

সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলো মানদা,—আহা—তাই হোক মা, তাই হোক; খুকীর দাম যে লক্ষ টাকা। দিদিমণির বাচ্ছাকে আমি কোলে পিঠে ক'রে মানুষ ক'রে দেব মা, ভাবতে হবে না আপনাকে এতটুকু।

শশীমুখী দেবী আর একটিবার হাসলেন!

পাঁচকড়ি একটা সুটকেশ হাতে ঝুলিয়ে হাজির হলো ঠিক সময়ে। ভবেশবাবু আর একবার তাকে সচেতন ক'রে দিলেন বের্মোয় গিয়ে তার করণীয় কর্তব্য সম্বন্ধে। সরযূর যদি আসা হয় ভালই, তা সম্ভব না হলে সেখানে একটা বড় দেখে বাড়ী ভাড়া ক'রে সঙ্গে সঙ্গে যেন ফিরে আসে পাঁচকড়ি। অফিসের কাজকর্মগুলো একটু সামলে নিয়ে ভবেশবাবুকেই যেতে হবে সেখানে কিছুদিনের জন্য। যেতেই হবে, উপায় নাই।

আরও বললেন ভবেশবাবু,—আর দেখো, খরচ খরচা সম্বন্ধে কোনরকম কার্পণ্য করবে না। ডাক্তারের ফি, বাড়ীভাড়ার এডভান্স, ঔষধ পথ্য ইনজেকশন, সম্ভব হলে একটা পেড নার্স পর্যন্ত; যা কিছু এর জন্য দরকার—সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা ক'রে ফেলবে।

পাঁচকড়ি সায় দিয়ে বললে,—আজ্ঞে হ্যাঁ—সে বিষয়ে কোন ত্রুটি হবে না, আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন।

ভবেশবাবু শশীমুখী দেবীকে তাগিদ দিয়ে বললেন,—কইগো—তোমাদের সব হলো?

মানদা পোঁটলা পুঁটলি নিয়ে তৈরি হয়ে বসে আছে। বাণেশ্বর ওগুলো দু'হাত দিয়ে ঝুলিয়ে নিলে। রেলগাড়ীতে ওদের চাপিয়ে দিয়ে স্টেশন থেকে ফিরে আসবে বাণেশ্বর। পাঁচকড়ি আর মানদা বাণেশ্বরের পিছু পিছু গিয়ে জিনিসপত্র গুছিয়ে গাড়ীতে উঠলো। দুর্গানাম স্মরণ ক'রে শশীমুখী দেবী ওদের সদর দোর পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে এলেন। স্টেশনে ওদের নামিয়ে দিয়ে গাড়ী ফিরলো কিছুক্ষণ পর। ভবেশবাবু এতক্ষণে নিশ্চিন্ত হলেন। আর এক কাপ চা খেয়ে তিনি রওনা হয়ে গেলেন অফিসের কাজে।

পাঁচকড়ি আর মানদাকে যেতে হলো না বেৰ্মা পর্যন্ত। সাতটার গাড়ীতে জামাইবাবু নিজেই এসে নেমেছেন। প্ল্যাটফর্মেই দেখা হয়ে গেল। বাণেশ্বর এগিয়ে গিয়ে সচকিতে বলে উঠলো,—একি, জামাইবাবু আপনি একা যে? কোলে আপনার কি ওটা!

রুক্ষ চেহারা, উসকো খুসকো মাথার চুল, পাগলের মত দৃষ্টি। বাণেশ্বরের কথার কোন জবাব না দিয়ে ভাঙা গলায় বলে উঠলো ব্যোমকেশ,—একটা রিক্শা—শিগ্‌গীর একটা রিক্শা ডেকে দাও বাণেশ্বর, খুব জলদি।

ব্যোমকেশের অবস্থা দেখে মানদা বুঝি ডুকরে একবার কেঁদে উঠলো। বুকের ভিতরটা আঁকুপাঁকু করে উঠলো মানদার। দিদিমণি গেল কোথায়! কোথায় তাকে রেখে এলেন জামাইবাবু!

পাঁচকড়িকে ফিরতে হলো। জিনিসপত্রগুলো আবার গুটিয়ে মানদাকে সুদ্ধ একটা রিক্শার উপর চাপিয়ে দিলে পাঁচকড়ি। আর একটায় গিয়ে উঠে বসলো ব্যোমকেশ। কোলে তার ছোট্ট একটা কাঁথা-জড়ানো সাত দিনের এক শিশু, ব্যোমকেশের সদ্য-জাতা কন্যা।

বাণেশ্বর স্তম্ভিত হয়ে গেছে। মুখ দিয়ে তার কথা সরছে না। রিক্‌শা দু'খানা স্টেশনের কাছে ছেড়ে দিয়ে সোজাপথ ধরে তাড়াতাড়ি হেঁটে চললো বাণেশ্বর। পাঁচকড়ি উর্ধশ্বাসে ছুটলো কোম্পানীর জমিদারি অফিসের দিকে মুখ ক'রে। আগের রিক্‌শায় মানদা, পিছনেরটায় ব্যোমকেশ। ঠুন্ ঠুন্ শব্দে ঘণ্টি বাজিয়ে জোর কদমে এগিয়ে চললো রিক্‌শা। ব্যোমকেশ একটা হাঁক দিয়ে বললে,—রোখকে—রোখকে—জেরা আস্তে, বাচ্ছা হ্যায়।

রিক্‌শার গতি মন্থর হয়ে গেল। গৌরাংডির আকাশে বাতাসে অকস্মাৎ যেন ছড়িয়ে পড়লো দূরাগত কোন্ এক বুকফাটা কান্নার স্বর। বিরাট একটা কালো ধোঁয়ার কুণ্ডলী আকাশটাকে লেহন করতে করতে ব্যোমকেশের চোখের সামনে চারিদিক যেন গ্রাস ক'রে ফেললে। সবই যেন ঝাপ্সা হয়ে গেল এক মুহূর্তে। প্রভাত সূর্যের উচ্ছ্বসিত আলোকছটা শালবীথির শীর্ষদেশ বিদীর্ণ ক'রে পৃথিবীর পানে কৌতূহলী দৃষ্টি মেলে দিগন্ত থেকে উঁকি মারছে। ব্যোমকেশের আচ্ছন্ন দৃষ্টির সামনে কিন্তু এতটুকু আলো নেই, কফিনের পর্দা দিয়ে কে যেন সব ঢেকে দিয়েছে। পথ দেখা যায় না, সবই যেন ধোঁয়াচ্ছন্ন। উন্মাদের মত এ কোথায় এসে পড়লো ব্যোমকেশ! কোথায় গিয়ে সে দাঁড়াবে।

বুকের ভিতর চিতা জ্বলছে। সরযূর চিতা। ব্যোমকেশ যে দামোদরের তীরে গিয়ে নিজের হাতে সরযূকে শেষ ক'রে দিয়ে এসেছে। হাসপাতাল থেকে আর তাকে ফিরিয়ে আনা গেল না। একমুঠো চাঁপাফুলের মত একখানির সোনার পুতলি ব্যোমকেশের হাতে তুলে দিয়ে চোখ দু'টি বুজে নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়লো সরযূ। সে ঘুম আর ভাঙলো না। কোনদিন যে স্বপ্নেও একথা ভাবতে পারে নি ব্যোমকেশ। আগুন জেলে দিয়ে গেল সরযূ, দামোদরের চিতার আগুন ছড়িয়ে দিয়ে গেল ব্যোমকেশের বুকে। বুকটা পুড়ে খাক হয়ে গেল যে! সরযূর চিতাভস্ম অঙ্গের বিভূতি ক'রে কতবার যে লেপন করলে ব্যোমকেশ তার সারা অঙ্গে, নির্বাপিত চিতার পাশে দাঁড়িয়ে। এতটুকু ছোঁয়া—একটুখানি তার অঙ্গের চন্দন পরশ, সে কি আর পাওয়া যাবে না! নাঃ—মন তাতে ভরলো না, জ্বালা তবু জুড়লো না। সেই চিতার আগুন হু হু ক'রে জ্বলছে।

রিক্‌শা কোথায় এগিয়ে চললো? ব্যোমকেশকে কোথায় নিয়ে যেতে চায়! একি আর মাঝপথে কোথাও থামবে না?

বাড়ীর কাছাকাছি গিয়ে মানদা ঝি রিক্‌শা থেকে নেমে পড়লে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটলো সে বাড়ীর মধ্যে খবর দিতে। উদ্‌ভ্রান্ত ব্যোমকেশ মনের ভুলে পথ হারিয়ে কোথায় যেন এসে পড়েছে। বাচ্ছাটাকে বুকে ফেলে টলতে টলতে এগিয়ে চললো যেন একটা প্রেতমূর্তি। বাণেশ্বর জুটলো এসে তার পিছনে। একসঙ্গে বাড়ী ঢুকলো। মুহূর্তের মধ্যে যেন প্রচণ্ড এক ভূমিকম্পের দোলায় কেঁপে উঠলো সমস্ত বাড়ীখানা। টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙ্গে পড়লো বুঝি। ভেসে উঠলো বুকফাটা কান্নার রোল।

ভবেশবাবু পাঁচকড়িকে সঙ্গে নিয়ে পাগলের মত এসে বাড়ী ঢুকলেন। দামোদরের চিতার আগুন লেলিহান শিখা মেলে ছড়িয়ে পড়েছে তাঁর অন্তঃপুরে। ভিত পর্যন্ত পুড়ছে। দূর থেকে ভবেশবাবুকে দেখেই শশীমুখী দেবী বুক চাপড়ে চীৎকার ক'রে উঠলেন,—সরযূর মেয়ে হয়েছে—খুকীর আমার খুকী হয়েছে, তুমি তাকে তাড়াতাড়ি দেখবে এসো।

সরযূর মেয়ে হয়েছে। তবু আজ এ বাড়ীতে শাঁক বাজছে না! তবু আজ এতটুকু আনন্দের সাড়া জেগে উঠলো না ভবেশবাবুর গৃহ-প্রাঙ্গন ঘিরে! সরযূর যে সন্তান হয়েছে।

আর সরযূ? সে আজ কোথায় মিলিয়ে গেল ছায়াবাজীর মত! এতকালের বন্ধন কেমন ক'রে সে এক মুহূর্তে ছিন্ন ক'রে চলে গেল। সে কি আর আসবে না? এই বাড়ীতে সন্ধ্যাপূজার প্রদীপখানা জ্বালতে সে কি আর কোন দিন ফিরে আসবে না?

আসবে। সন্ধ্যার প্রদীপ হয়ে সে আবার ফিরে আসবে। দিনের আলোয় সরযূকে আর দেখা যাবে না। গোধূলির রক্ত-রাঙা অন্তহীন নীহারিকা পার হয়ে সরযূ আবার ভেসে উঠবে নীলিমার বুকে। দূর থেকে মাটির পানে দৃষ্টি মেলে অনিমেষে চেয়ে থাকবে আকাশের ছোট্ট একটি তারা হয়ে। সেইখানে তাকে খুঁজে দেখো।

এগার

জীবন-মহাসমুদ্রের এক তীরে জন্ম, অপর তীরে মৃত্যু। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত জীবন যেন তিলে তিলে পলে পলে এগিয়ে চলেছে এক মহাপরিণামের দিকে। লক্ষ্য তার ধ্রুব, গতি তার বিরাম-বিহীন। মাঝখানে সীমিত যে ব্যবধানটুকু—তার মাঝে সুখ আর দুঃখ, হাসি আর কান্নার খেলা। এই জন্ম আর মৃত্যু, হাসি আর কান্নাই মানুষের জীবন। একটাকে স্বীকার করতে হলে আর একটাকে স্বীকার না করে উপায় নাই। এই জন্ম মৃত্যু সুখ দুঃখ ও হাসি কান্নায় ঘেরা জীবনের গভীরতম রহস্যই প্রতিনিয়ত বিকশিত হয়ে চলেছে মানুষের অনবদ্য জীবনলীলায়, সে কোন্ এক মহাশক্তির ইঙ্গিতে। সে কি মায়া! মানুষ যখন ভেঙ্গে পড়ে জীবনের চরমতম আঘাতে, লুটিয়ে পড়ে গভীরতর বেদনায়, মায়া এসে তার কানে কানে কত আশার বাণী শোনায়, গেয়ে যায় ব্যথাভোলা গান। সঙ্গে তার সদা-জাগ্রত মহাকালের প্রহরী। কালের প্রলেপ দিয়ে বেদনার ক্ষতটুকু ধীরে ধীরে মিলিয়ে দিয়ে যায়, জুড়িয়ে দেয় তার সকল জ্বালা। মহাকালের অমোঘ আশীর্বাদে জেগে ওঠে মৃতকল্প প্রাণ। নূতনতর দৃষ্টি দিয়ে আবার সে ফিরে চায় এই মায়াঘেরা পৃথিবীর পানে। মায়া তাকে রূপে রসে বর্ণে সুষমায় মণ্ডিত ক'রে আবার যেন তুলে ধরে মানুষের চোখের সামনে। মানুষ আবার বাঁচতে চায় ভবিষ্যতের জীবন-স্বপ্ন নিয়ে। হাতের কাছে যেটুকখানি সম্বল, তাকেই আবার আঁকড়ে ধরে জীবনের গভীরতম আশ্বাসে।

•

নবজীবনের অঙ্কুর পর্যাপ্ত স্নেহরসে পুষ্ট হয়ে শতদলে বিকশিত হয়ে উঠলো। ভবেশ-দম্পতির সামনে এসে কে আবার দাঁড়ালো· ওই মায়াবিনী শিশুকন্যা, মর্ত্যের অফুরন্ত মাধুরী আর স্বর্গের সুষমা নিয়ে। ও যে মূর্তিমতী সান্ত্বনা। শুক্লাতিথির চাঁদের মত কলায় কলায় তিলে তিলে যেন ভরে উঠতে লাগলো। দৌহিত্রী শুভ্রা। মায়ার বাঁধনে আবার বুঝি বাঁধা পড়ে গেলেন ভবেশবাবু।

সাত দিনের মেয়ে সাত বৎসর পার হয়ে গেল। দেখতে দেখতে ভেয়োর গিয়ে পড়লো। কোম্পানীর সেরেস্তা থেকে বিদায় নিলেন ভবেশবাবু।

পরিণত বয়সে কর্মজীবন থেকে অবসর গ্রহণের পর ভবেশবাবুর ঐকান্তিক ইচ্ছা ছিলো সংসারের কোলাহল থেকে বহুদূরে কোন এক মহাতীর্থে গিয়ে জীবনের বাকী দিনগুলি অধ্যাত্মচিন্তায় অতিবাহিত করা। মাঝখানে পুণ্যতীর্থ বারাণসীধামে স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য একখানা বাড়ী পর্যন্ত কেনা হয়েছিলো। কিন্তু সংসার তাঁকে ছুটি দিলে কই। সমস্যা যে দৌহিত্রী তন্দ্রা। কি আশ্চর্য আকর্ষণ ওই এক ফোঁটা মেয়ের। ওই মায়াময়ী কিশোরী যেন তার পুষ্পপেলব বাহুদুটি বিস্তার ক'রে অফুরন্ত মায়া নিয়ে সামনে এসে দাঁড়ালো, যাত্রপথ রুদ্ধ ক'রে। তীর্থবাসের পরিকল্পনা তাই আপাতত স্থগিত রয়ে গেল কিছুদিনের জন্য। তন্দ্রার একটা পাকাপাকি ব্যবস্থা কিছু না ক'রে এঁদের কোথাও পা বাড়াবার উপায় নাই।

স্নেহ-দুর্বল ভবেশ দম্পতির একমাত্র বন্ধন এই তন্দ্রা, মা-হারা ওই হতভাগী মেয়েটা। তাই ভবেশবাবুকে শেষ পর্যন্ত আবার ধরা দিতে হলো সংসারের মায়া-জালে। কোম্পানীর সঙ্গে সকল সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়ে আবার তিনি ফিরে এলেন দেশের মাটিতে। পৈত্রিক বাসভবনখানা নতুন ক'রে সংস্কার করা হলো। রাণীগঞ্জের কাছাকাছি পারুলিয়া গ্রামখানা পূর্বে ছিলো একটি বুনিয়াদী গ্রাম। বর্তমানে শহর হয়ে উঠেছে। ঘরে ঘরে বিজলীবাতি চালু হয়ে গেছে বহুদিন আগেই। ভবেশবাবু বাড়ীখানা মেরামত করিয়ে একবারে নতুন ক'রে নিলেন। সেই সঙ্গে ওয়্যারিং করানোও হলো। আধুনিক সাজসরঞ্জাম ও আসবাবপত্রও কিছু কিছু আমদানী করা হ'লো। প্রাক্তন ও বর্তমান রুচির অপূর্ব সমন্বয়ে বাড়ীখানা বেশ মনের মত ক'রে সাজিয়ে নিলেন ভবেশবাবু।

ধরতে গেলে সমগ্র পারুলিয়া গ্রামখানাই আজ প্রাচীন ও আধুনিকের সমষ্টি, সেকাল ও একালের অপূর্ব এক জীবন্ত সমন্বয়। ভোরবেলা এর একটা দিকে কুঞ্জবনের শাখায় শাখায় দোয়েল শ্যামা কোকিল ডাকে। অপর দিক থেকে ভেসে আসে ঘুম-ভাঙানো কলের বাঁশী, অদূরের ওই শিল্পনগরীর

কর্ণভেদী উচ্চকিত আহ্বান। অনাদিনাথ শিবের মন্দিরে বেজে ওঠে সন্ধ্যারতির কাঁসর ঘন্টা। নয়া বাজারের মোড় থেকে নতুন চালু সিনেমা হাউসের মাইক যন্ত্রে শুরু হয়ে যায়—'নিলামবালা ছ' আনা, লে লেও বাবু ছ' আনা—'। পারুলিয়ার সমাজ-জীবনের পটভূমিতে এ দুটোই আজ সমান সত্য। চিরন্তন সন্ধ্যারতির কাঁসর-ঘণ্টার সঙ্গে অধুনাতন 'নিলাম বালার' আজ আর কোন বিরোধ নাই, মিলেমিশে এক হয়ে গেছে।

ভবেশবাবু মায়াজালে বন্দী হয়ে পড়লেন! শুরু হলো জীবনের পরবর্তী অধ্যায়। বহুদিন পর পৈত্রিক ভিটেখানা আশ্রয় ক'রে পরম নিশ্চিন্তে শুরু করলেন দৈনন্দিন জীবনযাত্রা। বৈঠকখানায় দাবার আড্ডা জমে উঠতে খুব বেশী দেরি হলো না। গুড়গুড়ির নল মুখে দিয়ে আর একটিবার নিশ্চিন্তে চেপে বসলেন ভবেশবাবু।

অন্দরমহলে গৃহিণীর গৃহকর্ম্ম চলতে লাগল যথা নিয়মে। ভদ্রাসনের দরদালানে আলপনা এঁকে বারো মাসের তেরো পার্বণ আবার তিনি শুরু করলেন। দৌহিত্রী তন্দ্রা, সংক্ষেপে তনু, রঙিন ছিটের ফ্রক পরে পিঠের উপর বেণী দুলিয়ে অন্দর থেকে সদর পর্যন্ত চটুল ছন্দে হাওয়ার বুকে যেন দোল খেয়ে বেড়াতে লাগলো। দাদামশায় ও দিদিমার মাঝখানে, সংক্ষেপে দাদু ও দিদার মধ্যে, মধুর একটি সংযোজকের মত সব সময় সে নিবিড়ভাবে দু'হাত দিয়ে যেন ছুঁয়ে রইলো ওঁদের দুজনকে। লীলা-চঞ্চল এই বনবিহগী নীড়-ভ্রষ্ট পক্ষীশাবকের মত দমকা হাওয়ায় উড়ে এসে কখন যে এঁদের সারা মন জুড়ে বসেছে সে কথা আর মনেও হয় না। এই তন্দ্রাই এখন একমাত্র আকর্ষণ, শেষ জীবনের একমাত্র বন্ধন ভবেশ-দম্পতীর।

তনুর দিকে চেয়ে চেয়ে কত কথাই আজ মনে হয় ভবেশবাবুর। মনে পড়ে তার মায়ের কথা। এই মুখ, এই চোখ, এই লাবণ্য, ঠিক এরই মত সেও ছিলো অপরূপ সুন্দরী। মেয়েটার কথা মনে হলে বুকখানা যেন ভেঙ্গে যায় ভবেশবাবুর। চোখের সামনে চারিদিক যেন ঝাপসা হয়ে আসে। তনু এসে লুটিয়ে পড়ে ভবেশবাবুর কোলের উপর। একদৃষ্টে চেয়ে থাকে তাঁর মুখের দিকে, কোমল কচি কুহুকণ্ঠে ডাক দেয়,—দাদু!

বুকের মধ্যে তাকে জড়িয়ে ধরে সাড়া দিয়ে উঠেন ভবেশবাবু,—কি রে দিদি!

তনু একটু ভারি গলায় প্রশ্ন করে—মাঝে মাঝে তুমি এমনধারা গম্ভীর হয়ে যাও কেন দাদু। গুম হয়ে কি ভাবছো বল ত।

ভবেশবাবু তাড়াতাড়ি সামলে নেন নিজেকে। মুখে একটু হাসি টেনে হাল্‌কা সুরে বলে উঠেন,—কি ভাবছি শুনবি। ভাবছি তোর জন্যে এবার রাঙা টুকটুকে একটি বর আনতে হবে। কোথায় তাকে খুঁজে পাওয়া যাবে বল ত!

তনু ঘাড় নেড়ে বলে ওঠে,—না দাদু এ তোমার মিছে কথা। তুমি কি ভাবছো আমি জানি। তুমি ভাবছো আমার মায়ের কথা। মায়ের জন্যে আজো তোমার মন কেমন ক'রে, না দাদু?

বিহ্বল দৃষ্টি মেলে ক্ষিপ্রকণ্ঠে বলে উঠেন ভবেশবাবু,—ওরে না-না, তার কথা আর ভাববো না দিদি, এখন থেকে শুধু তোর কথাই আমরা ভাববো; তুই ত আমাদের আছিস।

নিবিড় ব্যথায় কণ্ঠস্বর যেন ভারী হয়ে উঠে ভবেশবাবুর। তন্দ্রাকে বুকের মধ্যে চেপে ধরে বলে ওঠেন,—তুই যেন আমাদের একা ফেলে পরের বাড়ী চলে যাস না দিদি, তুই এখান থেকে চলে গেলে আমরা থাকবো কি নিয়ে।

ত্রয়োদশী বালিকার মুখে চোখে ফুটে উঠে সীমাহীন বিস্ময়। তার কাছে এ যেন এক দুর্বোধ্য হেঁয়ালি। চোখ দু'টি ঈষৎ বিস্ফারিত ক'রে বলে ওঠে তনু,—এ তুমি কি বলছো দাদু, তোমাদের ছেড়ে আমি আবার যাব কোথায়! এখান থেকে আমাকে তাড়াবার মতলব বুঝি।

ভবেশবাবু জবাব দেন,—ওরে না-না—তাও কখনো হয়, আমরা কি তোকে তাড়াতে পারি। কিন্তু তোর বর এসে যেদিন তোকে গাঁটছড়ায় বেঁধে হিড় হিড় ক'রে টেনে নিয়ে চলে যাবে আমাদের চোখের উপর দিয়ে, সেদিন তাকে কেমন ক'রে ঠেকাব দিদি!

সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলো তনু,—না দাদু, ওসব তোমার বাজে কথা। এখান থেকে একটি পা-ও আমি নড়ছি না কোথাও, তা তোমরা যতই বলো।

ভবেশবাবু তনুর কথায় সায় দিয়ে বলে উঠলেন,—ঠিক বলেছিস দিদি, আমার মনের কথাটি একেবারে টেনে বলে দিয়েছিস্। এখান থেকে কিছুতেই তোর যাওয়া হবে না, যদি কারো গরজ থাকে সে নিজে আসবে এখানে। তার জন্য আমার অর্দ্ধেক রাজত্ব আর রাজকন্যা কবুল। কি বল্ দিদি, তবু কি তাকে ধরে রাখা যাবে না!

দাদুর এ হেঁয়ালির উত্তরে তনুর যে কি বলবার আছে সে খুঁজে পায় না। একটু বিস্মিত হয়ে বলে,—কি তুমি বলছো দাদু, আমি ত কিছু বুঝতে পারছি না।

ভবেশবাবু একটু হেসে বলেন,—পারবি রে দিদি—পারবি, সব বুঝতে পারবি। আর একটু বড় সড় হ, তোর ঘোড়ার ঘাস কাটবার জন্য লোক একটা আগে ধরে নিয়ে আসি, তার পর সব এক জায়গায় বসে বোঝাপড়া হবে এখন। তোদের আমি ফাঁকি দেব না তনু, আমার বলতে যা কিছু আছে, সব আমি তোদের যৌতুক দিয়ে দেব বিয়ের সময়। তাতেও যদি তোর বরের মন না ওঠে, আমার শেষ খুঁটি হিসাবে তুই ত তখন আছিস। ওই এক বোড়ের চালেই দাদুকে আমার মাত ক'রে ছেড়ে দেব না! তোকে ছেড়ে সে যাবে কোথায়।

তনু এবার দাদুর দিকে চেয়ে খিল খিল ক'রে হেসে উঠলো, বললো,—কি যে তুমি আবোল-তাবোল বকছো দাদু, না আছে তার মাথা,—আর না আছে মুণ্ডু।

ভবেশবাবু বললেন,—আবোল-তাবোল নয় রে তনু, এ একেবারে পাকা কথা, দেখে নিস তুই।

মুখোপাধ্যায় গৃহিণী অন্তরালে পান সাজছিলেন। দাদু ও নাতনীর আলাপ-আলোচনার ঢেউ তাঁর মনের মধ্যেও এসে ঘা দিয়ে গেল কয়েকবার! কিন্তু এতে যেন আর মন ভরতে চায় না, আবার সেই আশার কুহক। কর্ত্তামশায়ের পানের ডিবেটা এগিয়ে দিতে এসে বলে উঠলেন শশীমুখী দেবী,—তনুকে নিয়ে এখন থেকে এই আকাশ-কুসুম স্বপ্ন তুমি দেখো না, শেষটায় হয়ত কষ্ট পাবে। এইভাবে কেউ কখনো জোর ক'রে কাউকে ধরে রাখতে পেরেছে।

ভবেশবাবু একটু বিস্মিত হয়ে বললেন,—কি তুমি বলছো গিন্নী, দরকার হলে তাও পারতে হবে। তন্নুকে আমরা হাতছাড়া করতে পারি না, ও চলে গেলে আমরা থাকবো কি নিয়ে। না-না—সে হয় না, আমরা ওকে জোর ক'রেই ধরে রাখবো।

আঁচল দিয়ে একবার চোখ মুছলেন শশীমুখী দেবী। আর্দ্রস্বরে বললেন,—নিজের মেয়েকেই বড় জোর ক'রে ধ'রে রাখতে পেরেছিলে, তাই পরের মেয়ে নিয়ে এতখানি আজ মাতামাতি করছো।

কথাটা একটু বিঁধলো ভবেশবাবুর বুকে। তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন,—তার মাকে একদিন ধরে রাখতে পারি নি বলে তন্নুকেও যে আজ ধরে রাখতে পারবো না, এমন কোন কথা আছে কি। এমন একটা শুভ সংকল্পে তুমি বাধা দিয়ো না গিন্নী, এমন ক'রে চোখের জল তুমি ফেলো না। তন্নু কি আমাদের ছেড়ে যেতে পারে। কিরে তন্নু, শিকলি কেটে একদিন সরে পড়বি না ত!

বিশেষ কিছু না বুঝেও একটা কিছু বলবার যেন চেষ্টা করে তন্নু। একটুখানি রাগ ক'রে বলে,—এবার কিন্তু তোমার সঙ্গে আড়ি ক'রে দেব দাদু, কে তোমার পাকা চুল তুলে দেয় আমি দেখবো।

হো হো ক'রে হেসে উঠলেন ভবেশবাবু, বললেন,— একেবারে আড়ি। তা বেশ, আমার পাকাচুলগুলো না হয় তোর দিদিমাকে দিয়েই তুলিয়ে নেব। কিন্তু দোহাই দিদিমণি, আড়ি-আবদার যা করতে হয় এই বেলা এই বুড়োর সঙ্গেই ক'রে নে যত খুশি, যোদ্ধা তোর বর এলে আর আড়িটাড়ি চলবে না। তাহলে কিন্তু আমি ভয়ানক রাগ করবো।

তন্নু খপ্ ক'রে ভবেশবাবুর নাকের ডগা থেকে চশমাটা টেনে নিয়ে বললে,—এবার কিন্তু তোমার চশমা ভেঙে দেব দাদু! মারব এমন এক আছাড়—

তাড়াতাড়ি তন্নুর ডান হাতটা চেপে ধরে ভবেশবাবু বলে উঠলেন,—ওরে না—না, চশমা ভেঙে দিলে একেবারে কানা হয়ে যাব যে। বলি ও গিন্নী, তোমার নাতিনীটিকে একটু সামলাও না।

ভবেশবাবু হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে চেয়ে দেখেন গৃহিনী শশীমুখী দেবী নিথর হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন এক পাশে। চোখে তাঁর আঁচল চাপা। ভবেশবাবু সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা ক'রে বললেন,—একি, তুমি কাঁদছো! না—না—তার কথা আর ভাবতে যেয়ো না, একেবারে ভুলে যাও! মা আমার স্বর্গে গেছে, তাকে শান্তি পেতে দাও। তোমার ওই চোখের জলে মায়ের আমার অকল্যাণ হবে যে।

ভবেশবাবু কণ্ঠস্বর ভারী হয়ে উঠলো। চোখের কোণে টলটল করছে অবরুদ্ধ অশ্রু।

দু'হাত দিয়ে দাদুমণিকে জড়িয়ে ধরে তনু হঠাৎ করুণস্বরে একটা ডাক দিলে,—দাদু!

ব্যোমকেশ দীর্ঘদিন দেশান্তরী। কখন যে কোথায় যায়, আর কখন যে কোথায় থাকে, সে খবরটুকু একমাত্র সে-ই জানে। ভবেশবাবু ও শশীমুখী দেবী তাকে ধরে রাখবার জন্য গোড়ার দিকে চেষ্টা করেছিলেন যথেষ্ট। আশা করেছিলেন তাঁদের সন্তানের অভাব পূর্ণ করবে ব্যোমকেশ। কিন্তু সে দায়িত্ব সে কোনমতেই স্বীকার করতে চাইলে না। স্ত্রীবিয়োগের পর ছিটকে আবার বেরিয়ে পডলো ভবেশবাবুর সংসার থেকে। বছর তিনেক তার আর কোন খোঁজখবরই পাওয়া গেল না। হঠাৎ আবার ফিরলো একদিন মেয়ের জন্য কতকগুলো ফ্রক ইজের জুতো মোজা আর খেলনাপাতি হাতে ঝুলিয়ে। শশীমুখী দেবী তিন বছরের নাতনীকে বুকের ওপর জড়িয়ে নিয়ে দাঁড়ালেন গিয়ে ব্যোমকেশের সামনে। একটু অনুযোগের স্বরে বললেন,—এতদিন কোথায় ছিলে বাবা! গিয়ে অবধি একটা সংবাদ পর্যন্ত দিলে না, আমাদের কি এমনি ক'রেই ভুলে যেতে হয়!

ব্যোমকেশ পায়ের ধূলো নিয়ে প্রণাম করলে শশীমুখী দেবীকে। বললে,—আমার জন্যে আপনারা ভাববেন না, বাইরে গিয়ে আমি একরকম ভালই আছি।

শশীমুখী দেবীকে মৌখিক একটু সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করলে ব্যোমকেশ। সংক্ষেপে জানালে তার বর্তমান ঠাঁই ঠিকানার কথা। এখান থেকে বেরিয়ে ঘুরতে ঘুরতে গিয়ে পড়ে সে বেনারসে। সেখান থেকে এক তান্ত্রিক সাধুর সঙ্গে আজমীঢ় পার হয়ে ওঠে গিয়ে পুষ্করতীর্থে। কিন্তু গেরুয়া পরে আর সাধুবাবার তল্পি বয়ে চেলাগিরি করা বেশিদিন তার পোষালো না! ভারতের সর্বতীর্থ পরিক্রমার পরিকল্পনা পরিত্যাগ ক'রে আজমীঢ়েই সে রয়ে গেল কিছুদিনের জন্য। সেখানকার প্রবাসী বাঙ্গালীদের একান্ত অনুরোধে গানের একটা স্কুল খুলে সেখানেই বসে পড়লো ব্যোমকেশ। গৈরিক বসন কেটে খানদু'য়েক বিছানার চাদর, আর গোটাকয়েক জানলার পর্দা তৈরি ক'রে নিলে। আছে এখনো সেখানেই ঘাঁটি আগলে। এইভাবে সে একটা কিছুর মধ্যে উদ্‌ভ্রান্ত মনটাকে তার ডুবিয়ে রাখবার চেষ্টা যদি না করতো, ব্যোমকেশ হয়ত পাগল হয়ে যেতো। তার চেয়ে এ ভালই হয়েছে। সঙ্গীতটার মধ্যে দিয়ে সাময়িক একটা মানসিক সান্ত্বনা শেষ পর্যন্ত খুঁজে নিয়েছে ব্যোমকেশ। সুতরাং সে জন্য আর দুঃখটা কিসের। ভালই আছে সে আজমীঢ় গিয়ে। জায়গাটাও চমৎকার, চারিদিক বেশ খোলামেলা। মরুভূমির দেশ কিনা।

কয়েকটা দিন থেকে গেল ব্যোমকেশ। কচি মেয়েটাকে কোলে পিঠে নিয়ে বেশ একটু আদর যত্ন করলে। তার পর আবার হঠাৎ একদিন বেরিয়ে পড়লো বাড়ী থেকে। ব্যোমকেশের বিবাগী মন বহু আগেই ঘরছাড়া হয়ে গেছে। পলকা সুতোর বাঁধন দিয়ে এ অবস্থায় ওকে আটকে রাখা শক্ত।

গিয়ে থেকে আর খোঁজখবর নাই ব্যোমকেশের। মাসখানেক অপেক্ষা ক'রে শশীমুখী দেবী একখানা চিঠি লিখলেন আজমীঢ়ের ঠিকানায়। জবাব পাওয়া গেল না। তাঁর সেই চিঠিখানাই জবাব হয়ে ফিরে এলো হপ্তা-দুয়েক পর, ডাকপিয়নের মন্তব্যসমেত—"চিঠির মালিক নিখোঁজ। সঙ্গীত-ভবনে তালা ঝুলছে।"

আজমীঢ়ের তালা খুলবে হয়ত আবার আজমীঢ়ের লোক। আসাম মুলুক থেকে কে আর অত দেখতে যাচ্ছে। বাবাজীবন যে ডিব্রুগড়ে।

খবর পাওয়া গেল বছর পাঁচেক পর! ব্যোমকেশ চিঠি লিখেছে। সেখানকার একটা চা বাগানে চাকরি নিয়েছে ব্যোমকেশ, মাইনেপত্র ভালই পায়, থাকে সেখানে কোম্পানীর একটা মেসে।

তার পর থেকে আর কোন পাত্তা নাই। ওই একখানি মাত্র চিঠি বহু-কষ্টে পথ চিনে চিনে কোন রকমে এসে পড়েছিলো। প্রতিপদের চাঁদের মত দূর থেকে একটু উঁকি মেরেই সঙ্গে সঙ্গে আবার মিলিয়ে গেছে ব্যোমকেশ। দেশে ফিরলো সে ভবেশবাবু রিটায়ার করার পর। গৌরাংডি কলিয়ারির ফেরত উঠলো এসে একদিন পারুলিয়ার বাড়ীতে। ফিটফাট পোশাক পরিচ্ছদ, চোখে সোনার চশমা, হাতে একটা বেতের লাঠি। কুলির মাথায় বিরাট একটা ফাইবারের স্যুটকেশ চাপিয়ে বাড়ী ঢুকলো এসে। বাড়ীর মধ্যে বেশ একটা সাড়া পড়লো, উৎসুক হয়ে উঠলো বাড়ীর ঝি-চাকররা পর্যন্ত। বহুদিন পর জামাইবাবু এলেন কিনা।

ব্যোমকেশ অবাক হয়ে গেল। শশীমুখী দেবীর সামনের দাঁত দু'টো পড়ে গেল কখন! ভবেশবাবুর মাথাটা যেন কাশ ফুলের মত একেবারে সাদা হয়ে উঠেছে। যেন সাদা রঙের কলপ মাখানো। আর সবচেয়ে তাকে অবাক ক'রে দিয়েছে তনু, ব্যোমকেশের সেই এইটুখানি বাচ্ছা। তনু যে আজ কিশোরী হয়ে উঠেছে। এর মধ্যে সে এতখানি বড়-সড় হয়ে উঠলো কখন।

সময়ের ব্যবধানটা বেমালুম একেবারে ভুলে গেছে ব্যোমকেশ। নাকের ডগা থেকে চালশের চশমাখানা খুলে চারিদিক একবার ভাল ক'রে তাকালেই হয়ত ধরে ফেলতে পারতো। তার নিজের বয়সের জমাখরচটা দেয় কে।

বিকেলবেলা চা-পর্ব শেষ ক'রে তনুকে একটা ডাক দিলে ব্যোমকেশ। তার সঙ্গে একটা বোঝাপড়া দরকার। তনু কোন সাড়াই দিলে না। আশে-পাশে কোথায় লুকিয়ে বেড়াচ্ছে। কেমন যেন একটা কৌতুককর লজ্জা তনুকে হঠাৎ পেয়ে বসেছে। এ পর্যন্ত ব্যোমকেশের সে পাশ মাড়ায় নি, দূর থেকে শুধু লুকোচরি খেলছে। চিনতেই পারলে না সে ব্যোমকেশকে, কি আশ্চর্য!

কেমন ক'রে চিনবে। চেনবার কি কোন সঙ্গত কারণ আছে! কাবুলী-ওয়ালার মিনি জেলফেরৎ রহমৎ শেখকে একদিন চিনতে পারে নি। এতদিন পর তনু যদি আসাম-ফেরত ব্যোমকেশকে চিনতে একটু ভুল করে, সে বেচারীকে দোষ দেওয়া যায় কি। শশীমুখী দেবী নাতনীকে জোর ক'রে টেনে এনে বসিয়ে দিয়ে গেলেন ব্যোমকেশের সামনে। তনু যেন একটু লজ্জা পেয়ে গেল, কেমন যেন বাধো বাধো ঠেকছে। ব্যোমকেশের দিকে চেয়ে শুধু মুখ টিপে হাসছে। তনুকে দেখেই বলে উঠলো ব্যোমকেশ,—কি রে পাগলী, আমাকে চিনতে পারছিস?

তনু একটু ইতস্তত করছে। মুখখানা একটু নিচু ক'রে জবাব দিলে,—হুঁ।

ব্যোমকেশ আবার প্রশ্ন করলে,—কে আমি বল্ দেখি?

তনু এবার খিলখিল ক'রে হেসে উঠে এক লহমায় বলে উঠলো,—বাবা।

ব্যোমকেশও হেসে উঠলো? বললে,—এই ত—এই ত এবার ঠিক চিনেছিস। তবে যে এতক্ষণ পালিয়ে বেড়াচ্ছিলি!

তনুকে হঠাৎ কোলের উপর টেনে নিলে ব্যোমকেশ। দু'হাত দিয়ে বুকের উপর চেপে ধরলে? তার পর তার গালে মুখে চুমার উপর চুমা। তনু যেন একটু বিব্রত হয়ে উঠলো, এক সঙ্গে এতগুলো চুমা কি কেউ খায়।

শশীমুখী দেবী দূর থেকে ভবেশবাবুর দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রে বলে উঠলেন,—দেখ—দেখ—বাপবেটীর কাণ্ডটা একবার দেখ।

তনু হঠাৎ চেয়ে দেখে ব্যোমকেশের চোখ দু'টো ছল ছল করছে। জল গড়িয়ে পড়বে নাকি! অবাক হয়ে গেল তনু। একটুখানি অনুযোগ ক'রে বললে,—একি, তুমি কাঁদছো! না—না - কাঁদলে কিন্তু আমি ভয়ানক রাগ করবো। তোমার মত কারো বাবা ত কই কাঁদে না।

ব্যোমকেশ রুমাল দিয়ে চোখ দুটো তাড়াতাড়ি মুছে ফেললে। জোর ক'রে একটু হাসি টেনে বললে,—তোর জন্যে কত কি সব এনেছি, দেখবি? কত ভাল ভাল খেলনা, সালোয়ার পাঞ্জাবী, জুতো, মোজা, আরও কত কি, এই দেখ না।

ফাইবারের স্যুটকেশটা এনে তনুর সামনে খুলে দিলে ব্যোমকেশ। স্যুটকেশের মধ্যে নানান জিনিস ঠাসা। তনুর মুখখানা খুশিতে ভরে উঠলো, বললে,—এগুলো সব আমার ?

ব্যোমকেশ বললে,—সব—সব তোর।

—আর এই ঝকঝকে স্যুটকেশটা ?

—এটাও তোর। স্যুটকেশ না হলে এগুলো থাকবে কোথায়।

তনু এবার চঞ্চলা হরিণীর মত ছুটতে ছুটতে গিয়ে শশীমুখী দেবীকে ধরে নিয়ে এলো ব্যোমকেশের সামনে। বললে, দেখবে এসো—আমার কতবড় স্যুটকেশ, আর কি সুন্দর ডলি পুতুল, দেখবে এসো।

স্যুটকেশ থেকে একটি একটি ক'রে জিনিসগুলো নামিয়ে শশীমুখী দেবীকে দেখিয়ে দিলে তনু। নিজের হাতেই আবার গুছিয়ে ফেললে তেমনি ক'রে। দু' হাত দিয়ে স্যুটকেশটা টানতে টানতে ঘরের মধ্যে নিয়ে গিয়ে একটা টুলের উপর সাজিয়ে দিলে, তার বইয়ের আলমারির পাশে। শশীমুখী দেবী মৃদু একটু হেসে বললেন,—বাপকে দেখে খুশি যেন আর ধরছে না।

ব্যোমকেশ শশীমুখী দেবীকে লক্ষ্য করে বললে,—মেয়েটা ত বেশ সুন্দর হয়েছে দেখতে, ঠিক যেন মোমের পুতুল। ওর বয়স কত হলো মা, বছর বারো হবে ?

শশীমুখী দেবী জবাব দিলেন,—চৌদ্দয় পড়েছে।

ব্যোমকেশ একটু আশ্চর্য হয়ে গেল। বললে,—চৌদ্দ, তনুর বয়স চৌদ্দ !

নিজের মনেই কি যেন একটু ভেবে নিয়ে পুনরায় বলে উঠলো ব্যোমকেশ,—ঠিক—ঠিক—চৌদ্দই হবে। একথা আমি এতদিন খেয়াল করি নি মোটেই।

শশীমুখী দেবী বললেন,—বড়জোর আর দু' এক বছর। তার পর যে মেয়ের বিয়ের ব্যবস্থা করতে হবে বাবা !

তনুর বিয়ে, সে আবার কি রকমটা হলো ! এ যে একটা নতুন কথা। অবাক হয়ে ভাবতে থাকে ব্যোমকেশ। কিন্তু অবাক হবার কিছু নাই এতে, কথাটা খুব খাটি কথা; তনু যে এবার বড় হয়ে উঠেছে। শশীমুখী

দেবীকে লক্ষ্য ক'রে পুনরায় বলে উঠলো ব্যোমকেশ,—তাহলে ত তনুর জন্যে একটা বর খুঁজতে হয় মা, আছে আপনার তেমন কেউ জানা শোনা!

শশীমুখী দেবী ব্যোমকেশকে একটু চাপ দিয়ে বললেন,—সে কাজটা তুমি এসে করলেই ত বেশ ভাল হয়, বাবা! সেইজন্যই ত বলছিলাম, চাকরিটা এবার ছেড়ে দিয়ে এলে কেমন হয়।

ব্যোমকেশের এইখানে আপত্তি। তাড়াতাড়ি বলে উঠলো—চাকরি ছেড়ে লাভটা কি বলুন? অবশ্য ডিব্রুগড়ে আর আমি বেশী দিন থাকবো না। চেরাপুঞ্জীর কাছাকাছি একটা কলিয়ারিতে ক্যাশিয়ার হয়ে চলে যাচ্ছি খুব শিগ্‌গীর। এমন একটা চান্স হাতে পেয়ে ছেড়ে দিয়ে আসা কোন কাজের কথা নয়। তার চেয়ে বরং মাঝে আমাকে আর একটিবার স্মরণ করিয়ে দেবেন। তনুর জন্যে বর আমি ঠিক ক'রে ফেলবো। সে জন্যে আপনারা মোটেই ভাববেন না।

শশীমুখীদেবী নিরুত্তর হ'লেন। এর বেশি বলবার তাঁর কিছু নাই।

ব্যোমকেশকে কিন্তু এখান থেকে এবার পালাতে হবে। নেশার-ফেউ আজো তার পিছু ছাড়ে নি। অভ্যাসটা প্রায় ছেড়ে ফেলেছিলো ব্যোমকেশ। কিন্তু এক অঘোরপন্থী সাধুবাবার পাল্লায় পড়ে ওটা আবার চেগে উঠেছে। দয়া ক'রে তাঁর শ্রী-পাত্রের সরিক ক'রে নিয়েছিলেন তিনি ব্যোমকেশকে। অশেষ দয়া তাঁর। ব্যোমকেশের দুর্ভাগ্য, সাধন ভজন শেষ পর্যন্ত কিছু হলো না, মাঝখান থেকে নেশা-ভাঙের বাতিকটা গেল চড়ে। বেশিদিন এখানে থাকলে ওই নিয়ে হয়ত আবার একটা কানাকানি উঠতে পারে। তার চেয়ে এবার সরে পড়াই ভাল।

দিন চার পাঁচ পর শ্বশুর বাড়ীর মায়া কাটিয়ে তাড়াতাড়ি আবার বেরিয়ে পড়লো ব্যোমকেশ। ওদিকে আবার চেরাপুঞ্জীর চাকরীটা না হাত ছাড়া হয়ে যায়।

বারো

ভবেশবাবু বাইরের ঘরে ফরাশ পেতে নতুন ক'রে আবার চেপে বসলেন। কিন্তু দাবার আড্ডা বেশ জমাতে পারলেন না। উপযুক্ত খেলোয়াড়ের অভাব। আজকালকার যুগে সেই মৌতাতী মেজাজ কোথায়। কোথায় সে অবিচল ধৈর্য, কোথায় বা সে ক্ষুরধার বুদ্ধি। সাম্প্রতিক কালের খেলোয়াড়দের মধ্যে ও গুণগুলি দুর্লভ। ভাসা ভাসা মন আর অন্তঃসারশূন্য মগজ নিয়ে কি দাবা খেলা চলে। চাল দিয়ে সুখ কোথায়। হ্যাঁ—খেলোয়াড়ের মত খেলোয়াড় একটা ছিলেন বটে পাশের বাড়ীর মুকুন্দ রায়মশায়, ভবেশবাবুর আবাল্য সুহৃদ। বাইরের থেকে কোন নামকরা খেলোয়াড় এলে মুকুন্দবাবুর ডাক পড়তো পার্শ্ববর্তী দশখানা গ্রাম থেকে। যেতে হতো মুকুন্দবাবুকে দ্বৈরথ সমরে এগিয়ে। সে গ্রামের মুখরক্ষা না ক'রে তিনি বাড়ী ফিরতেন না। একমাত্র তাঁর সঙ্গেই ভবেশবাবুর জমতো ভাল। মুকুন্দবাবু মারা যাওয়ার পর কর্মক্ষেত্রে এসে জুটে গেল হঠাৎ পিট-সাহেব। তাঁর সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হওয়ার পর থেকেই ভবেশবাবুর খেলাধুলো প্রায় বন্ধ হতে বসেছে। আজকাল তেমন উপযুক্ত খেলোয়াড় কই।

কথাটা অবশ্য একেবারে মিথ্যে নয়। দাবা খেলার চর্চাটা বর্তমানে প্রায় উঠেই যেতে বসেছে মানুষের সে মজলিসী প্রাণ আজকাল দুর্লভ! তবু একটু খোঁজ খবর করলে দুটো একটা বনেদী খেলোয়াড় যে একেবারেই পাওয়া যায় না, একথাও সত্য নয়। বয়স্কদের মধ্যে আছে এখনও দু' চারটে এখান ওখান ছড়িয়ে, একটু খুঁজে নিতে পারলেই হয়। খোঁজ করতে করতে শেষ পর্যন্ত জুটেও গেলেন একজন। ভবেশবাবুর এ অভাব-টুকু পূর্ণ করলেন পাশের গ্রামের নিধুপণ্ডিত মশায়, গুরুট্রেণিং স্কুলের প্রাক্তন এক শিক্ষক। সেকালের নর্মাল ত্রৈবার্ষিক পাশ। পাণ্ডিত্যের অভিমানটুকু কিছু কিছু আছে এখনও, সেইসঙ্গে দাবা খেলার নেশাটাও।

অবসর পেলেই নিধু পণ্ডিতমশায় ভিড়ে যান এসে কর্তাবাবুর বৈঠকখানায়। ছক পেতে বসে পড়েন দাবাবড়ে নিয়ে। গড়গড়া বনাম খেলো হুঁকো চলতে থাকে দাবা যুদ্ধ, নিরিবিলি নিশ্চিন্তে বসে। শুরু হয়ে যায় লা-বড়ে-গজ, কিস্তি এবং পাল্টা কিস্তির ঘোরপ্যাচ। মাঝে মাঝে পাশের বাড়ী থেকে জোটে এসে নিকুঞ্জ রক্ষিত, রায়বাবুদের বহুকালের গৃহভৃত্য। চুপটি ক'রে বসে থাকে একপাশে। মাঝে মাঝে কর্তাবাবুর কলকেটায় ফুঁ দিয়ে দেয়, পানের ডিবেটা এগিয়ে দেয় হাতের কাছে। দৃষ্টি কিন্তু স্থির থাকে তার দাবাবড়ের ছকের উপর। নিজের মনে উস্‌খুস্ করতে থাকে নিকুঞ্জ, হঠাৎ এক সময় বিরক্ত হয়ে উঠে পড়ে। নিকুঞ্জ পণ্ডিত বলে উঠেন—উঠলি যে নিকুঞ্জ, বাজিটা তাই শেষ পর্যন্ত দেখে যা।

নিকুঞ্জ সসঙ্কোচে বলে ওঠে—আজ্ঞে দেখবার আর কি আছে কত্তা, আপনি ত হয়ে গেলেন, বড়জোর আর চাল দুই তিন।

বলতে বলতে বেরিয়ে যায় নিকুঞ্জ। কথাটা কিন্তু ফলে যায় তার সঙ্গে সঙ্গেই, কর্তাবাবু পণ্ডিতকে তিনটে চালেই মাত ক'রে দেন। নিধু পণ্ডিত অবাক হয়ে যান। কর্তাবাবু বলে উঠেন,—মুকুন্দ রায়ের মাহাত্ম্যটা দেখলে পণ্ডিত। তাঁরই আমলের কর্মচারী এই নিকুঞ্জ। মুকুন্দবাবুর তামাক সাজতো, আর চুপটি ক'রে একপাশে বসে থাকতো তাঁর দাবার আড্ডায়। না পড়েই ও হঠাৎ পণ্ডিত, মুকুন্দবাবুর ধাত কিছুটা পেয়ে গেছে আপনা থেকেই। বোঝ তাহলে সেই আসল বস্তুটি কি ছিলেন।

ভবেশবাবু সেদিন বাজি দুই তিন খেলার পর উঠে গেলেন ভিতর বাড়ীতে। নিধু পণ্ডিত নিকুঞ্জকে টেনে বসালেন, নতুন ক'রে ছক ঘুঁটি পেতে। নিকুঞ্জ কিছুতেই বসতে চায় না, সসঙ্কোচে বলে ওঠে,—আজ্ঞে সে কি কথা, দাবাখেলার আমরা কি বুঝব বলুন। রায়কত্তাবাবুর পুণ্যির জোরে যদি বা একটু শিখেছিলাম, কোন্ কালে সে ভুলে মেরে গেছে। আপনার সামনে কি আমার বসতে কুলোয়।

নিকুঞ্জর কোন আপত্তি শুনতে চাইলেন না নিধু পণ্ডিত, জোর করে তাকে বসিয়ে দিলেন টেনে। বাধ্য হয়ে বাজি দুই তিন খেলতেই হলো নিকুঞ্জকে।

পণ্ডিত কিন্তু পাত্তা পেলেন না, উপর্যুপরি তিনটি বাজি তাঁকে মাত ক'রে ছেড়ে দিলে নিকুঞ্জ। গুণগ্রাহী পণ্ডিত মশায় তারিফ করে বলে উঠলেন,—বলিহারি যাই বলিহারি, খেলা একহাত দেখালি বটে নিকুঞ্জ। তোর হাতে যে দাবার ঘুঁটি ভেল্‌কি খেলে রে, এ খবরটা ত জানা ছিলো না। আর একদিন কিন্তু বসতে হবে নিকুঞ্জ, তোর সঙ্গে দাবা খেলে আজ আশ মিটলো না।

নিকুঞ্জ আফসোস ক'রে বললে,—সে ফুরসৎ কি আছে কত্তা, রায়বাড়ীর যত ঝামেলা এই নিকুঞ্জর উপর। একদণ্ড কি সরবার কোথাও উপায় আছে। আমাদের খোকাবাবু খোকা হয়েই রয়ে গেলেন আজ পর্যন্ত। শুনতেই শুধু এম এ পাশ, এক গেলাস জল গড়িয়ে খাবার মুরোদ নাই। এই নিকুঞ্জ রক্ষিত না থাকলে কি যে তিনি করতেন তা তিনিই জানেন।

ভবেশবাবুর দৌহিত্রী তন্দ্রা এসে ঢুকলো হঠাৎ বৈঠকখানা ঘরে। নিকুঞ্জকে লক্ষ্য ক'রে বললে—স্বপনদা যে তোমার খোঁজ করছেন নিকুঞ্জদা, কোথায় ছিলে এতক্ষণ।

নিধু পণ্ডিতকে লক্ষ্য ক'রে সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলো নিকুঞ্জ,—দেখলেন ত মজাটা, এই একটুখানি বেরিয়ে এসেছি, আর তার সঙ্গে সঙ্গে খোঁজ খোঁজ রব পড়ে গেল। যাই আবার দেখি গিয়ে চায়ের পেয়ালায় চিনি কম হলো, না আলমারির চাবি হারিয়ে বসে আছেন—দেখি একটু এগিয়ে।

বলতে বলতেই ত্বরিত পদে বেরিয়ে গেল নিকুঞ্জ।

বাড়ী গিয়ে দেখে ঝি আর বামুন ঠাকুরের মধ্যে তুমুল বাকবিতণ্ডা চলছে। ব্যাপারটা অবশ্য এমন কিছু নয়, তর্ক চলছে মশলা পেষাই নিয়ে। প্রত্যহ দু'বেলা মশলা পিষতে রাজি নয় ঝি, এটা নাকি বামুন ঠাকুরের ডিউটি। ঠাকুর কিন্তু স্বীকার করে না সে কথা, ঝিকে দিয়েই ও কাজটুকু সারিয়ে নিতে চায়। নিকুঞ্জ এসে সামনে দাঁড়াতেই মীমাংসার ভার পড়লো তার উপর। ভেবে চিন্তে রায় একটা দিতেই হলো নিকুঞ্জকে, কথা হলো একবেলা মশলা পিষবে ঝি, আর একবেলা নিজের হাতে পিষে নেবে বামুন ঠাকুর। ব্যস্, হয়ে গেল ফয়সালা। উভয় পক্ষকে এই সিদ্ধান্তই মেনে নিতে হলো, কারণ তারা জানে এর আর কোন আপিল নাই, এ সব বিষয়ে নিকুঞ্জই হলো এবাড়ীর চূড়ান্ত হাইকোর্ট।

উপর তলায় পড়ার ঘরে বসে স্বপন বুঝি একটা কবিতা লিখছিলো নিকুঞ্জকে দেখেই মুখ তুলে বললে,—ঝামেলা ওদের মিটলো, নিকুঞ্জদা !

নিকুঞ্জ একটু ক্ষুব্ধ ভাবে জবাব দিলে,—তাত না হয় মিটলো, কিন্তু এমনি ক'রে কদিন আর চলবে। এবার একটা বে-থা করবি. না বাড়ীর মধ্যে চব্বিশ ঘণ্টা ভূতের কেত্তন চলতেই থাকবে। ঘর সংসার তোর সামলায় কে বল ত।

সেই পুরাতন প্রশ্ন। স্বপন মাঝে মাঝে ভুলে যায়, কিন্তু ভুলতে পারে না নিকুঞ্জ। এ বিষয়ে স্বপনের চেয়ে সে ঢের বেশি সজাগ।

প্রশ্নটা চাপা দেবার চেষ্টা ক'রে বলে ওঠে স্বপন,—বিয়ে করতে আমি প্রস্তুত নিকুঞ্জদা. কিন্তু উপযুক্ত পাত্রী পাচ্ছো কোথায়।

নিকুঞ্জ একটু চটলো বুঝি মনে মনে, বললে,—এও কি একটা কথা হলো, খোকা ! স্বনামধন্যি বুড়োকত্তার নাতি, প্রহ্লাদ রায় কত্তাবাবুর মত ডাক-সাইটে উকিলের ছেলে, চার চারটে পাশ দিয়ে যে পায়ের উপর পা দিয়ে গ্যাঁট হয়ে বসে আছে, তার কিনা একটা বিয়ে করতে মেয়ে জুটছে না ! এত বড় একটা ভাঁওতার কথা আর যাকে শোনাতে হয় শোনাস, নিকুঞ্জ রক্ষিত একথা বিশ্বাস করে না।

নিকুঞ্জ একটু তেতেছে। মাঝে মাঝে এই রকমই তেতে যায় নিকুঞ্জ, আবার তাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে ঠাণ্ডা ক'রে নিতে হয়।

বুড়োকত্তা মুকুন্দ রায়ের আমলের লোক এই নিকুঞ্জ। তিনি গত হওয়ার বছর তিনেকের মধ্যেই দিন কয়েকের ব্যবধানে স্বপনের বাপ মা দুই-ই মারা গেলেন। সংসারের হাল ধরলেন এসে পিসীমা ঠাকরুণ। কিন্তু তাঁর বরাতেও রায়বাড়ীর অন্নজল খুব বেশীদিন সইলো না, তিনিও একদিন চোখ বুজলেন হঠাৎ। ঝক্কাট বাড়লো নিকুঞ্জর, কোলে পিঠে ক'রে মানুষ করতে হলো ছেলেটাকে। এবাড়ীতে নিকুঞ্জ তাই তখন থেকেই এদেরই একজন হয়ে উঠেছে। সে আমলের বুড়োকত্তার চাকর এ আমলের ঝি-চাকরদের মনিববাবুরও উপরে। স্বপন তাকে সমীহ ক'রে চলে। সেই সঙ্গে একটু ভয় না করলেও চলে না, মাঝে মাঝে ওই তেতে যাওয়ার অভ্যাসটা আছে কিনা নিকুঞ্জর।

স্বপনের বিয়ের প্রসঙ্গ নিয়ে কথাটা যখন তুলেই ফেললে নিকুঞ্জ, এর একটা সদুত্তর না দিয়ে উপায় নাই স্বপনের। নিকুঞ্জকে তাই ভরসা দিয়ে বললে,—সেজন্যে তুমি কিছুমাত্র ভেবো না, নিকুঞ্জদা! কলকাতার এক কন্যাদায়গ্রস্ত ভদ্রলোকের সঙ্গে কথাবার্তা চলেছে, খালি ঠিকুজিটা এবার মিল হলেই হয়।

নিকুঞ্জ কিন্তু বিশ্বাস করে না একথা। এত সহজে খোকাবাবুর এতখানি সুবুদ্ধি কি হবে! নিকুঞ্জ একটু নির্লিপ্তভাবে বললে,—তা বেশ ঠিকুজির গোনাগুনিটা চুকে যাক। মিল হয়ত ভালই, আর তা না হলে আমি কিন্তু এবার পথ দেখবো খোকা। আমার হিসেবটা বরং এক সময় দেখে রাখিস।

সকৌতুকে বলে ওঠে স্বপন,—হিসেব, তুমি আবার হিসেব নিয়ে যাবে কোথায়, নিকুঞ্জদা!

—কেন তিনকুলে কেউ নাই বলে কি এইখানেই আমাকে চিরটাকাল পড়ে থাকতে হবে! তিত্থিধম্মো করতে হবে না!

সে অবশ্য একটা কথা বটে। নিকুঞ্জর কথায় সায় দিয়ে বললে স্বপন,—সে ব্যবস্থা আমি ক'রে দেব, নিকুঞ্জদা! আগে আর একটু বুড়ো-সুড়ো হও তার পর না তিত্থিধম্মো।

নিকুঞ্জ কোন সান্ত্বনাই খুঁজে পেলে না, বললে,—মাসছয়েক আরও দেখবো আমি, তার পর হয়ত হিসেবপত্র মিটিয়ে নিয়ে চলেই আমাকে যেতে হবে এখান থেকে! এসব দিগ্‌দারি আর আমি সইতে পারবো না।

চকিতে একটা চেতাবনি দিয়ে স্বপনের সামনে থেকে বেরিয়ে গেল নিকুঞ্জ। যাক, মাস ছয়েকের তবু একটা নোটিশ পাওয়া গেল, কিছুদিন এখন নিশ্চিন্ত। কিন্তু সব চেয়ে হাসি পায় স্বপনের নিকুঞ্জ যখন তার দেনা-পাওনার হিসাব চেয়ে বসে। কত যে তার পাওনা, আর কি তার উসুল বাকি, পারতপক্ষে তার মোটামুটি হিসাব কষতে হলে তিন পুরুষের খতিয়ান নিয়ে বসতে হয়। স্বপনের পক্ষে সেটা অসম্ভব। আর খতেন খাতা খুলে বসলেই বা কি, রায়বাড়ীর অলিখিত খতিয়ানের পাতায় নিকুঞ্জর যে দীর্ঘদিনের একাত্মার নিভুল একটা খাঁটি হিসেব তোলা আছে, টাকা

আনার অঙ্ক কষে কোনদিন কি তার ফারখত টানা সম্ভব হবে স্বপন রায়ের পক্ষে !

চার চারটে পাস দেওয়া স্বপন রায়ের নির্ভেজাল বেকার অবস্থা কিছুটা এসে ঠেকা দিলে পাশের বাড়ীর তন্দ্রা। স্বপনের কাছে মাঝে মাঝে সে অঙ্ক কষতে আসে। শশীমুখী দেবীর ঢালা হুকুম দেওয়া আছে স্বপনকে, তনুকে যেন মাঝে মাঝে একটু ধমকধামক দেওয়া হয়, তা না হলে পড়াশুনায় কিছুতেই তার মন বসতে চায় না। তন্দ্রার কাছে ও বস্তুটি কিন্তু অচল। স্বপনের সঙ্গে কথায় কথায় তর্ক জুড়ে দেয়, গুরুমশায় বলে স্বীকার করতেই চায় না। স্বপনকে দিয়ে ভারী ভারী অঙ্কগুলো কষিয়ে নেয় সে ঠিকই, চটপট নোট ক'রে নেয় খাতায়। তার পর কিন্তু এমন ভাবটা দেখায় যেন অঙ্কগুলো তার কাছে জলবৎ তরলং, স্বপন ওগুলো কষে না দিলেও নিজেই সে অনায়াসে কষে নিতে পারতো। স্বপনের মাস্টারি বিদ্যেটাকে কিছুতেই সে আমল দিতে চায় না। স্বপন চটেমটে কিছু বলতে গেলেই খিল খিল করে হেসে উঠে।

সেদিন পুঁথিপত্র খাতা পেন্সিল নিয়ে স্বপনের পড়ার ঘরে আঁক কষতে বসেছে তন্দ্রা। বীজগণিতের আইডেন্টিটির অঙ্কগুলো কিছুতেই তার মাথায় ঢুকছে না। স্বপন শেষতক্ বিরক্ত হয়ে বলে ওঠে,—তোর কিছু হবে না, এতখানি ভোঁতা মগজ নিয়ে পরীক্ষায় কি পাশ করা যায়।

তন্দ্রা বলে ওঠে,—বারে, নিজে তুমি অঙ্কটা বোঝাতে পারছো না, আর আমি হলাম তার জন্য দায়ী। তুমি কতবড় এম-এ পাশ আমি বুঝে নিয়েছি, আইডেন্টিটির অঙ্ক তুমি ছাই জান।

স্বপন কুপিত হয়ে বলে উঠে—তা হলে আর এখানে এসে বসে আছিস কেন, বেরো—বেরো এখান থেকে, মিছেমিছি আমার সময় নষ্ট করিস না।

ফোঁস ক'রে উঠলো তন্দ্রা,—সকাল থেকে এইভাবে বেরো বেরো করো না, স্বপনদা! নইলে তোমার খাতাপত্র দোয়াত কলম দেব সব উল্টে, বুঝবে তখন মজাটা।

রাগতভাবে পুনরায় বলে উঠলো স্বপন,—কিছু হবে না, আমি সাদা কাগজে লিখে দিতে পারি, এ মেয়ের কিচ্ছু হবে না।

—আমিও এমনি লিখে দিতে পারি সাদা কাগজে লাল কালি দিয়ে—ওই যে কি সব কবিতা নাকি লিখছো—ওসব তোমার কিচ্ছু হবে না।

টিপ্পনি কাটে তন্দ্রা। সঙ্গে সঙ্গে বলে ওঠে স্বপন,—আমার কবিতা কলকাতার বড় বড় কাগজে ছাপা হয় জানিস।

—ছাই হয়, দায় পড়েছে লোকের তোমার কবিতা ছাপতে। কাগজ-ওলাদের ত আর খেয়েদেয়ে কাজ নাই।

'বসুন্ধরা' মাসিক পত্রখানা সামনেই পড়েছিলো টেবিলের এক পাশে। স্বপনের একটা দার্ঘ কবিতা এই মাসে ছাপা হয়েছে। পত্রিকাখানা খুলে তন্দ্রার সামনে ধরে দিলে স্বপন, বললে,—ছাপা হয় কিনা এই ছাপার অক্ষরে পড়ে দেখ।

তন্দ্রা হঠাৎ অবাক মেরে গেল। কবিতা একটা সত্যি সত্যি ছাপা হয়েছে 'বসুন্ধরার' প্রথম পাতায়—'অতনুর অভিশাপ।' তন্দ্রা বুঝি মনে মনে একটু খুশী হয়ে উঠলো। পত্রিকাটা স্বপনের দিকে এগিয়ে দিয়ে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বললে,—পড়ে একবার শুনিয়ে দাও না, স্বপনদা ?

এতক্ষণে স্বপনের তা'হলে একটু দর বাড়লো। তন্দ্রাকে ঈষৎ খোঁচা দিয়ে বললে,—আমার কবিতা তুই কি বুঝবি। একি তোর—'পাখী সব করে রব রাতি পোহাইল'! প:তে না পড়তেই মানে বুঝে ফেলবি।

তন্দ্রা দৃঢ় একটা প্রত্যয়ের সুরে বললে,—কবিতা আমি খুব ভাল বুঝি স্বপনদা, তুমি জান না তাই ওকথা বলছো।

—তাই নাকি, সেই জন্যই বুঝি অঙ্ক তোর মাথায় ঢোকে না! তা কবিতা না হয় পরে হবে, অঙ্কগুলো আগে কষে নিলে হয় না।

তন্দ্রা মিনতির সুরে বললে,—অঙ্ক এখন থাক, তোমার কবিতাটাই হোক আজ; 'অতনুর অভিশাপ' কি বলছে একটু শুনিয়ে দাও না।

স্বপন জানে তন্দ্রা কোন গোঁ ধরলে সহজে আর ছাড়তে চায় না। তাই ইচ্ছা না থাকলেও কবিতাটা পড়ে শোনাতেই হলো। তন্দ্রা হয়ত কিছুটা তার

বুঝলো, বাকিটুকু হয়ত রয়ে গেল তার বোধগম্যের বাইরে। কিন্তু কবিতার অর্থ সে পুরোপুরি বুঝুক আর না বুঝুক, এটুকু তার বুঝতে বাকি রইলো না, যে এ কবিতা যে লিখতে পারে, গায়ের জোরে তাকে নিতান্ত একটা অকর্মা বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। 'অতনুর অভিশাপ' কবিতাটা কিন্তু খুব করুণ বলে মনে হচ্ছে তন্দ্রার। একটি ছেলে, আর একটি মেয়ে। দু'জনেই তারা দু'জনকে ভাল বাসতো। কিন্তু অদৃষ্টের এমনি পরিহাস যে শেষ পর্যন্ত কিছুতেই তারা মিলতে পারল না। কোথেকে এক শিকারী বাজপাখী হঠাৎ একদিন উড়ে এসে হানা দিলে এক বন-কপোতীর নীড়ে ছোঁ মেরে তাকে তুলে নিয়ে কোথায় যেন অদৃশ্য হয়ে গেল। দূর থেকে ভেসে আসে কপোতীর বুকফাটা আর্তনাদ। সাথীহারা কপোত সারা বন তোলপাড় ক'রে খুঁজে ফেরে তার সঙ্গীটিকে। কেউ কাউকে আর দেখতে পায় না, কেউ কাউকে ছুঁতে পারে না; অন্ধকারে মুখ বুজে নিজের মনেই শুধু ডানা ঝাপ্‌টায়। বন হতে বনান্তরে গুমরে ফেরে একটা অভিশপ্ত বেদনার সুর।

এযে শুধু কান্নায় ভরা, এ কবিতা কেন লিখতে গেল স্বপন।

তন্দ্রার মনটা ভয়ানক খারাপ হয়ে গেল। সেই ছেলে আর মেয়েটির বিয়ে হওয়াই ত উচিত ছিলো। এতবড় একটা ভুল ক'রে ফেললে কেন স্বপনদা। কি জানি কবিতায় হয়ত চলে এসব। কিন্তু ওই বাজপাখীটাকে সামনে পেলে সঙ্গে সঙ্গে গুলি ক'রে মেরে ফেলতো তন্দ্রা। কপোতীকে তার কবল থেকে মুক্ত ক'রে দিতো। কিন্তু সে আর হয় না, কবিতাটা ছাপা হয়ে গেছে। সংশোধনের উপায় থাকলে কবিতাটা আবার নতুন ক'রে লিখিয়ে নিতো তন্দ্রা। যাকগে, যার কবিতা সে বুঝবে, তন্দ্রা এ নিয়ে আর মাথা ঘামাতে যায় কেন। স্বপনদা যে কবিতা লেখে, আর সেই কবিতা যে ছেপে বেরোয় কলকাতার মাসিক পত্রে, এইটাই আজ সব চেয়ে বড় খবর তন্দ্রার কাছে।

মাসিকপত্রখানা নাড়াচাড়া করতে করতে তন্দ্রা হঠাৎ বলে উঠলো,—আমার দু'একটা কবিতা তুমি ছাপিয়ে দেবে, স্বপনদা!

স্বপন বললে,—হঠাৎ আবার কবিতার বাতিক উঠলো কেন। পরীক্ষাটা আগে পাশ কর, তার পর কবিতার কথা পরে ভাবলেও চলবে।

স্বপনের কথাগুলো বেশ মনঃপূত হলো না তন্দ্রার, ঈষৎ ক্ষুব্ধ হয়ে বললে,—তুমি ভাবছো আমি বুঝি কবিতা লিখতে পারি না। আচ্ছা তোমাকে আমি দেখিয়ে দেব—কবিতা লিখতে পারি কিনা। রবীন্দ্রনাথের 'সঞ্চয়িতা' পড়ে আমি শেষ ক'রে ফেলেছি, জান।

স্বপন একটু সুর টেনে বললে,—তাই নাকি, তা হলে ত অনেক কিছু করে ফেলেছিস, কবিতা লেখা আর আটকায় কে ; এবার কাগজকলম শুধু নিয়ে বসলেই হয়।

রাগ ক'রে বইপুঁথি সব গুটিয়ে নিলে তন্দ্রা। স্বপন আবার বলে উঠলো,—ওকি উঠে পড়লি যে, অঙ্ক কষবি না!

তন্দ্রা রাগতভাবে জবাব দিলে,—না।

—কেন ?

—আমার খুশি।

—খুশি এমনি হলেই হলো নাকি। চুপচাপ বসে পড় এইখানে।

তন্দ্রার হাত ধরে জোর ক'রে আবার চেয়ারটার উপর বসিয়ে দিলে স্বপন। সঙ্গে সঙ্গে উঠে পড়লো তন্দ্রা। ঠোঁটের কোণে ফুটে উঠলো দুষ্টু হাসির আমেজ। এবার একটু মোলায়েম স্বরে বললে,—আজকের মত ছুটি দিয়ে দাও না, স্বপনদা!

—ছুটি, ছুটি আবার কিসের! মৃদু একটা ধমক দিয়ে বললে স্বপন।

তন্দ্রা বলে উঠলো,—বারে—কাগজে তোমার কবিতা ছাপা হলো, তার জন্যে একদিন ছুটি পাওয়া যাবে না। নিশ্চয় পাওয়া যাবে। তোমার হয়ে আজকের মত ছুটি আমি মঞ্জুর ক'রে দিলাম, ছুটি—ছুটি—ছুটি—।

বলতে বলতেই স্বপনের সামনে থেকে সরে পড়লো তন্দ্রা, দুমদাম শব্দে সিঁড়ি ভেঙ্গে নেমে গেল নীচে।

কবিতার খাতা খুলে আবার লিখতে আরম্ভ করলে স্বপন। 'বসুন্ধরা' পত্রিকাখানা গেল কোথায়? তন্দ্রা ওটা হাতিয়ে নিয়ে সরে পড়লো নাকি! ওর সামনে পত্রিকাখানা বের করাই উচিত হয় নি স্বপনের।

তন্দ্রা এবার স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষা দিয়েছে। দিন গুণছে ফলাফলের প্রতীক্ষায়। সেদিন সকালবেলা টেলিগ্রামখানা পেয়েই তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে গেল স্বপন। সংবাদটা যথাস্থানে পৌঁছে দিতে হবে। ওবাড়ী গিয়ে ঢুকতেই শশীমুখী দেবীর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। উৎফুল্ল হয়ে বলে উঠলো স্বপন,—আজ একটা সুখবর আছে দিদিমা, তন্দ্রা পাশ করেছে।

শশীমুখী দেবী একমুখ হেসে বললেন,—পাশ করেছে, খবর আজ বেরুলো বুঝি!

—হ্যাঁ—খবর আজ বেরিয়ে গেছে। এইমাত্র আমার এক বন্ধুর টেলি-গ্রাম পেলাম।

পাশের ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে এলো তন্দ্রা। স্বপনের কথাটা তার কানে গেছে। দূর থেকেই উৎসাহিত হয়ে বলে উঠলো,—কোন্ ডিভিসন—কোন্ ডিভিসন, স্বপনদা!

স্বপন মুঠোর মধ্যে টেলিগ্রামটা চেপে রেখে বললে,—কোন্ ডিভিসন চাস, থার্ড ডিভিসন হলে চলবে?

তন্দ্রা কিন্তু খুশী হলো না, চোখ দুটো একটু বিস্ফারিত ক'রে বললে,—ফার্স্ট ডিভিসন, নিশ্চয় ফার্স্ট ডিভিসন।

স্বপন কৌতুকের সুরে বললে,—ফার্স্ট ডিভিসন না আর কিছু, তোর মত ভোঁতা মেয়েকে ফার্স্ট ডিভিসন দেবে কে শুনি।

তন্দ্রা অতিশয় উৎসুক হয়ে উঠেছে। তাড়াতাড়ি বলে উঠলো,—টেলিগ্রামটা একবার দাও না স্বপনদা, কি লিখছে দেখি।

স্বপনের হাত থেকে টেলিগ্রামের কাগজখানা ছোঁ মেরে টেনে নিয়ে এক নিশ্বাসে পড়ে ফেললে তন্দ্রা। ডিভিসনটা থার্ড নয়, তার উপরেরটাও নয়, 'পাসড, ফার্স্ট ডিভিসন!'

খুশির আমেজে মুখখানা ভরে উঠলো তন্দ্রার। শশীমুখী দেবীকে শুনিয়ে একটু জোর গলায় বলে উঠলো,—ফার্স্ট ডিভিসন, ফার্স্ট ডিভিসনে পাস করে গেছি, দিদিমা!

শশীমুখী দেবী হেসে বললেন,—বেশ হয়েছে, এবার ঠাকুর ঘরে একটা প্রণাম ক'রে আয় দেখি।

তন্দ্রা স্বপনকে লক্ষ্য ক'রে বললে ,—একটা চেয়ার টেনে এইখানে বসে পড় স্বপনদা, দিদিমা তোমাকে মিষ্টি না খাইয়ে আজ ছাড়বে না। কি বল দিদিমা!

শশীমুখী দেবী হাসতে হাসতে বললেন,—কি পাকা মেয়ে রে বাবা. আগে তুই ফিরে আয় দেখি।

তন্দ্রা ঠাকুরঘরে প্রণাম সেরে উঠলো গিয়ে সোজা একেবারে বৈঠকখানায়। ভবেশবাবু নিধু পণ্ডিতের সঙ্গে দাবা খেলায় ডুবে আছেন। তন্দ্রা গিয়ে সংবাদটা তাড়াতাড়ি ঘোষণা ক'রে দিলে. ফার্স্ট ডিভিসনে সে পাস করেছে।

ধ্যান ভঙ্গ হলো ভবেশবাবুর। খুশী হয়ে বলে উঠলেন.—বা-বা-বা—তা হলে ত মস্ত একটা কাজ ক'রে ফেললি রে। এবার সামলাও পণ্ডিত!

নিধু পণ্ডিত একটু হকচকিয়ে উঠলেন। ভবেশবাবু বলে উঠলেন,—এই কিস্তি, এবার কোন্ দিক দিয়ে পাস করছো কর।

গালে হাত দিয়ে ভাবতে লাগলেন নিধু পণ্ডিত।

তন্দ্রা দেখলে এখান থেকে আর বেশী কিছু আশা নাই। ভবেশবাবুর পায়ের ধূলো নিয়ে পর্দা ঠেলে আবার অন্দরে গিয়ে ঢুকে পড়লো।

পালা এবার শশীমুখী দেবীর। দিদিমাকে প্রণাম ক'রে উঠে দাঁড়ালো তন্দ্রা। সঙ্গে সঙ্গে স্বপনকে দেখিয়ে বললেন শশীমুখী দেবী,—তোর স্বপনদাকে প্রণাম করলি না যে!

তন্দ্রা একটু লজ্জিত হয়ে এগিয়ে গেল স্বপনের দিকে। শুরুতেই বাধা দিয়ে বলে উঠলো স্বপন,—দূর থেকে হাত বাড়িয়ে প্রণাম করা ত চলবে না, রীতিমত ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করতে হবে, যাকে বলে গড় হয়ে দণ্ডবৎ। কি বলুন দিদিমা!

তন্দ্রা একটু চাপা চাপা গলায় বললে,—বাব্ বাঃ—এত—এতও তুমি জান, স্বপনদা! তাহলে আর গলবস্ত্রটা বাকি থাকে কেন. সেটাও এই সঙ্গে জুড়ে দেওয়া যাক, যাকে বলে 'গললগ্নী কৃতবাসা।'

শাড়ীর আঁচলটা গলার দিক থেকে দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে নিলে তন্দ্রা। স্বপনকে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম ক'রে বললে,—এই নাও, এবার হলো ত।

তন্দ্রার ভক্তির আতিশয্যে হাসির চোটে ফেটে পড়লো স্বপন। হো হো ক'রে হেসে উঠলো স্বপন আর শশীমুখী দেবী দু'জনেই।

দু'প্লেট খাবার এনে টেবিলের উপর ধরে দিলেন শশীমুখী দেবী। সেই সঙ্গে দু'থালা ল্যাংড়া আমের টুকরো। স্বপন আর তন্দ্রা পরমানন্দে মিষ্টিমুখ করতে বসে গেল।

খেতে খেতে তন্দ্রা বললে,—সকালবেলা কেমন মিষ্টি খাইয়ে দিলাম, দেখলে।

—তুই আবার খাওয়ালি কোথায়, খাওয়ালেন ত দিদিমা।

—কিন্তু সুপারিশটা ত আমার।

—বেশ আমিও তোকে খাইয়ে দেব সন্ধ্যাবেলা, যত খেতে পারিস। হ্যাঁ—ভাল কথা, আজ সন্ধ্যায় একটা সাহিত্য সভায় নিমন্ত্রণ আছে, দিদিমা। তন্দ্রাকে আমি সঙ্গে নিয়ে যাব, উদ্বোধন সঙ্গীতটা গেয়ে দিয়ে আসবে।

শশীমুখী দেবী খুশী হয়েই বললেন,—বেশ ত,—যাক না, মাঝে মাঝে গানের অভ্যাসটা রাখা ভাল।

তন্দ্রা এবার বলে উঠলো,—কিন্তু তোমাকে ওরা কার্ড দিয়ে নিমন্ত্রণ করেছে, আমার তাতে কি! তুমি গিয়ে হয় সভাপতি, নয় চীফ্ গেস্ট হয়ে বসে যাবে ডায়াসে, মালা নিয়ে বাড়ী ফিরবে। আমি সেখানে তোমার ল্যাংবোট হয়ে বিনা নিমন্ত্রণে যাব কেন!

—কিন্তু এতদিন ত গিয়ে এসেছিস। এখন অবশ্য পাসটাস করলি, কদর খানিকটা বাড়লো, এবার থেকে নিশ্চয় তোর আলাদা কার্ড আসবে। তোকে না হয় আজ একটা ফুলের তোড়া দিতে বলে দেব, তা হলে হবে?

তন্দ্রা ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে বললে,—চাই না আমি ফুলের তোড়া, তোমার ওই সুপারিশ-করা ঝুটো সম্মানে আমার দরকার নাই।

স্বপন একটু হেসে বললে,—প্রেস্টিজ জ্ঞানটি ঠিক আছে।

নিকুঞ্জ এসে দাঁড়ালো হঠাৎ স্বপনের সামনে, বললে,—টেলিগেরামটা কোত্থেকে এলো, কিছু বলে এলি না যে।

স্বপন জবাব দিলে,—তন্দ্রা পরীক্ষায় পাস করেছে নিকুঞ্জদা, টেলিগেরামে আজ খবর এলো।

নিকুঞ্জর চোখে মুখে ফুটে উঠলো স্বতস্ফূর্ত একটা খুশির আমেজ। স্বপনকে লক্ষ্য ক'রে বলে উঠলো,—খুকীমণি পাস করেছে। আর সে খবরটা আমাকে না জানিয়েই বেরিয়ে এলি বাড়ী থেকে। এটা কি একটা আক্কেলের কথা হলো!

স্বপন একটু অনুশোচনার সুরে বললে,—বড্ড ভুল হয়ে গেছে নিকুঞ্জদা, আমি এতটা খেয়াল করি নি।

—খেয়াল করা দরকার।

অনুযোগের সুরে বলে উঠলো নিকুঞ্জ। স্বপন কোন প্রতিবাদ করলে না।

শশীমুখী দেবী নিকুঞ্জকে আপ্যায়িত ক'রে বললেন,—বসো নিকুঞ্জ—বসো একটু মিষ্টিমুখ ক'রে যাও।

নিকুঞ্জ একটু ব্যস্ত হয়ে বললে,—বসবার আর সময় কোথায় কত্তামা-ঠাকরোণ, কাজ আমার বেড়ে গেল যে। দেখি একটু খোঁজ ক'রে কোত্থেকে আবার কোথায় গিয়ে পড়লো মানুষটা।

স্বপন একটা সন্দেশে কামড়ে দিতে দিতে বললে,—এ সময়ে হঠাৎ আবার কোথায় যেতে হবে, নিকুঞ্জদা!

—যেতে হবে তার পিয়নের খোঁজে!

জবাব দিলে নিকুঞ্জ। পুনরায় বললেন,—এত বড একটা সুখবর দিয়ে গেল লোকটা, আর তাকে কিনা বকশিস না দিয়েই বিদেয় ক'রে দিলি! রায় বাড়ীর ত এটা দস্তুর নয় খোকা। না কি বলুন কত্তামা ঠাকরোণ!

শশীমুখী দেবা সায় দিয়ে বললেন,—ঠিকই বলেছ নিকুঞ্জ, রায়বাড়ী যে একটা বনেদী ঘর।

স্বপনের এ ক্রটীটুকু অস্বীকার করবার উপায় নাই। আমতা আমতা ক'রে বলে উঠলো,—তাড়াতাড়ি যাও তাহলে, লোকটাকে একটু মান খাতির ক'রে রায়বাড়ীর দস্তুরটা যেমন ক'রে হোক বজায় ক'রে এসো।

শশীমুখী দেবী বললেন,—একটু জল খেয়ে গেলে ভাল হতো না, নিকুঞ্জ!

নিকুঞ্জ জবাব দিলে—খাব বৈকি কত্তামা ঠাকরোণ, খুকি দিদিমণি পাস করেছে, আর নিকুঞ্জ রক্ষিত মিষ্টিমুখ না ক'রে এখান থেকে সরে পড়বে

ভেবেছেন। খাবারগুলো আমার ঢাকা দিয়ে রেখে দিন, ডাকঘর থেকে ঝাঁ করে আমি এলুম বলে।

নিকুঞ্জ তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেল। তন্দ্রা একটু কৌতুকের হাসি টেনে বললে,—নিকুঞ্জদা বেশ মজার লোক কিন্তু, চমৎকার মানুষ। লোকটা খুব সিনসিয়ার, না স্বপনদা!

স্বপন জবাব দিলে,—ও আমার একটি এ্যাসেট, নিকুঞ্জদা না থাকলে রায়বাড়ীর চিলে-কোঠায় আজ হয়ত পেঁচা ডাকতো।

দাবাখেলা শেষ ক'রে ভবেশবাবু এসে অন্দরে ঢুকলেন। ঢুকেই একটা ডাক দিলেন, গিন্নী ও গিন্নী, বলি শুনছো।

সামনে হঠাৎ স্বপন আর তন্দ্রাকে দেখে একটু থেমে গিয়ে বললেন,—এই যে স্বপন সুদ্ধ এসে পড়েছো, ভালই হয়েছে। তোর দিদিমা কোথায় রে তনু!

তন্দ্রা জবাব দিলে,—উপর তলায়।

সিঁড়ি বেয়ে উপরের ঘরে উঠে গেলেন ভবেশবাবু। দূর থেকেই আর একবার হাঁক দিয়ে উঠলেন,—বলি শুনছো, তনু যে আমাদের পরীক্ষায় পাস করেছে। আর তুমি কিনা এসময় গা-ঢাকা দিয়ে বসে আছে গিয়ে উপরতলায়!

তনু যে পরীক্ষায় পাস করেছে—এ খবরটুকু অবিলম্বে শশীমুখী দেবীর কাছে পৌছে না দিয়ে স্বস্তি পাচ্ছেন না ভবেশবাবু, সিঁড়ি বেয়ে তিনি উপরে উঠে চললেন।

তন্দ্রা আর স্বপন মুখ চাওয়া চাওয়ি ক'রে চাপা গলায় একটু হেসে উঠলো। তন্দ্রা বললে,—দাদু একটি নাম্বার ওয়ান ব্যোম ভোলানাথ, ধুতরোর নেশা এখনো কাটে নি। নিধু পণ্ডিত মশায়কে বিদেয় করে এতক্ষণে বুঝি দিদিমার কথা মনে পড়লো।

আর একটিবার খিল খিল ক'রে ওরা হেসে উঠলো।

সরযূর একখানা বাস্ট ফটো জলরঙে এনলার্জ করিয়ে তন্দ্রাকে দিয়ে গেছে ব্যোমকেশ গতবার এসে। উপরের ঘরে টেবিলের উপর ছবিখানা সাজিয়ে রেখেছে তন্দ্রা। প্রত্যহ ফুল আর মালা দিয়ে নতুন ক'রে সাজায়। ধূপকাঠি জেলে দেয় সামনে, সকাল সন্ধ্যা প্রণাম জানায় তার স্বর্গীয়া মায়ের উদ্দেশে

ভবেশবাবু দরজার সামনে গিয়ে থমকে একটু দাঁড়ালেন। সরযূর ছবিখানার সামনে তন্ময় হয়ে। দাঁড়িয়ে আছেন শশীমুখীদেবী। কি যেন ভাবছেন। চেয়ে আছেন অচপল দৃষ্টি মেলে। ছ'চোখ বেয়ে অবিরলধারে অশ্রু ঝরছে। ভবেশবাবু গিয়ে দাঁড়ালেন তাঁর পাশে। চাইলেন একবার ফটোখানার দিকে। উষ্ণ একটা দীর্ঘশ্বাস ঝরে পড়লো বাতাসের বুকে! নিজেকে একটু সামলে নিয়ে ধীরে ধীরে বলে উঠলেন ভবেশবাবু, চল—এবার নীচে যাবে চল। এখানে এসে চুপ চাপ দাঁড়িয়ে আছ কেন।

শশীমুখী দেবী যেন ভেঙ্গে পড়লেন। আর্দ্রকণ্ঠে বললেন,—মাকে আমার সুখবরটা দিতে এলাম, মেয়ে যে তার পরীক্ষায় পাস করেছে।

উদ্বেল হয়ে উঠলেন শশীমুখী দেবী। ধ্যানগম্ভীর ভবেশবাবু একদৃষ্টে শুধু চেয়ে রইলেন ছবিখানার দিকে।

সেদিন রাত্রে কর্তা ও গৃহিনীর মধ্যে তন্দ্রার প্রসঙ্গ নিয়েই আলোচনা চললো বহুক্ষণ ধরে। অতঃপর কলেজে তাকে ভর্তি করা হবে কিনা সে সম্বন্ধেও কথা উঠলো। প্রশ্নটা তুললেন ভবেশবাবু, উত্তরটা দিলেন কিন্তু শশীমুখী দেবী। মেয়েদের কলেজে ভর্তি ক'রে মিছামিছি আরও খানিকটা বয়স বাড়িয়ে দেওয়ার পক্ষপাতী নন তিনি। শেষ পর্যন্ত করতে হবে ত ঘরসংসার, তার জন্য নাইবা হলো বি-এ, এম-এ, পাশ। খুব বেশী লেখাপড়া শিখলে মেয়েরা আবার অনেকেই বিয়ে করতে চায় না। কাজ কি ওসব ঝঞ্ঝাটের মধ্যে গিয়ে।

একদিক থেকে শশীমুখী দেবীর ধারণাটা অবশ্য মিথ্যে নয়। আধুনিক আলোক-প্রাপ্তা উচ্চ-শিক্ষিতা কন্যাসম্প্রদায়ের মধ্যে একটা জিনিস আজকাল খুব স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, সেটা তাদের সংসার-বিমুখতা। জীবনের পরিপূর্ণ দায়িত্বের মধ্যে নিজেকে সগৌরবে প্রতিষ্ঠা করবার যে চিরন্তন একটা নারীসুলভ মনোভাব, সেটা যেন একটু ব্যাহত হচ্ছে। হয়ত বা বর্তমানের জটিলতর জীবনসমস্যা এর মূলে কিছুটা কাজ করছে, অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু সেইটাই কি সব, সেইটাই কি এর একমাত্র চরম কৈফিয়ৎ! লক্ষণটা

ভাল কি না অভিজ্ঞরাই বলতে পারেন। নারীর পরম কাম্য বধূরূপ, তার মাতৃরূপ, এর মূল্য কি কোনদিক থেকে এতটুকু কম!

এ বিষয়ে ভবেশবাবু শশীমুখী দেবীর সঙ্গে পুরোপুরি একমত না হলেও গৃহিনীর সিদ্ধান্তই শেষ পর্যন্ত স্বীকার ক'রে নিলেন। মেয়েদের জন্য অন্ততঃ পক্ষে যতটুকু লেখাপড়া শেখা একান্ত দরকার, সেটুকু ত কোনরকমে শেষ করা গেছে। তার বেশি না হলেও আর এমন কিছু ক্ষতি হবে না।

শশীমুখী দেবী প্রস্তাব করলেন,—তার চেয়ে এক কাজ কর না, বিয়ের বয়স ত মেয়ের হয়েই এলো, এবার একটি পাত্র দেখলে কেমন হয়।

ভবেশবাবু বললেন,—সে কথাও আমি ভেবেছি। কিন্তু সলাপরামর্শটা করবে কার সঙ্গে! যার মেয়ে তারই ত আজ এগিয়ে এসে এসবগুলো করবার কথা।

শশীমুখী দেবী বললেন,—আসামের ঠিকানায় আর একখানা আমি চিঠি লিখে দিচ্ছি। জবাব পাওয়া যায় ভালই। আর তা না হলে তার ভরসায় হাত গুটিয়ে ত আর বসে থাকা চলে না।

ভবেশবাবু বলে উঠলেন, ভরসা তার আমি কোনদিনই করি না। বাবাজীবনের সে দায়িত্বজ্ঞান কোথায়। যা কিছু করবার শেষ পর্যন্ত করতে হবে এই ভবেশ মুখুজ্যেকেই, সে আমার বেশ ভালরকমই জানা আছে।

কিছুক্ষণ থেমে পুনরায় মন্তব্য করলেন ভবেশবাবু,– চিঠি যখন লিখছো স্পষ্ট করেই লিখে দাও, তার মেয়ের বিয়ের দায়িত্ব সে যেন নিজে এসে গ্রহণ করে। এ নিয়ে আমরা মাথা ঘামাতে রাজি নই।

শশীমুখী দেবী বললেন,—তা না হয় লিখে দিলাম, কিন্তু সে যদি কোন ধরাছোঁয়াই না দেয়, মাথা না ঘামিয়ে শেষ পর্যন্ত পার পাবে কি।

পার পাওয়া যে সম্ভব নয় ভবেশবাবু নিজেও সেটা জানেন। পুনরায় বললেন তিনি,—তবু আমাদের কর্তব্য বাবাজীবনকে একটু সজাগ ক'রে দেওয়া। সাড়া যদি না পাওয়া যায়, বেরুতে হবে পাত্র খুঁজতে। তন্দ্রার বিয়ে আর বেশীদিন আমি ফেলে রাখবো না গিন্নী, যত শীঘ্র সম্ভব এটা চুকিয়ে দিয়ে এবার একটু ছুটি পেতে চাই।

—তাহলে ত তাড়াতাড়ি একটি পাত্র দেখতে হয়। খোঁজখবর একটু নাও না।

মন্তব্য করলেন শশীমুখী দেবী। ভবেশবাবু বললেন,—খোঁজখবর অবশ্যই নেওয়া হবে। কিন্তু জান কি গিন্নী, তন্নুকে ত আর যার তার হাতে তুলে দিতে পারি না, একটা ছেলের মত ছেলে পেতে হবে ত।

সে বিষয়ে শশীমুখী দেবী একমত। তন্দ্রার ভবিষ্যৎ নিয়ে দুশ্চিন্তার সীমা নাই তাঁর। যতক্ষণ না মনের মত একটি সৎপাত্রের হাতে তাকে তুলে দিতে পারছেন, এ দুশ্চিন্তার হাত থেকে যে রেহাই নাই তাঁর। শশীমুখী দেবী কি যেন একটা ভাবছেন। একটু ভেবে বললেন,—একটা কথা বলবো, ক'দিন থেকে বলি বলি করেও তোমাকে বলা হয় নি। রায়বাড়ীর স্বপনের সঙ্গে তন্দ্রার বিয়ে দিয়ে দিলে কেমন হয়।

ভবেশবাবু হঠাৎ কোন জবাব দিলেন না, নিজের মনেই কি যেন ভাবতে লাগলেন। শশীমুখী দেবী পুনরায় বলে উঠলেন, –আমার ত মনে হয় হলে কিন্তু মন্দ হয় না।

ভবেশবাবু মন্তব্য করলেন,—সে বিষয়ে আর সন্দেহ কি, স্বপনের মত ছেলে হাজারে একটা পাওয়া যায় না। কিন্তু তারও ত একটা নিজস্ব মতামত আছে, আদৌ এখন বিয়ে করতে চায় কি না কে জানে।

শশীমুখী দেবী বললেন,—তুমি যদি বল, স্বপনের মতামতটা আমি জেনে নেবার চেষ্টা করতে পারি।

পুরানো দিনের কত কথাই আজ ভেসে উঠছে ভবেশবাবুর মনে। শশীমুখী দেবীকে লক্ষ্য ক'রে বললেন,—একদিন এই রায়বাড়ীর সঙ্গে এবাড়ীর কি ঘনিষ্ঠতাই না ছিলো! আমার পিতাঠাকুর আর স্বপনের প্রপিতামহ এক সঙ্গে পরামর্শ ক'রে পাশাপাশি এই দু'খানা বাড়ী তৈরি করিয়েছিলেন। একই প্যাটার্ন, একই রকম প্ল্যান। স্বপনের পিতামহ মুকুন্দবাবু ছিলেন আমার অভিন্নহৃদয় বন্ধু। তাঁর ছেলে প্রহ্লাদ রায় বেঁচে থাকলে আজ সুপ্রিম কোর্টের জজ হতো। যেমন ছিলো তার ক্ষুরধার বুদ্ধি, তেমনি ছিলো আইন জ্ঞান। সেই প্রহ্লাদ রায় আমার সামনে দাঁড়িয়ে মাথা উঁচু ক'রে

কথা কইতে পারতো না। এতখানি ছিলো তার সমীহবোধ, বাপের মত শ্রদ্ধা করতো। তার ছেলে স্বপনের হাতে তন্নুকে আজ তুলে দিয়ে দুটো বাড়ী যদি একটা ক'রে দিয়ে যেতে পারতাম, তার চেয়ে সুখের কথা আর কি হতে পারে।

শশীমুখী দেবী খুশী হয়ে উঠলেন, বললেন,—বেশ ত, দুটো বাড়ী এক ক'রে দাও না; সে ত খুব ভাল কথা।

ভবেশবাবু একটু ম্লান হেসে বললেন,—কিন্তু মেয়েটা যে আমাদের নয়, সে কথাটা ভুলে যাচ্ছো কেন। তন্নুর বিয়েতে ওর পিতৃপক্ষের একটা সম্মতি দরকার যে।

শশীমুখী দেবীর মনটা হঠাৎ টনটন ক'রে উঠলো। তন্নু যে পরের মেয়ে—একথা কি কোনদিন তাঁর মনে প্রাণে মেনে নিতে পারবেন! তবু আজ ভাবতে হচ্ছে কথাটা, না ভেবে উপায় নাই। শশীমুখী দেবী পুনরায় বললেন,—তাহলে একটা কাজ কর না, বেয়াই মশায় ত রয়েছেন, তাঁকেই একখানা চিঠি লিখে দেখ না।

—কুমারীশবাবুর কথা বলছো?

—হ্যাঁ গো—সরযুর খুড়শ্বশুর মশায়। তিনিও ত এ বিষয়ে একটা মতামত দিতে পারেন।

ভবেশবাবু সায় দিয়ে বললেন,—তা অবশ্য পারেন। কিন্তু সে কথা পরে, ব্যোমকেশের খবরটা আগে নাও ত। দরকার হলে কুমারীশবাবু ত হাতের কাছেই আছেন।

সেই যুক্তিই স্থির হলো। ব্যোমকেশের আসামের ঠিকানায় আর একখানা স্মারক-লিপি রওনা হয়ে গেল সকালবেলার ডাকে।

তন্দ্রার পরীক্ষার পড়া বহু আগেই শেষ হয়ে গেছে। স্বপনের কিন্তু গুরুমশায়গিরির অবসান ঘটে নি। তন্দ্রার জন্য কাব্যের ক্লাস খুলে বসতে হয়েছে কবি স্বপন রায়কে। একমাত্র ছাত্রী তন্দ্রা। কাব্যের হাতেখড়ি

থেকে শুরু ক'রে ধাপে ধাপে তাকে এগিয়ে নিয়ে যায় স্বপন। বর্তমান ও প্রাচীন কবিদের উৎকৃষ্ট কাব্যগ্রন্থ ব্যাখ্যা ক'রে পড়ে শোনায়। তন্দ্রা অবাক হয়ে শোনে। রবীন্দ্রনাথ সত্যেন দত্ত থেকে আরম্ভ করে ঊর্ধতন কবি জয়দেব বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস, মায় কালিদাস ভবভূতি পর্যন্ত বহু বিখ্যাত কবির অন্তত নামগুলোর সঙ্গে বিশেষ পরিচিত হয়ে উঠলো তন্দ্রা অতি অল্প দিনের মধ্যেই। কিছু কিছু পড়াশুনা করে, মাঝে মাঝে স্বপনের বক্তৃতা শোনে। কিছু কিছু বোঝে, বাকিটা হয়তো বোঝে না। কিন্তু কাব্যপাঠের বিশেষ যে একটা আনন্দ আছে, এরও একটা গভীরতর আবেদন আছে, সেটুকু তন্দ্রা বুঝেছে। পুঁথিপত্র কতকগুলো পড়ে ফেললে তন্দ্রা, স্বপনের চাপে পড়ে। মাইকেল হেমচন্দ্র নবীন সেন থেকে আরম্ভ ক'রে মঙ্গল কাব্যের যুগ পর্যন্ত চণ্ডীমঙ্গল, ধর্মমঙ্গল, মনসামঙ্গল, এসবগুলো পড়তে বেশ ভালই লাগে তন্দ্রার। কালকেতু ফুল্লরা, ধনপতি সদাগর-শ্রীমন্ত, কর্ণসেন-রঞ্জাবতী-লাউসেন, চাঁদবেনে বেহুলা ও লক্ষিন্দর, তার মনের মধ্যে যেন দাগ কেটে কেটে বসে যায়। গল্পগুলো যেন জীবন্ত। তন্দ্রাকে সব চেয়ে মুগ্ধ করেছে মধ্যযুগের এই মঙ্গলকাব্য।

পড়তে পড়তেই লেখবার ইচ্ছাও জাগে। জাগাই স্বাভাবিক বোধ হয়।

সেদিন সকাল বেলা অনেক কিছু কাঠখড় পুড়িয়ে হঠাৎ একটা কবিতা লিখে ফেললে তন্দ্রা। ভাবলে স্বপনকে এবার তাক লাগিয়ে দেবে। কবিতার খাতাখানা হাতে নিয়ে বেরিয়ে গেল বাড়ী থেকে। স্বপনের কিন্তু দেখা পাওয়া গেল না। খবর নিয়ে জানা গেল খুব সকালেই সে বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেছে কোথায় যেন। ফিরতে হয়ত একটু দেরি হতে পারে।

তন্দ্রা বাড়ী ফিরে যাচ্ছিলো। নিকুঞ্জ হঠাৎ এগিয়ে এসে বললে, আমার একটু কাজ করে দিয়ে যাবি খুকীমণি, ফুরসৎ আছে?

তন্দ্রা একটু দাঁড়ালো, বললে,—কি কাজ নিকুঞ্জদা, ঠাকুরঘরে আলপনা আঁকতে হবে?

নিকুঞ্জ ঘাড় নেড়ে বললে, না—সে সব কিছু না, কুড়োরামের হিসেবটা একবার দেখে দিয়ে যেতে পারিস।

কুড়োরাম, অর্থাৎ কুড়োরাম চক্রবর্তী, রায়বাড়ীর পাচক ব্রাহ্মণ। নিকুঞ্জর সেরেস্তায় সে আর্জি পেশ করেছে, গতমাস তক মাইনের হিসেবটা তার দেখে দিতে হবে। ডিপার্টমেণ্টটা নিকুঞ্জর হাতেই কিনা, ও নিয়ে আর অপর কেউ মাথা ঘামায় না। যা কিছু করবার সব নিকুঞ্জই করে। মাঝে মাঝে তন্দ্রাকে দিয়ে সংসার খরচার হিসাবপত্রগুলো একটু দেখিয়ে নেয় নিকুঞ্জ। লেখাপড়া জানা পাস-করা মেয়ে, হিসাবে তার পাই পয়সাটি ভুলচুক হওয়ার উপায় নাই। তন্দ্রা খাতাপত্রগুলোয় চোখ বুলিয়ে বড়জোর টোটালটা একটু দেখে দিলেই নিকুঞ্জ খুশী। দুশ্চিন্তার আর কোন কারণ রইলো না। এক্সপার্ট দিয়ে অডিট হয়ে গেল কি না।

নিকুঞ্জর অনুরোধ ঠেলতে পারে না তন্দ্রা। মাঝে মাঝে তার হিসাবপত্র-গুলো একটু দেখে দিতে হয়। আজ কিন্তু তার মন পড়ে আছে অন্য দিকে। নতুন লেখা কবিতাটা যতক্ষণ না স্বপনকে সে শুনিয়ে দিতে পারছে, ততক্ষণ তার স্বস্তি নাই। একটু আমতা আমতা করে তন্দ্রা বললে,—কুড়োরামের হিসেবটা নিয়ে কাল সকালবেলা বসলে হয় না, নিকুঞ্জদা! আজ আমার একটু কাজ আছে কিনা।

নিকুঞ্জ বললে,—বেশ, কাল সকালবেলাই হবে। মনে ক'রে কিন্তু আসিস যেন, ভুলে বসে থাকিস না।

তন্দ্রা সায় দিয়ে বললে,—নিশ্চয় আসবো। এতবড় একটা গুরুতর ব্যাপার, একি ভুলে যাওয়ার কথা।

এই বলেই হাসতে হাসতে বেরিয়ে গেল তন্দ্রা। এক ছিলিম তামাক খেয়ে নিকুঞ্জ বেরুলো মুখুজ্যে মশায়ের দাবার আড্ডায়। এতক্ষণ হয়ত নিধু পণ্ডিত এসে ঘুঁটি সাজিয়ে বসে পড়েছেন ছক পেতে।

বেলা দশটা নাগাদ একখানা গাড়ী এসে লাগলো স্বপনের দরজায়। দোতলার জানালার সামনে দাঁড়িয়েছিলো তন্দ্রা। দূর থেকে তার চোখে

পড়লো—গাড়ীর দরজা খুলে নেমে আসছে স্বপন। ধোপদস্ত পোশাক-পরিচ্ছদ, চোখে সোনার চশমা, কাঁধে একটা ভাঁজ করা কাশ্মীরি শাল। এক হাতে গোলাপের তোড়া, আর এক হাতে একটা মরশুমী ফুলের মালা ঝুলছে। স্বপন বুঝি কোন উৎসব সেরে বাড়ী ফিরলো। কবিতার খাতাখানা হাতে নিয়ে দোতলা থেকে নেমে এলো তন্দ্রা। ছুটলো আবার রায়বাড়ীর দিকে।

ঠাকুরকে এক কাপ চায়ের বরাত দিয়ে জামা কাপড় পাল্‌টে পড়ার ঘরে এসে সবে মাত্র বসেছে স্বপন, তন্দ্রা ঘরে ঢুকেই প্রশ্ন করলো—সকাল থেকে কোথায় ছিলে স্বপন দা, আজ যেন একটা রাজ্য জয় করে বাড়ী ফিরলে বলে মনে হচ্ছে।

মৃদু একটু হেসে বললে স্বপন,—আজ একটা সাহিত্য-সভা ছিলো, শরৎ স্মৃতি পাঠাগারে। দেশে আজকাল সভাপতির দুর্ভিক্ষ পড়ে গেছে কিনা, তাই সকালবেলা এসে কবিবরকে ওঁরা জোর ক'রে ধরে নিয়ে গেলেন, কিছুতেই ছাড়লেন না।

তন্দ্রা একটু চাপা হাসি হেসে বললে,—জোর ক'রে কি কেউ কাউকে ধরে নিয়ে যেতে পারে, ওটা তোমার মুখের কথা; বল যে সাহিত্য-সভায় সভাপতিত্ব করবার আজ একটা মস্তবড় চান্স পেয়ে গেছ।

চা দিয়ে গেল কুড়োরাম ঠাকুর এসে। তন্দ্রার কথার জের টেনে বললে স্বপন,—মস্তবড় একটা চান্স পেয়ে গেছি, না! আমি যেন তাদের সভাপতির আসনখানি অলঙ্কৃত ক'রে ধন্য হবার জন্য হা-পিত্যেস ক'রে বসেছিলাম।

তন্দ্রা মুখ টিপে হেসে বললে,—ছিলেই ত, নইলে কবি স্বপন রায়ের পাব্‌লিসিটি হবে কেমন ক'রে।

চায়ের পিয়ালায় চুমুক দিতে দিতে বললে স্বপন,—তার জন্য তুই একলাই ত যথেষ্ট, শুরু থেকেই ঢাক পিটিয়ে বেড়াচ্ছিস। সাহিত্য-সভায় পাবলিসিটি না হলেও কোন ক্ষতি হবে না।

গোলাপের তোড়া, আর জাপানী চন্দ্রমল্লিকার গোড়ে মালাটা সামনেই পড়ে ছিলো টেবিলের উপর। তন্দ্রা মালাখানার দিকে চেয়ে বললে,—

মালাটা কিন্তু গেঁথেছে খুব চমৎকার, না স্বপনদা! সত্যি কথা বলতে কি এই বস্তুর লোভ কি কেউ ছাড়তে পারে সহজে। সেই জন্যই ত আমাকে পর্যন্ত সঙ্গে নিয়ে গেলে না, আমি গিয়ে পাছে ভাগ বসাই। ভাবলে বুঝি এমন সুন্দর গোড়ে মালাটা দৈবাৎ যদি আমি চেয়ে বসি।

স্বপন একটু মৃদু হেসে বললে,—তোর খুব হিংসে হচ্ছে বুঝি। এই নে বাপু তোর হিংসে করতে হবে না, মালাটা তুই নিয়ে যা।

মালাখানা টেবিলের উপর থেকে তুলে নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে তন্দ্রার গলায় পরিয়ে দিলে স্বপন।

একেবারেই দিয়ে দিলে নাকি!

তন্দ্রা যেন কি একটা ভাবলে, হঠাৎ যেন নিঝুম মেরে গেল। স্বপন একটা ধাক্কা খেলে বুঝি, সজাগ হয়ে উঠলো পরমুহূর্তে। কাজটা কি বেশ শোভন হলো!

কিন্তু একি এক অপরূপ দৃশ্য! কি মানিয়েছে তন্দ্রাকে। মালাখানা যেন সজীব হয়ে উঠলো তন্দ্রার কণ্ঠলগ্ন হয়ে।

তন্দ্রা কি ভাবছে। আবহাওয়াটা যেন একটু থমথমে হয়ে উঠলো। অবস্থাটা কিন্তু সহজ ক'রে নিতে হবে। তন্দ্রা ধীরে ধীরে খুলে ফেললে মালাটা। টেবিলের উপর নামিয়ে রেখে হঠাৎ বলে উঠলো,—আমি কিন্তু আজ সত্যি সত্যি একটা কবিতা লিখে ফেলেছি, স্বপনদা। রীতিমত মিত্রাক্ষর ছন্দে, তুমি বিশ্বাস করবে!

স্বপন সাগ্রহে বলে উঠলো,—তাই নাকি, তা এতক্ষণ বলতে হয়। দেখি—দেখি—কবিতাটা দেখি।

তন্দ্রা কবিতার খাতাখানা সরিয়ে নিয়ে বললে,—আজ আর আমার সময় নাই, পরে একদিন শুনিয়ে দিয়ে যাব!

স্বপনকে আর কথা বলবার সুযোগ না দিয়েই তাড়াতাড়ি উঠে পড়লো তন্দ্রা। মালাখানা টেবিলের উপর থেকে ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলো স্বপন,—ও কি, মালাটা নিয়ে সত্যি সত্যি সরে পড়লি যে।

তন্দ্রা পিছন ফিরে তাকালো একবার। মৃদু একটু হেসে বললে,—এটা আমার।

বলতে বলতেই স্বপনের সামনে থেকে ত্বরিৎ পদে উধাও হয়ে গেল তন্দ্রা। বিস্ময়-বিমূঢ় স্বপন চেয়ে রইলো একদৃষ্টে। তার অচপল দৃষ্টির সামনে সদ্য-রচিত ছোট্ট একটি গীতি-কবিতার পাতা যেন দমকা হাওয়ায় উড়ে গিয়ে হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে গেল এক মুহূর্তে।

তন্দ্রা কি ভাবলে কে জানে।

বৈবাহিক কুমারীশবাবুর নামে সম্প্রতি একখানা পত্র লিখেছিলেন ভবেশ বাবু। তন্দ্রার বিয়ের প্রসঙ্গ নিয়ে। কুমারীশবাবু তাঁকে সাদর আহ্বান জানিয়ে বিশেষ ভাবে অনুরোধ করেছেন তিনি যেন সপরিবারে আগামী দোল উৎসবের সময় অতি অবশ্য অবশ্যই কুমারীশবাবুর শান্তিপুরের বাড়ীতে পদার্পণ করেন। প্রতি বৎসর দোলের কয়েকটা দিন শান্তিপুরে গিয়ে কাটান কুমারীশবাবু, স্ত্রীপুত্র-পরিবার সহ। কিছু বিষয় সম্পত্তি ও পাকাবাড়ীখানা আজো সেখানে আছে। কয়েকদিন সেখানে কাটিয়ে আবার তিনি ফিরে যান তাঁর কর্মস্থানে। ভবেশবাবুকে তিনি আমন্ত্রণ জানিয়েছেন, এবার যেন তিনি সস্ত্রীক দোলপর্বের রঙ খেলাটা সেইখানে গিয়েই সেরে আসেন। উপরন্তু অনুরোধ করেছেন রায়বাড়ীর ছেলেটিকেও যেমন ক'রে হোক ধরে নিয়ে যাবার জন্যে। দেখা সাক্ষাৎ ও অন্যান্য বিশদ আলোচনা সেইখানে বসেই হতে পারবে স্বচ্ছন্দে।

শশীমুখীদেবী একদিন স্বপনের কাছে প্রস্তাবটা করলেন। তাঁদের সঙ্গে শান্তিপুর পর্যন্ত যেতে হবে তাকে বেড়াতে। স্বপন কোন আপত্তি করলে না, বললে,—বেশ ত—চলুন না, ঘুরে আসা যাক কয়েকটা দিন, মন্দ কি!

ভবেশবাবু পত্রোত্তরে জানিয়ে দিলেন বৈবাহিক মহাশয়কে, দোলযাত্রার ঠিক আগের দিন সন্ধ্যাতক তাঁরা সদলবলে পৌছবেন গিয়ে কুমারীশবাবুর শান্তিপুরের ঠিকানায়। খুব সম্ভব তাঁরা নবদ্বীপ হয়ে একটু ঘুরে যাবেন।

ভবেশবাবু সপরিবারে গিয়ে শান্তিপুরে উঠলেন। বহুদিন পর দুই বৈবাহিকে দেখা-সাক্ষাৎ হ'লো। সস্ত্রীক কুমারীশবাবু স্টেশন থেকে তাঁদের সসম্মানে অভ্যর্থনা ক'রে নিয়ে এলেন বাড়ীর মধ্যে। আনন্দের একটা সাড়া পড়ে গেলো কুমারীশবাবুর অন্তঃপুরে। স্বপন সমাগমে বাড়ীখানা যেন সজীব হয়ে উঠলো, হয়ে উঠলো প্রাণ-চঞ্চল! অবাক হয়ে চেয়ে রইলেন যোগমায়া দেবী, কুমারীশবাবুর স্ত্রী। তন্দ্রাকে দেখে বিস্মিত হয়ে গেলেন। একেবারে সেই চেহারা, বৌমার হুবহু প্রতিচ্ছবি। সেই মুখ, সেই চোখ, ঠোঁটের কোণে হাসিটুকু পর্যন্ত তারই ছাঁচে ঢালা, এই বয়সেই বিয়ে হয়েছিলো ওর মায়ের। ব্যোমকেশের বধূবরণের দিনটি আজো যেন যোগমায়াদেবীর চোখের সামনে ভাসছে। মনে হচ্ছে সেদিনের কথা। তন্দ্রাকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরলেন। যোগমায়া দেবী, চোখ দু'টি তাঁর সজল হয়ে উঠলো!

বৈবাহিক মহাশয়কে আপ্যায়িত করে বসালেন কুমারীশবাবু। স্বপন এসে প্রণাম করলে কুমারীশবাবুকে। স্বপনকে দেখে যারপরনাই খুশী হলেন তিনি। মস্তক স্পর্শ ক'রে আশিস্ জানিয়ে বললেন,—খুব ভাল হলো, তোমরা সব ঠিক সময়েই এসে পড়েছ। এবার শান্তিপুরের দোল দেখে বাড়ী ফিরবে। এ কয়েকটা দিন তোমাদের আর ছেড়ে দিচ্ছি না আমি।

মুগ্ধ হয়ে গেল স্বপন, এ বাড়ীর সৌজন্য ও আন্তরিকতা দেখে। সে যে একজন বাইরের কেউ, একথা তার মনেই হচ্ছে না। কুমারীশবাবু স্বপনকে লক্ষ্য ক'রে পুনরায় বললেন,—তোমার একজন সঙ্গী জুটিয়ে দিই। আমার নাতি শ্রীমান বিজয়, ল কলেজের ছাত্র। আলাপ পরিচয়টা হয়ে যাক তোমাদের। বিজয়কে আমি এক্ষুনি পাঠিয়ে দিচ্ছি।

বিজয় এসে ভিড়ে গেল স্বপনের সঙ্গে। অতি অল্পক্ষণের মধ্যেই আলাপ পরিচয় জমে উঠলো। বাইরের ঘরে দুই বৈবাহিক গড়গড়া নিয়ে বসলেন। অন্দরমহলে শশীমুখী দেবী, যোগমায়া দেবী ও অন্যান্য কুলকামিনীদের মধ্যে গল্প ও কথাবার্তায় মহিলামহল সরগরম হয়ে উঠলো।

আকাশভাঙ্গা চাঁদের আলো ঠিকরে পড়ছে দিক-দিগন্তে। শান্তমুনির সিদ্ধপীঠ বহুবিশ্রুত শান্তিপুর শ্বেতশুভ্র উত্তরীয় অঙ্গে জড়িয়ে উৎসব-বেশে যেন হাসছে। শানাই বাজছে আতাবুনিয়া গোঁসাই পাড়ার মোড়ে। কাল যে ঠাকুরের দোল, আজ চাঁচর উৎসব।

কবি স্বপন রায়কে সঙ্গে নিয়ে বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়লো বিজয়। বড়-গোপাল পাড়ায় মৃৎশিল্প প্রদর্শনীর বিশেষ একটা আয়োজন করা হয়েছে। সর্বপ্রথম সেখান থেকেই পরিক্রমা শুরু হলো দুই বন্ধুর। এখান ওখান ঘুরে ঘুরে ফিরতে তাদের অনেক রাত হয়ে গেল।

সকালবেলার বৈঠকে তনুর বিয়ের প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা শুরু হলো দুই বৈবাহিকের মধ্যে। বিয়েটা এবার চুকিয়ে দেওয়া দরকার, সে বিষয়ে সকলেই একমত। এখন শুধু উপযুক্ত একটি পাত্র হলেই হয়। সেই নিয়েই কথা চলছে। ভবেশবাবু বনিয়াদী রায় বংশের বিস্তারিত বিবরণ পেশ করলেন জানালেন বৈবাহিক কুমারীশবাবুর কাছে। বর্তমানে স্বপন রায় সেই বংশের একমাত্র সন্তান। কৃতবিদ্য ছেলে, বিষয়-সম্পত্তি ও আর্থিক সঙ্গতিও যথেষ্ট। অতঃপর এ বিষয়ে শেষ সিদ্ধান্ত গ্রহণের ভার কুমারীশ-বাবুর উপর ন্যস্ত করে নিশ্চিন্ত হলেন ভবেশবাবু। ঘর যদি পছন্দ হয় তাঁদের, চেষ্টা করে অবশ্যই দেখা যেতে পারে।

ছেলেটিকে দেখে এবং তার সঙ্গে কথাবার্তা কয়ে খুব খুশী হয়েছেন কুমারীশবাবু। স্বপনের মত ছেলেকে অপছন্দ করবার কোন প্রশ্ন আসে না। সাগ্রহে তিনি বলে উঠলেন, কথাটা আজই পাকা করে ফেলুন, বেয়াই মশায়! ছেলের যখন মাথার উপর তেমন কোন অভিভাবক নাই বলছেন—এ বিষয়ে মতামত দিবার সম্পূর্ণ অধিকার তার নিজের। সে বিষয়ে কোন চেষ্টা করা হয়েছে কি?

ভবেশবাবু জবাব দিলেন,—আঁচে ইঙ্গিতে কথাটা একদিন তুলেছিলেন গৃহিনী। স্বপনের দিক থেকে আপত্তির কোন লক্ষণ দেখা যায় নি। তাই মৌনং সম্মতি লক্ষণম বলে ওটাকে আমরা আপাতত ধরে নিয়েছি।

কুমারীশবাবু ঈষৎ হাসি টেনে বললেন,—কন্যা তাহলে পছন্দ হয়ে গেছে বলুন। আর তা যদি হয়ে থাকে, তাহলে ত কাজ খানিকটা এগিয়েই আছে।

ভবেশবাবু একটু হেসে বললেন, খুব সম্ভব। পাত্র এবং কন্যা তাদের পছন্দ অপছন্দের দায়িত্বটা আপনার। আমার উপর ছেড়ে দিয়ে আজো নিশ্চিন্তে বসে আছেন বলে ত মনে হয় না। গৃহিনীর কাছ থেকে সেই রকম একটু আভাস পাওয়া গেছে।

কুমারীশবাবু ব্যকুল হয়ে উঠলেন, তা হলে ত আর কথাই নেই। পাকা দেখাটা এবার সেরে ফেলুন, যত শিগগীর সম্ভব। অযথা আর দেরি ক'রে লাভ কি।

ভবেশবাবুসায় দিয়ে বললেন,—আপনার অনুমতি হলে সে চেষ্টা অবশ্যই করা যেতে পারে।

কুমারীশবাবু বলে উঠলেন, অনুমতি না হয়ে আর উপায় কি বলুন। ব্যোমকেশ বাবাজীবনের উপর ভরসা ক'রে ত কোন লাভ দেখি না। তার চেয়ে এক কাজ করুন, ব্যবস্থাটা এইখানেই পাকা হয়ে যাক, দু' একদিনের মধ্যেই। পাত্র আশীর্বাদটা আমি এইখানেই সেরে ফেলতে চাচ্ছি।

ভবেশবাবুকে এ বিষয়ে অধিক বলা বাহুল্য। উৎসাহিত হয়ে তিনি বলে উঠলেন, কথাটা তাহলে গৃহিনীকে জানাই। গৌরচন্দ্রিকাটা গেয়ে রেখেছেন তিনি, এখন যুগলমিলনের ব্যবস্থা তিনিই করুন। আপনি আমি ত শুধু পোঁ ধরেই খালাস।

হো হো ক'রে একবার নিজের মনেই হেসে উঠলেন ভবেশবাবু।

কবি স্বপন রায়কে সঙ্গে নিয়ে বিজয় বেরুলো হোলি খেলতে। শান্তিপুরে আজ হোলি উৎসব! পাড়ায় পাড়ায় রং খেলা শুরু হয়ে গেছে সকাল থেকেই। উৎসবের আনন্দে সারা শহর মেতে উঠেছে।

কুমারীশবাবুর সামনে এসে হাজির হলো উড়ে গোস্বামীপাড়ার রাধা-কমল গোঁসাই বাড়ীর ছেলে। তাদের কুলদেবতা মদনমোহন জীর দোল উপলক্ষে কুমারীশবাবুদের নিমন্ত্রণ করতে এসেছে। প্রখ্যাত জ্যোতিষী স্বর্গীয় রাধামোহন গোস্বামী সার্বভৌম মহাশয় রাধাকমলের পিতাঠাকুর, অভিন্ন-হৃদয় বন্ধু ছিলেন কুমারীশবাবুর। তাঁর আমল থেকেই এই দু'টো বাড়ীর মধ্যে সেই হৃদ্যতার সম্পর্কটুকু পুরোপুরি বজায় আছে আজও, পারিবারিক একটা বন্ধনের মত। প্রতি বৎসর দোলের সময় কুমারীশবাবুদের যেতে হয় সেখানে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে। এবারেও যেতে হবে সে বিষয়ে আর সন্দেহ কি।

রাধাকমল পুনরায় বললে, ব্যোমকেশদার শ্বশুরবাড়ী থেকে যারা এসেছেন এইসঙ্গে তাঁদেরকেও আমি নিমন্ত্রণ করতে এসেছি। মায়ের একান্ত ইচ্ছা. যেতেই হবে তাঁদের।

কুমারীশবাবু রাধাকমলের পরিচয় করিয়ে দিলেন ভবেশবাবুর সঙ্গে, বললেন,—এই ত, ব্যোমকেশের শ্বশুরমশাই ইনিই।

রাধাকমল পাদস্পর্শ করে প্রণাম করলে ভবেশবাবুকে। বললে ও বাড়ীতে আজ পায়ের ধুলো দিতেই হবে আপনাদের।

ভবেশবাবু বললেন, বেশ ত, গেলেই হবে, এ ত খুব আনন্দেব কথা।

কুমারীশবাবু বললেন, তোমার জেঠাইমার উপর ভার দিয়ে যাও, তিনিই সব গুটিয়ে সুটিয়ে নিয়ে যাবেন এখন।

রাধাকমল খুশী হয়ে ঢুকলো গিয়ে কুমারীশবাবুর অন্দর মহলে।

উড়িয়া গোস্বামীদের প্রসঙ্গ নিয়ে ভবেশবাবুর সঙ্গে কিছুক্ষণ ধরে আলোচনা চললো কুমারীশবাবুর। খাস উড়িষ্যা থেকে আমদানি, নাম তাই ওড্র গোস্বামী বা উড়ে গোস্বামী। এঁরাই হলেন স্থানীয় খাঁ-চৌধুরীদের গুরুবংশ।

অদ্বৈত আচার্য প্রভুর একনিষ্ঠ সেবক তন্তুবায় বংশোদ্ভূত গোবিন্দ দাস ছিলেন খাঁয়েদের এক পুরুষ। তস্য পুত্র গৌরী দাস ব্যবসায়-ব্যপদেশে প্রভূত ধনৈশ্বর্যের অধিকারী হয়ে উপাধি পান ভাগ্যমন্ত। ভাগ্যমন্তর ভাগ্যবান পুত্র

শ্রীমন্ত খাঁ। নবাব সরকারে ঋণদান করে খাঁ উপাধি লাভ করেছিলেন। শ্রীমন্তের পুত্র রঘুনাথ। অদ্বৈত গোস্বামী-প্রভুর আশীর্বাদ-পুষ্ট গোবিন্দ দাসের বংশধর এঁরা। এই বংশের তৎকালীন বাড়বাড়ন্ত ও অপরিমেয় ধনৈশ্বর্যের কথা কিংবদন্তীর মত এ অঞ্চলে ছড়িয়ে আছে আজও। যাকে বলে ধনেপুত্রে লক্ষীলাভ—ঠিক সেই রকমটাই ঘটেছিলো শ্রীমন্ত রঘুনাথ বিশ্বম্ভর খাঁর আমলে। কিন্তু হলে কি হয় মনে তবু শান্তি নাই, তিলার্ধের স্থখ নাই, কোথায় যেন একটু ফাঁক রয়ে গেছে। শিষ্যত্ব গ্রহণ করবার জন্ত মনে সর্বদাই উন্মুখ। কিন্তু গুরু কোথায়, মন্ত্র দেবে কে। অজ্ঞান তিমিরান্ধকে কে দেবে জ্ঞানাঞ্জন-শলাকার সন্ধান। তাহলে কি গুরু পাওয়া যাবে না? পেতেই যে হবে তাঁকে। সীতানাথ অদ্বৈত আচার্যের লীলাস্থলী, চৈতন্য গদাধর নিত্যানন্দ মাধবেন্দ্রের পুণ্য পদরজ-পুত গুরুতীর্থ শান্তিপুর, যে মাটিতে নতুন ক'রে গুরুবাদের জন্ম হলো এই কিছুকাল মাত্র আগে, সেই নদে-শান্তিপুরের অধিবাসী হয়ে মন্ত্র নেওয়ার অধিকার থেকে বঞ্চিত রয়ে যাবেন কি একমাত্র এঁরাই। তা হয় না, গুরু খুঁজে বের করতে হবে। কিম্বা খুঁজেই বা তাঁকে বের করতে হবে কেন, গুরুও ত খুঁজে নিতে পারেন শিষ্যকে, ডেকে নিতে পারেন নিজের কাছে; এমনটাও ত বহুবার ঘটেছে।

ঘটলোও তাই, স্বপ্নযোগে হঠাৎ সন্ধান পাওয়া গেল ইষ্টদেবের।

স্বপ্নাদিষ্ট রঘুনাথ খাঁ সস্ত্রীক রওনা হয়ে গেলেন পুরীর পথে। পুরীরাজ প্রতিষ্ঠিত ৺টোটা গোপীনাথজীর মন্দিরে গিয়ে উপস্থিত হলেন। গুরু সেখানে বসে আছেন, ছান্দড় বংশীয় পিপলাই-গ্রামি সামবেদীয় কৌথুম শাখাধ্যায়ী রামচন্দ্র গোস্বামী বাচস্পতি মহাশয়—৺টোটা গোপীনাথের সেবাইত। পূর্বপুরুষের আদিবাস এই বাংলাদেশেই, গুপ্তপল্লী অঞ্চলে। রামচন্দ্র মন্ত্র দিলেন রঘুনাথকে, গুরুর অভাব পূর্ণ করলেন। কিন্তু এইখানেই তার শেষ হলো না, গুরুবংশকে উড়িষ্যা থেকে শান্তিপুরে নিয়ে গিয়ে প্রতিষ্ঠা করতে চাইলেন রঘুনাথ। শিষ্যের এ অনুরোধ উপেক্ষা করতে পারলেন না গুরু রামচন্দ্র, পুত্র রাধাবল্লভ গোস্বামী বিদ্যা-বাচস্পতিকে রঘুনাথের সঙ্গে পাঠিয়ে দিলেন শান্তিপুরে। এই রাধাবল্লভ গোস্বামীই শান্তিপুরস্থ উড়িয়া

গোস্বামীদের আদি পুরুষ। উড়িষ্যা থেকে এঁদের আনা হয়, নাম তাই ওড্র গোস্বামী বংশ। এঁরাই এখানকার ডালিধরা গোঁসাই। পুরুষানুক্রমে খাঁ এবং খাঁ-চৌধুরীদের গুরুবংশ এঁরাই।

গুরু প্রতিষ্ঠা ত হলো। কিন্তু বিগ্রহ ও মন্দির প্রতিষ্ঠা যে বাকি এখনও। বিরাট এক পরিকল্পনা প্রস্তুত করলেন জগন্নাথ খাঁর পুত্রগণ। মণিময় শ্যামচাঁদ মূর্তি ও স্বর্ণময়ী শ্রীরাধার বিগ্রহ নির্মিত হলো। প্রচুর অর্থব্যয়ে তৈরি হলো শ্যামচাঁদের মন্দির। বাংলা দেশে ইষ্টক নির্মিত মন্দিরের মধ্যে স্থাপত্য-শিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন সুদৃঢ়তম দেবায়তন শান্তিপুরের এই শ্যামচাঁদের মন্দির। মন্দির প্রতিষ্ঠার আয়োজন করা হলো রাজকীয় আড়ম্বরের সঙ্গে। গুরুবল যদি সহায় থাকে অভাব কিসের। এক মহতী শাস্ত্র-সভার অধিবেশন আহ্বান করলেন খাঁ বংশীয়েরা। সমগ্র ভারতব্যাপী শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের আমন্ত্রণ জানানো হলো। কাশী কাঞ্চী দ্রাবিড় মথুরা অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ থেকে সমবেত হলেন মহামহোপাধ্যায় দিকপাল পণ্ডিত-মণ্ডলী। খাঁ-বংশীয়দের আত্মীয় কুটুম্ব ও দেশবাসী সম্ভ্রান্ত সমাজপতিগণ অংশ গ্রহণ করলেন শ্যামচাঁদের মন্দির-প্রতিষ্ঠা-অনুষ্ঠানে।

রঘুনাথ খাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র মুখ্য কৃতী রামগোপাল খাঁ নদীয়াধিপতি মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের দরবারে গিয়ে আর্জি পেশ করলেন, মহারাজকে যেতে হবে উক্ত সভা অলঙ্কৃত করতে। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের স্বীকৃতি না পেলে বৃহত্তর বঙ্গ-সমাজে শাস্ত্র-সভার মূল্য যে খুব বেশি নয় সে কথা তাঁরা জানতেন। রামগোপাল তাই দৃঢ় সঙ্কল্প, যেমন ক'রেই হোক মহারাজকে ধরে নিয়ে যেতেই হবে। নদীয়াধিপতি একটু হাসলেন রামগোপালের প্রস্তাব শুনে, সনির্বন্ধ তাঁর অনুরোধ কিন্তু এড়াতে পারলেন না। প্রশ্ন করলেন রামগোপালকে তোমার নিমন্ত্রণ আমি গ্রহণ করতে রাজি আছি, কিন্তু তার বিনিময়ে আমার সম্মান-স্বরূপ তুমি কি দিতে পারবে? রামগোপাল উত্তর করলেন, দয়া ক'রে মহারাজ যেমন আদেশ করবেন। খুশী হলেন মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ; বললেন, বেশ, প্রস্তাবটা তা হলে শোন আমার। শোভাযাত্রা ক'রে কৃষ্ণনগর থেকে শান্তিপুর রওনা হব আমি হাতীর পিঠে চড়ে। আমার হাতীর যতগুলি পাঁজ পড়বে রাস্তায়,

প্রত্যেকটি পাঁজের উপর এক একখানা মোহর তুমি বসিয়ে দিয়ে যাবে ; এই আমার শর্ত। রামগোপাল খাঁ যুক্তকরে নিবেদন করলেন, তাই হবে মহারাজ। সভাগৃহে অধিষ্ঠিত হয়ে অধীনকে কৃতার্থ করতে আজ্ঞা হোক।

হাতীর পাঁজে পাঁজে মোহর গুনে দিয়ে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রকে স্বাগত জানানো হলো শান্তিপুরের সভায়। ব্যয় হলো এতে দু'লক্ষ টাকা, মোহরের মূল্য। মহাসমারোহে শ্যামচাঁদ মন্দির প্রতিষ্ঠা হয়ে গেল। সর্বসাকুল্যে ব্যয় হলো মোট্য নয় লক্ষ টাকা। ধন্য ধন্য পড়ে গেল চারিদিকে। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র খুশী হয়ে খেতাব দিয়ে গেলেন 'চৌধুরী'। তখন থেকেই এই খাঁ বংশীয়েরা খাঁ-চৌধুরী নামে সম্মান পেয়ে আসছেন।

ভবেশবাবু তন্ময় হয়ে শুনে যাচ্ছেন কুমারীশবাবুর এই পুরাতন গল্প-কথা, শান্তিপুরের অতীত কাহিনী। এই প্রাচীন নগরীর বিচিত্র ইতিহাসের পাতায় পাতায় এমন কত কাহিনী কত গল্প কত আখ্যান ও উপকথা যে ছড়িয়ে আছে, সেই শান্তমুনি বা বৌদ্ধাচার্য শান্তিকরের পূর্বাশ্রম রাজা প্রচণ্ড দেবের আমল থেকে, তার বুঝি আর ইয়ত্তা নাই।

প্রতিষ্ঠা হলো গুরুবংশ, প্রতিষ্ঠা হলো শ্যামচাঁদের মন্দির। তার অব্যবহিত পরেই খাঁ-চৌধুরীদের পৃষ্ঠপোষকতায় উড়ে গোস্বামী পাড়ায় গুরুবংশের নামে প্রতিষ্ঠিত হলেন ৺মদন মোহন জীউ। মন্দির নির্মাণ ও যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করলেন খাঁ শিষ্যবর্গ। শ্যামচাঁদকে এই দোলের সময় বৎসরের মধ্যে একটি দিনের জন্য আসতে হয় ওই মদনমোহনজীর মন্দিরে। না এসে উপায় নাই, গুরুবাড়ী যে। গুরু স্বয়ং মদনমেহাহন জীউ। বিচিত্র এই গুরু-শিষ্য সংবাদ। কে যে কার গুরু, আর কে যে কার শিষ্য, সে কথা একমাত্র শ্যামচাঁদ আর মদনমোহন জীউ বলতে পারেন। এর মানবিক আবেদন টুকুর মূল্য কিন্তু বড় কম নয়।

ভবেশবাবু ও কুমারীশবাবু বাইরের ঘরে বসে বসে গল্পে কথায় জমে উঠেছেন, পর্দা ঠেলে তন্দ্রা এসে ঘরে ঢুকলো। কুমারীশবাবুকে লক্ষ্য ক'রে বলে উঠলো তন্দ্রা—ঠাকুমা আপনাকে ভিতরে একটু ডাকছেন।

কুমারীশবাবু হালকা স্বরে বললেন, সকাল বেলা হঠাৎ তোমার ঠাকুমার ডাক, ব্যাপার কি বল ত।

তন্দ্রা হাসতে হাসতে বললে, দিদিমার সঙ্গে উনি রং খেলতে শুরু করে দিয়েছেন, আপনাদের এবার ডাক পড়েছে। পিচকিরি রঙের বালতি আবীর কুঙ্কুম সব কিছু প্রস্তুত, চলুন এখন ভিতরে।

কুমারীশবাবু হেসে উঠলেন হো হো করে। বললেন, ঠিক ঠিক রং ত আজ খেলতেই হবে। রং খেলার এমন উপযুক্ত সঙ্গী সাথীগুলি হঠাৎ পাওয়া যায় কোথায়। উঠে পড়ুন বেয়াই মশায়, রণে ভঙ্গ দেবার চেষ্টা করে কোন লাভ হবে না তার চেয়ে অন্তঃপুরে গিয়ে ভিড়ে যাওয়াই ভাল।

দোল পূর্ণিমার দিন সন্ধ্যাবেলা কুমারীশবাবুর গৃহিনী যোগমায়া দেবী অন্যান্য সকলকে সঙ্গে নিয়ে উড়ে গোস্বামী পাড়ায় ঠাকুর প্রণাম করতে বেরুলেন। মদনমোহনের আজ চাঁচর উৎসব, প্রতিপদে দোল। মন্দির প্রাঙ্গন থৈ থৈ করছে লোকের ভিড়ে। ঠাকুর আজ বেরুবেন সন্ধ্যার পর, শান্তিপুরের পথে অন্যান্য বিগ্রহদের নিমন্ত্রণ করতে। শ্যামচাঁদ কালাচাঁদ গোপীনাথ গোপাল রায় প্রমুখ উড়ে গোস্বামী প্রভুদের শিষ্যমণ্ডলীর কুলদেবতা ও স্থানীয় অন্যান্য পল্লীর বিগ্রহ পরদিন সন্ধ্যার পর এসে অধিষ্টিত হবেন মদনমোহন জীর মন্দিরপ্রাঙ্গণে। আজ থেকে তাই নিমন্ত্রণের ব্যবস্থা। এই রীতিই চলে আসছে বহুকাল ধরে।

সুন্দর ক'রে ঠাকুরের আজ হওদা সাজানো হয়েছে। বহুকালের পুরাতন হাওদা, শান্তিপুরের দারুশিল্পের এক শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। একটার পর একটা তিন প্রস্থ হাওদার উপর সবিগ্রহ মদনমোহনের সিংহাসন। ঠাকুরের বেশবাস সাজ-সজ্জার পরিপাটি আজ কত। পা থেকে মাথা পর্যন্ত ঝলমল করছে মনিময় স্বর্ণাভরণ। মুকুট-শীর্ষে ময়ূরপুচ্ছ। অঙ্গবাস পীতধড়া, পায়ে নূপুর, হাতে সোনার মুরলী। সালঙ্কারা রাধারাণী বামভাগ আলো ক'রে আছেন। যুগলমূর্তির পদ-প্রান্তে বিক্ষিপ্ত গন্ধপুষ্প ও নিবেদিত আবীর চূর্ণ। শ্রীমতীর শ্রীঅঙ্গে অঙ্গ হেলিয়ে ঠাকুর যেন উৎসববেশে হাসছেন। বৃন্দাবনের হোলি খেলা মনে পড়লো নাকি।

সন্ধ্যার পর শোভাযাত্রা রওনা হলো মদনমোহনজীর মন্দির থেকে। গোঁসাই-পল্লীর বাছাই করা স্বাস্থ্যবান যুবকের দল কাঁধে ক'রে হাওদা বয়ে নিয়ে চললেন। পরিধানে তাঁদের পট্টবস্ত্র, বক্ষলগ্ন শ্বেতশুভ্র উপবীত, চন্দন-চর্চিত ললাটদেশ, গলায় ঝুলছে সুবিন্যস্ত বসন্তবাহার উত্তরীয়! ঋতুরাজের অঙ্গনে এরাই কি আজ বসন্তোৎসবের অগ্রদূত।

রাধাকমল শোভাযাত্রা নিয়ে ব্যস্ত। নিজেও সে ঠাকুরের একজন হাওদা-বাহক। সেই সঙ্গে কুমারীশবাবুর পুত্র শ্রীমান বিজয়কেও সে একখানা গরদের ধুতি চাদর পরিয়ে হাওদা বইতে লাগিয়ে দিয়েছে। রেহাই দেওয়া হয়েছে শুধু স্বপনকে, নিতান্তই নবাগত বলে। তীব্র আলোর রোশনি ছড়িয়ে নানাবিধ বাদ্য-ভাণ্ড সহ পথে বেরুলো মদনমোহনের শোভাযাত্রা। স্বপন গিয়ে মিশে গেছে শোভাযাত্রার ভিড়ে। পাশে তার মদনমোহনজীর পুরোহিত রামশঙ্কর মুখুজ্যে মশায়। জনমণ্ডলীর শিরোদেশ লক্ষ্য করে মাঝে মাঝে আবীর নিক্ষেপ ও নবাগত স্বপনরায়ের গাইডের কাজটুকু—দুটোই তিনি একসঙ্গে চালিয়ে যাচ্ছেন।

শান্তিপুরের পথে-ঘাটে আজ বিপুল সমারোহ। পাড়ায় পাড়ায় শানাই বাজছে। বড়গোপালের বারোয়ারী মণ্ডপে ব্যাণ্ড পার্টির ঐক্যতান শুরু হয়ে গেছে সন্ধ্যার আগে থেকেই। দূর থেকে তার তরঙ্গ-লহরী ভেসে আসছে। পথের দু'ধারে অসংখ্য নরনারীর ভিড়। পিচ দেওয়া পাকা রাস্তা ধরে এগিয়ে চললো মদনমোহনের হাওদা।

স্বপন রায়ের কাছে এ যেন এক অভিনব দৃশ্য। শান্তিপুরের দোল-উৎসব যে এতখানি প্রাণবন্ত, এতখানি বৈচিত্র্যময়, স্বপনের তা জানা ছিলো না। কি ভালই যে লাগছে স্বপনের, ভাষা দিয়ে প্রকাশ করা যায় না। তন্দ্রাকে সঙ্গে নিয়ে এলেই ভাল হতো। অন্যান্য মেয়েদের সঙ্গে মন্দিরে তাকে ছেড়ে এসে ভাল করে নি স্বপন। নিজের চোখে এগুলো দেখে যাওয়া দরকার ছিলো তন্দ্রার। এর জন্য পরে হয়ত তাকে আপসোস করতে হবে।

আতাবুনিয়া গোঁসাই পাড়ার মোড়ে এসে শোভাযাত্রা মোড় ফিরলো। পাড়ার কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি মদনমোহনজীকে অভ্যর্থনা করবার জন্য

বড় রাস্তার মোড়ে এসে দাঁড়িয়ে আছেন। পুরবধূ ও কুলকন্যাগণ পূর্ণকুম্ভ কাঁখে নিয়ে রাস্তার দু'পাশে অপেক্ষা করছেন। মদনমোহনজীর হাওদা এগিয়ে আসতেই চারদিক থেকে হুলুধ্বনি উঠলো, বেজে উঠলো উপর্যুপরি মঙ্গল শঙ্খ। পুরোহিত মুখুজ্যে মশায় স্বপনের দিকে চেয়ে বলে উঠলেন,— মদনমোহনজী শ্বশুরবাড়ী যাচ্ছেন।

মদনমোহনজী শ্বশুরবাড়ী যাচ্ছেন! কথাটা শুনে অবাক হয়ে গেল স্বপন; ঠাকুরদেবতাদের আবার শ্বশুরবাড়ী আছে নাকি! তাও আবার গোলক বৈকুণ্ঠ গোলক বৃন্দাবন ছেড়ে হঠাৎ একেবারে নদে জেলার নাকের ডগায়। খাস শান্তিপুর মিউনিসিপ্যালিটির এলাকাভুক্ত এই আতাবুনিয়া গোঁসাই পাড়ার একান্তে। গাইড মুখুজ্যে মশাই রহস্যটা ভেদ ক'রে দিলেন, শোনালেন কিছু নূতন তথ্য। পূর্ণকুম্ভ উজাড় ক'রে দিতে দিতে মদনমোহনজীকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হলো। অধিষ্ঠিত হলেন তিনি স্বর্গীয় রাসবিহারী ভট্টাচার্য মহাশয়ের গৃহ প্রাঙ্গণে। এই নাকি তাঁর শ্বশুরবাড়ী। ঠাকুরের আগমন উপলক্ষে আজ এখানে বিশেষ একটু উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে। পূজার্চনা ও ভোগরাগের পর্যাপ্ত আয়োজন ক'রে রেখেছেন সপুত্রক ভট্টাচার্য গৃহিনী।

কিম্বদন্তী, পুরা-কাহিনী বা অধিক কালের ইতিহাস নয়। কয়েক বৎসর মাত্র আগের কথা। হঠাৎ একদিন সকালবেলা দেখা গেল মদনমোহনজীর মন্দির থেকে রাধারাণী চুরি হয়ে গেছেন। সিংহাসনের উপর পড়ে আছেন দারুমূর্তি মদনমোহনজী একা। যাবতীয় স্বর্ণালঙ্কার তাঁর অঙ্গ থেকে একটি একটি ক'রে খুলে নেওয়া হয়েছে। সেই সঙ্গে অষ্টধাতু-মূর্তি সালঙ্কারা রাধারাণীকেও অপহরণ ক'রে নিয়ে গেছে তস্করে, ওজন যার প্রায় মণ-খানেকের উপর। চোর জানে দাম এর বড় কম নয়। রাধারাণীকে আগুনে ফেলে হাপর দিয়ে গলালে তার থেকে যে সোনাটুকু পাওয়া যাবে, এই বাজারে মূল্য যে তার বহু টাকা। এতবড় একটা প্রলোভন সে জয় করবে কেমন ক'রে। রাতারাতি মন্দিরের দরজা ভেঙে বেশ একটা দাঁও মেরে সরে পড়েছে তস্কর।

সকালবেলা এই দুঃসংবাদ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লো। আলোড়িত হয়ে উঠলো সমগ্র উড়েগোস্বামীপাড়া। ঠাকুরের সেবাইতরা মাথায় হাত দিয়ে বসলেন। সামনে যে আবার দোল আসছে, এই অল্প কয়েকদিনের মধ্যে রাধারাণীর বিগ্রহ হঠাৎ পাওয়া যায় কোথায়? বাজারে ত আর কিনতে পাওয়া যাবে না। চারিদিকে নূতন বিগ্রহের খোঁজ পড়লো। আছে কোথাও, হাতের কাছে? দিতে পার কেউ, রাধারাণীর বিগ্রহ? ফাল্গুনী পূর্ণিমার দিন মদনমোহনজী একা একা রাস্তায় বেরুবেন কেমন ক'রে। চঞ্চল হয়ে উঠলেন সেবাইত গোস্বামী সম্প্রদায়, সেই সঙ্গে গোঁসাই বাড়ীর অগণিত শিষ্যমণ্ডলী। রাধারাণীর বিগ্রহ কি সংগ্রহ করা যাবে না!

যাঁর গরজ তিনিই হয়ত আগে থেকে সে ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন। সন্ধান একটা পাওয়া গেল, রাধারাণী আছেন; খুব বেশি দূরে নয়, একেবারে হাতের কাছে। কিছুকাল পূর্বে আতাবুনিয়া গোঁসাই পাড়া নিবাসী রাসবিহারী ভট্টাচার্য মহাশয় কোত্থেকে এক আশ্রয়হীনা রাধারাণীকে ঘাড়ে ক'রে বয়ে এনেছিলেন। কুলদেবতা শালগ্রামশীলা বিষ্ণুর বেদীমূলে রাধারাণীকেও একপাশে ঠাঁই দিতে হলো, ঠাকুর ঘরের এক কোণে। রাধারাণী একা একা রয়ে গেলেন শালগ্রাম শীলার হেপাজতে। পুরাণে বলে শ্রীরাধিকা ছিলেন বিষ্ণুর 'অত্যন্ত বল্লভা'। সেই আদিকাস থেকেই এঁদের পরস্পরের সম্পর্কটা নিবিড়। কিন্তু তাহলেই বা কি, সেবাইত ভট্টাচার্য মহাশয় শুধু এইটুকুই বোঝেন যে রাধারাণী তাঁর অকৃষ্ণ-সঙ্গমা। বুঝি এইভাবেই একা একা রয়ে গেলেন তাঁর ভিটে আঁকড়ে, কুলীন বাড়ীর বয়ঃপ্রাপ্তা অনূঢ়া কন্যার মতই। রয়েই যখন গেলেন, থাকুন একধারে; তাঁর সেবা-যত্নের দায়িত্বটুকু স্বীকার নেওয়া হলো। ঘরের মেয়েকে হাত-পা বেঁধে বানের জলে ত আর ভাসিয়ে দেওয়া যায় না।

ভট্টাচার্য মহাশয় গত হয়েছেন। ভট্টাচার্য গৃহিনীর কাছে প্রস্তাব পাঠানো হলো—তাঁর রাধারাণীকে দান করতে যদি তিনি রাজি হন। চমকে উঠলেন ভট্টাচার্য গৃহিনী, রাধারাণীকে তাঁর বিদেয় দিতে হবে! এ বিচ্ছেদ-বেদনা কি সইতে পারবেন তিনি।

অনেক ভেবে-চিন্তে, আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে বিশেষ ভাবে পরামর্শ ক'রে শেষ পর্যন্ত রাধারাণীকে তিনি দান করতে সম্মত হলেন। শুধু একটিমাত্র শর্ত তাঁর। তিনি দাবি করলেন প্রতিবৎসর জামাইষষ্ঠীর দিন মদনমোহনজীকে এই বাড়ীতে আসতে হবে রাধারাণীকে সঙ্গে নিয়ে। এই দিনটিই হবে তাঁদের বার্ষিক উৎবের দিন।

এ শর্ত স্বীকার করতে পারলেন না গোস্বামী মহাশয়েরা। একমাত্র দোল-পূর্ণিমার দিন ছাড়া মদনমোহন যে বাইরে কোথাও বেরোন না। অবশেষে রফা হলো মদনমোহনজী দোলের দিন যখন পরিক্রমায় বেরুবেন, সেই সময় কিছুক্ষণের জন্য ভট্টাচার্য মহাশয়দের বাড়ীতে এসে অধিষ্ঠিত হয়ে যাবেন। স্বীকৃত হলো এ দাবিটুকু। মদনমোহনজী বরবেশে বাদ্যভাণ্ড বাজিয়ে হাওদা চড়ে একদিন হাজির হলেন এসে ভট্টাচার্য বাড়ীতে। মন্ত্রপাঠ হলো যথারীতি, হলো যুগলের মালাবদল, রাধারাণীকে মদনমোহনজীর হাতে হাতে সম্প্রদান করলেন ভট্টাচার্য গৃহিনী। পুরোপুরি একটা বিয়ের অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়ে গেল সাড়ম্বরে। দেবতার সঙ্গে আত্মীয়তা প্রতিষ্ঠার কাহিনী এদেশে কিছু অভিনব নয়,—"দেবতারে মোরা আত্মীয় করি আকাশে প্রদীপ জ্বালি।"

স্বপনবাবুর শ্রদ্ধেয় গাইড মুখুজ্যে মশায় মন্ত্রপাঠে বসেছেন। এই অবকাশে রাধাকমল ছুটকে একটু বেরিয়ে এলো। একান্তে এসে স্বপনের সঙ্গে একটু আলাপ ক'রে গেল। বললে,—কোন অসুবিধা হচ্ছে না ত স্বপনবাবু, উৎসব কেমন লাগছে?

স্বপনের কবি মন যেন কোন্ এক কল্পনা-রাজ্যে এতক্ষণ বিচরণ করছিলো। রাধাকমলের প্রশ্নের জবাব দিয়ে বললে, অপূর্ব, এত ভাল লাগছে যে ভাষা দিয়ে তা প্রকাশ করতে পারবো না। অবাক হয়ে এতক্ষণ শুনছিলাম আপনাদের রাধারাণী বিগ্রহ চুরির কাহিনী। শুনলাম এই রাধারাণীকে এ বাড়ী থেকে কেমন করে সংগ্রহ করা হলো। এ যে প্রায় রীতিমত একটা রূপকথার কাহিনী, কমলবাবু!

রাধাকমল বললে, ঠিক তাই। কিন্তু মদনমোহনের পাশে এখন যে রাধারাণীকে দেখছেন ইনি কিন্তু সে রাধারাণী নন। কিছুদিন পর তিনিও

হঠাৎ চুরি হয়ে যান। সেই সময় শান্তিপুরে রাধারাণী চুরির একটা হিড়িক পড়ে গিয়েছিলো কিনা, তাই দ্বিতীয়াকেও শেষ পর্যন্ত ধরে রাখা যায় নি, ইনি হলেন মদনমোহনজীর তৃতীয়া।

স্বপনের বিস্ময় যেন মাত্রা ছাড়িয়ে গেল। অবাক হয়ে বলে উঠলো, সে কি কথা কমলবাবু, শান্তিপুরে কি একমাত্র চৌর্য-বস্তু এই রাধারাণী বিগ্রহ! এমনটা আবার ঘটলো কেন বলুন ত।

বলবার কিছু নাই। পূর্বোক্ত ঘটনারই পুনরাবৃত্তি। বছর দুইয়ের মধ্যেই তস্কর এসে আবার একদিন হানা দিলে গভীর রাত্রে। চটপট কাজ সেরে সরে পড়লো। ঊষার আলো একটু একটু ফুটে উঠেছে পূর্ব দিগন্তে। বিগ্রহের অন্যতমা সেবিকা মলিনা দেবী, রাধাকমলের জননী, মন্দির মার্জনা করতে এসেছেন, প্রত্যহ যেমন আসেন। হঠাৎ তাঁর চোখে পড়লো মন্দিরের তালা ভেঙ্গে পড়ে আছে দরজার পাশে। সিংহাসন সুদ্ধ মূর্তিযুগল অন্তর্হিত। মলিনাদেবী কেঁপে উঠলেন, আর্তনাদ ক'রে উঠলেন নিজের মনেই,—ঠাকুর ঠাকুর—কোথায় গেলে! কোথায় আমার মদনমোহন, কোথায় আমার রাধারাণী, মন্দির যে শূন্য!

আবছা আলো অন্ধকারে পাগলের মত হাতড়ে বেড়াতে লাগলেন মলিনা-দেবী, শূন্য বেদীর চতুষ্পার্শ্বে। বিগ্রহ পাওয়া গেল না। সংবাদ পেয়ে অন্যান্যেরাও জুটে গেলেন এসে। বিবাট একটা হৈ-চৈ পড়ে গেল মন্দির প্রাঙ্গণে। মলিনাদেবী হাত পা ছুঁড়ে কান্না জুড়লেন, মাথা খুঁড়তে লাগলেন শূন্য বেদীর উপর।

অলঙ্কারগুলো কিন্তু বেঁচে গেছে। প্রথম চুরির পর থেকে ওগুলো বাড়ীর মধ্যে তুলে রাখা হয়। বের করা হয় বিশেষ বিশেষ উৎসবের দিন। উৎসবান্তে সঙ্গে সঙ্গে আবার খুলে নেওয়া হয়। অলঙ্কার বেঁচেছে, কিন্তু বিগ্রহ? সেও ত একটা কম সমস্যা নয়।

খোঁজ করতে করতে সামনের আমবাগানে পাওয়া গেল হঠাৎ সিংহাসনটা। তার কিছু দূরে মাটির উপর চিৎপাত হয়ে পড়ে আছেন দারুমূর্তি মদনমোহন। কিন্তু রাধারাণীকে আর খুঁজে পাওয়া গেল না। ধূলায়

সুন্দর মদনমোহন এখানে হঠাৎ এভাবে পড়ে আছেন কেন। তবে কি তিনি তস্করের পিছু পিছু তাড়া ক'রে গিয়েছিলেন রাধারাণীকে উদ্ধার করবার জন্ত ? কিন্তু পারলেন কই, সে শক্তি কোথায় আজ মদনমোহনের। ছি ছি ঠাকুর, নিজের অর্ধাঙ্গিনীকে তুমি চোর ডাকাতের হাত থেকে বাঁচাতে পার না, এত বড় তুনিয়াটাকে তুমি ঠেকা দেবে কেমন ক'রে ! তস্কর ঠিক করেছে—তোমার রাধারাণীকে অপহরণ ক'রে, তোমার যে একটু শিক্ষা হওয়া দরকার। তোমার হাত পা ভেঙ্গে পীতধড়ায় বেঁধে এইখানে যে আম গাছের ডালে ঝুলিয়ে দিয়ে যায় নি, এই তোমার পরম ভাগ্য। আজ যে তুমি একেবারে ঠুঁটো জগন্নাথ হয়ে বসে আছ ঠাকুর ! শুনতে পাই তুমিই নাকি একদিন কুরুক্ষেত্র রণাঙ্গণে সারথি হয়ে নিজের হাতে বল্‌গা ধরে অর্জুনের রথ চালিয়েছিলে, 'পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্'। যুগে যুগে নাকি অবতার হয়ে ধরায় এসেছ, সে কি তুমি ! মাত্র এই সেদিনের কথা, এই শান্তিপুরের অদ্বৈত গোসাঁই প্রভুর আমলে, তুমিই নাকি নিমাই হয়ে জন্মেছিলে নবদ্বীপে। মাথা মুড়িয়ে ডোর কৌপীন পরিধান ক'রে আচণ্ডালে প্রেমধর্ম বিলিয়ে গেলে শ্রীচৈতন্য হয়ে। কত জগাই মাধাই উদ্ধার হ'য়ে গেল। তোমার দু'কূল ভাঙ্গা প্রেমের বন্যায় শান্তিপুরকে ডুবিয়ে দিয়ে নদেকে দিলে ভাসিয়ে। আর আজ তোমার সে বৈভব সে ঐশ্বর্য কোথায় ঠাকুর ! আর একবার কি জাগবে না, যে কোন একটা অবতার হয়ে ! পৃথিবীটা যে পাষণ্ডে ভরে উঠলো।

মদনমোহনকে তুলে আনা হলো আমবাগান থেকে। সমস্যা যা তা সমস্যা হয়েই রয়ে গেল। কিন্তু এ সমস্যা সমাধানের জন্ত বিশেষ কোন কাঠ-খড় পোড়াতে হলো না সেবাইতদের। পাড়ার তমালিনী দাসী, ভক্তিমতী এক সম্ভ্রান্ত তিলি বংশীয়া বিধবা, হঠাৎ এসে হাজির হলেন গোসাঁই বাড়ীতে। রাধারাণী বিগ্রহ তিনি নিজ ব্যয়ে তৈরি করিয়ে দেবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। গোসাঁই প্রভুরা তাঁর এ ভক্তির দান উপেক্ষা করতে পারলেন না। শান্তিপুরের এক বিখ্যাত শিল্পী রাধারাণীর মূর্তি তৈরী করলেন অষ্টধাতুর সমন্বয়ে। একেবারে হুবহু সেই মূর্তি। যাগ যজ্ঞ দান ধ্যান সমারোহ সহকারে

রাধারাণীকে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করা হলো মদনমোহনজীর পাশে। এই সেই বিগ্রহ, তমালিনী দাসীর দান। ভট্টাচার্য গৃহিনীর দেওয়া রাধারাণী আজ নিখোঁজ।

অবাক হয়ে আদ্যন্ত শুনে গেল স্বপন। অনুষ্ঠান শেষ হতেই মদন-মোহনজীর হাওদা আবার শহরের পথে রওনা হয়ে গেল। ভট্টাচার্য গৃহিনী যুক্ত-করে ঠায় দাঁড়িয়ে রইলেন সদর দোরের সামনে। চোখ দু'টি তাঁর ছল ছল করছে। মদনমোহন তবু দয়া ক'রে আসেন,—বৎসরের মধ্যে এই একটি দিনের জন্য। কিন্তু তাঁর রাধারাণী, সেই যে গেল—সে ত কই আর ফিরে এলো না।

প্রতিপদে আজ মদনমোহনের দোল। মন্দির-প্রাঙ্গণ সংলগ্ন বিস্তৃত ময়দানে সকাল থেকে মেলা বসেছে। প্রাঙ্গণের বাইরে ঠিক সিংদরজার পাশে উচ্চ এক মঞ্চ প্রস্তুত করা হয়েছে, মদনমোহনজীর বিগ্রহ স্থাপনের জন্য। সন্ধ্যার কিছু আগে থেকেই যুগলমূর্তি এসে অধিষ্ঠিত হলেন সেই মঞ্চের উপর। গতরাত্রে শান্তিপুরের পথে পথে ঘুরে ঠাকুর যাঁদের আহ্বান জানিয়ে এসেছেন, আজ তাঁরা নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে আসছেন, মদনমোহনজীর মন্দিরে। তাঁদের প্রত্যেককে আজ ডালি দিয়ে সম্মান করা হবে। ডালি ধরবেন ওড্র গোস্বামী প্রভুরা। সেইজন্যই এঁদের বলা হয় ডালি-ধরা গোসাঁই।

কুমারীশবাবুর বাড়ী থেকে মেয়েরা এসে পৌছে গেছেন সন্ধ্যার আগেই। সন্ধ্যার সময় বিজয় আর তন্দ্রাকে সঙ্গে নিয়ে স্বপন বেরুলো মেলা দেখতে। মন্দির সংলগ্ন বিরাট ওই মাঠখানা জুড়ে লোকজনের আজ বিপুল সমারোহ। সন্ধ্যার পর থেকেই একে একে ঠাকুর আসতে শুরু হলো। আগে ভাগেই এসে পড়েছে কতকগুলো নাড়ুগোপাল। বিভিন্ন পল্লী থেকে ছোট বড় মাঝারি নানা আকারের নাড়ুগোপাল সাজিয়ে মাঠের ধারে এসে বসে পড়েছে অতি উৎসাহী বালক ও কিশোরের দল। গোপালের সাজসজ্জা আলোর জমক দেখবার মত। শান্তিপুরে দোলের সময় নাড়ুগোপালের

সমারোহ বিশেষ একটা দর্শনীয় বস্তু। ঘরে ঘরে নাড়ুগোপাল, পাড়ায় পাড়ায় গোপাল মূর্তি, ঘর বার বারান্দা বৈঠকখানা চারিদিকে নাড়ুগোপালের ছড়াছড়ি। গোপালরূপী নন্দদুলাল হামাগুড়ি দিয়ে বসে আছে, দুই হাঁটু আর বাঁ হাতের উপর ভর দিয়ে। ডান হাতে মুখের সামনে তার নাড়ু তুলে ধরেছে। মাথায় ময়ুরপুচ্ছের চূড়া, নাকে নোলক, হাতে বালা, কটিদেশে তার আভীর বালকোচিত পুরাকালীয় শীতলপাটি। আভরণের বাহুল্য আছে, আবরণের কিন্তু বালাই নাই, গোপাল মূর্তি উলঙ্গ।

মৃৎশিল্পীর অপূর্ব এক কলাশিল্পের নিদর্শন এই নাড়ুগোপাল মূর্তি। কত গোপাল যে বিক্রি হয়ে গেল এই দোলের বাজারে, কে তার হিসাব রাখে। সারা শহর জুড়ে রাস্তার ধারে ধারে যেখানে সেখানে নাড়ুগোপালের মূর্তি সাজিয়ে মোমবাতি জেলে বসে আছে অল্পবয়স্ক ছেলেমেয়েরা পর্যন্ত। একি তাদের গোপাল উৎসব, নাকি শুধু গোপাল গোপাল খেলা।

মেলা দেখতে দেখতে তন্দ্রার হঠাৎ খেয়াল হলো নাড়ুগোপাল কিনতে হবে। অন্য কোথাও যে এগুলো পাওয়া যায় না। বিজয় তাকে ভরসা দিয়ে বললে,—সকাল বেলা কতকগুলো উৎকৃষ্ট মাটির পুতুল অবশ্যই তাকে কিনে দেওয়া হবে। এখন কি এই এই মেলার ভিড়ে বাজারে যাওয়ার সময় আছে!

বিরাট জৌলুস বেরিয়েছে শান্তিপুরের পথে। বিভিন্ন পল্লী থেকে ঠাকুর আসছেন মদনমোহন পাড়ায়। সামনেঃ বড়রাস্তার বাঁকে ঠাকুর এসে মোড় ফিরতেই উন্মুখ হয়ে ওঠে সমবেত জনতা। শোভাযাত্রা ক'রে একে একে সব এগিয়ে আসছেন। বিরাট হাওদা, চমকপ্রদ দৃশ্যপট, রকমারি আতশবাজির খেলা। বাজনা বাদ্য আলোক-সজ্জার কি বিপুল না সমারোহ। চোখ যেন ধাঁধিয়ে দেয়। ঠাকুর আসছেন কাঁসর ঘণ্টা খোল করতাল বাজিয়ে, আবীরে আর কুমকুমে চারিদিক লালে লাল। কৃষ্ণলীলার কত পুত্তলিকা তৈরি করেছে এরা দোল উৎসব উপলক্ষে, গুণে তা শেষ করা যায় না। কোন হাওদায় রাধাকৃষ্ণের পূর্ণাবয়ব যুগল মূর্তি। পায়ে পায়ে ছাঁদ দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। হাতে বাঁশী, কটিতটে পীতধড়া, মাথায় ময়ূরপুচ্ছ। মূর্তির

দিকে চাইলে চোখ যেন আর ফিরতে চায় না। এত সুন্দর, এত মনোরম তার গঠন সৌষ্ঠব। অপরূপ শিল্পকলায় আপাদমস্তক মণ্ডিত। কোন দৃশ্যে শ্রীকৃষ্ণের করধৃত সুদর্শন চক্র ঘুরছে বন বন ক'রে। কোন দৃশ্যে রাই রাজা, গোপিনীদের বস্ত্রহরণ, শ্রীরাধার মুরলী শিক্ষা!

—"রাই শিখএ বাঁশী নাগর শিখায়।
একো বাঁশী আধ আধ ধরিল দোঁহায়।"

কোন দৃশ্যে বা চন্দ্রাবলীর কুঞ্জাগত রসচূড়ামণি রসিক শেখর মানময়ী শ্রীরাধিকার পদপ্রান্তে বসে যুক্ত করে মার্জনা ভিক্ষা করছেন, 'দেহি পদ পল্লবমুদারম্'। আছে আরো, হোলি খেলার দৃশ্য। গোপাঙ্গনা পরিবেষ্টিত ব্রজকিশোর পরমানন্দে হোলি খেলছেন। গোপিনীদের কারো হাতে পিচকারি, কারো হাতে ভৃঙ্গার, কারো হাতে আবীর পাত্র। শ্যাম নাগরের সঙ্গে হোলি খেলা চলছে;—

—"চুয়া চন্দন ভরি পিচকারি।
শ্যামনাগর অঙ্গে দেও ত ডারি।"

একে একে হাওদা এসে ময়দানের চারিপাশে যে যার আপনার ঠাঁই ক'রে নিলো। আলোয় আলোয় ভরে উঠলো মদনমোহনজীর মন্দির প্রাঙ্গণ! সে এক অপূর্ব দৃশ্য। বাজনার আয়োজনই বা কত। অসংখ্য ব্যাণ্ড পার্টি মার্চ করতে করতে এগিয়ে আসছে, একটার পর একটা। কলকাতা শহর খালি ক'রে বাজনার দল কি সব বিলকুল আজ এসে পড়েছে এখানে। দেখে শুনে তাই মনে হয়। কিন্তু ব্যাণ্ড বাজনার উপর এঁদের এত ঝোঁক কেন, এ ছাড়া কি দেশে আর কোন বাজনা নাই। কোথায় গেল ঢোল কাঁসি বড়পটি, কোথায় গেল রোশনচৌকির সানাই, কোথায় গেল পল্লী বাংলার নিজস্ব সম্পদ সেই শিঙা ভেঁপু কাড়া-নাকাড়া বাদ্যকরের দল। এদের চেয়ে কি এতই তারা নিকৃষ্ট!

যুগধারার পরিবর্তন ঘটেছে। তাই এই সকল সাত্ত্বিক অনুষ্ঠানেও নানান দিক থেকে নানান ভাবে ঢুকে পড়েছে কিছু কিছু তামসিক ভাব। ঠেকানো খুব শক্ত।

স্বপন কিন্তু মুগ্ধ হয়ে গেছে। উৎসবের শুধু জাঁকজমকের দিকটা দেখেই নয়, এর ব্যাপকতাও অসামান্য। দাদ্রে পাড়া থেকে আর একখানা হাওদা এসে পৌঁছলো। কানাই বলাই মূর্তি। বাজনা কিন্তু ঢোল কাঁসি বড়পটি। কানাই বলাইয়ের বেশবাস ও মুকুট ছ'খানা দেশী ডাকের সাজ দিয়ে তৈরি। অপূর্ব তার চমক, ঝলমল করছে যেন যুগল মূর্তি। প্রায় আড়াই শ' বছর আগে এই উলা শান্তিপুর থেকেই সর্বপ্রথম প্রতিমার ডাকের সাজ সারা বাংলায় ছড়িয়ে পড়েছিলো। ধ্বংসোন্মুখ এই অপরূপ কুটিরশিল্পটি কোন রকমে টিঁকে আছে আজো। শেষ পর্যন্ত টিঁকবে কি না কে জানে, লক্ষণটা কিন্তু ভালোর দিকে বলা যায় না।

সুতরাগড থেকে পৌঁছে গেল এসে যুগল মূর্তির এক শোভাযাত্রা। শিল্পী মহানন্দ পাল এণ্ড সন্স। স্টেজ অঙ্কনে গণেশ। কানাই বলাইয়ের ঢোল বড় পটির বাজনাকে হঠাৎ কিন্তু কোণ-ঠাসা করে ফেললে সুতরাগড় দলভুক্ত আলিহোসেনের ব্যাণ্ডপার্টি এসে। জমকে নয়, সুরে। পরিচিত একখানা সিনেমার গান বাজছে আলি হোসেনের বি-শার্প বাঁশীতে। সুরটা খুব চিত্তাকর্ষক। কয়েক মিনিটের মধ্যই মেলা সুদ্ধ লোককে যেন মুগ্ধ ক'রে ফেললে। চার দিক থেকে শ্রোতৃবর্গ ঘিরে দাঁড়ালো আলি হোসেন সম্প্রদায়কে। বাজালে সে আরও দু' একখানা। শেষ করলে একটা কীর্তন বাজিয়ে। হাতখানা তার অপূর্ব মিষ্টি। স্বপন একজনকে প্রশ্ন করলে, কোথাকার এ ব্যাণ্ড পার্টি? জবাব দিলে ওস্তাদের এক শাগরেদ, হ্যারিসন রোড, ক্যালকাত্তা। তন্দ্রা স্বপনের পাশে এসে দাঁড়িয়ে মুগ্ধ হয়ে এতক্ষণ আলি হোসেনের বাজনা শুনছিলো। কীর্তনখানা শেষ হতেই কৌতূহলী তন্দ্রা হঠাৎ জিজ্ঞাসা ক'রে বসলো, আপনার নামটি কি জানতে পারি? আলিহোসেন পকেট থেকে একখানা ছাপা কার্ড বের ক'রে ধরিয়ে দিলে তন্দ্রার হাতে। বললে—এতেই আমার নাম ঠিকানা লেখা আছে, দরকার হলে খবর দেবেন। স্বপন একটু মনে মনে হাসলো। দরকার ত হতেই পারে, হয়ত বা খুব শিগ্গীর।

পটেশ্বরী তলা থেকে বিরাট এক গোপাল মূর্তি এসে পৌঁছলেন। দূর থেকে চারদিক যেন তোলপাড় করে এগিয়ে আসছে বাজনার দল। এ বাজনা ত এতক্ষণ শোনা যায় নি, কি বাজনা এটা!

শান্তিপুরের নিজস্ব এ ডগর বাদ্য। দেখতে কতকটা ডুগির মত, আকারে কিন্তু অনেকখানি বড়। বাদ্যকরদের গলায় ঝুলছে কয়েকখানা ডগর, দু' হাতে দুটো বাঁশের কাঠি দিয়ে দ্রুত লয়ে বাজিয়ে যাচ্ছে। সব বাজনাকে ঢেকে দিলে এই ডগর লহরী। আসর একেবারে মাত ক'রে ফেললে। এ হেন ডগর বাদ্যের আজ তারিফ করে কে। এর উপযুক্ত মূল্য কি আজও পায় এরা!

চৌগাছার বড় গোপাল এসে পড়েছেন। বারোয়ারী সম্প্রদায়ের মধ্যে এঁর জাঁকজমক ও আভিজাত্যই আলাদা। এতবড় গোপাল মূর্তি বাংলা দেশের আর কোথাও তৈরী হয় কিনা জানি না। চব্বিশ জন বাহক লাগে এর হাওদা বইতে। আলি হোসেনের ব্যাণ্ডপার্টি আর বড় গোপালের বাজনার দল কেউ কারো চেয়ে খাটো নয়। সমঝদার শ্রোতৃবর্গ এক কান দিয়ে শুনতে থাকে আলিহোসেনের বাজনা, ওদিক থেকে বড় গোপালের ওস্তাদরা টানতে থাকে আর একটা কান ধরে। অবস্থাটা প্রায় 'কারে রাখি কারে শুনি কে বেশি মধুর।' খুব বেশীক্ষণ কিন্তু ব্যাণ্ড বাজনা আর শুনতে হলো না কাউকে। সোনাপটির ঠাকুর এসে পড়লেন টাঁসা বাদ্য বাজিয়ে! মৃৎশিল্পী শান্তিপুরবাসী বিখ্যাত কারিগর বসন্ত পাল। টাঁসা-বাদক বরেন দাস, অতি অল্পবয়সী দেশোয়ালী এক ছোকরা। দু' একখানা জয়ঢাক আর বাঁশী আছে তার সঙ্গে। নিজে বাজাচ্ছে টাঁসা। দই পাতবার খোলার মত ছোট্ট একটি মাটির তৈরি বস্তু, চামড়া দিয়ে ছাওয়া। রশি দিয়ে বেঁধে বড়পটির মত ঝুলিয়ে নিয়েছে গলায়. দু'হাতে দুই কাঠি দিয়ে আওয়াজ করছে। সে কী তার খনখনে জমকালো আওয়াজ, সে কী তার অপূর্ব জমক; এক টাঁসা সাত ডগরের কান কাটে।

চারিদিকে ঘুরে ফিরে অপূর্ব এক নৃত্যের ভঙ্গিমায় কাঠি দিয়ে টাঁসা বাজাচ্ছে বরেন দাস। চারিদিক স্তব্ধ হয়ে গেছে, বাজছে শুধু একখানি টাঁসা। দর্শকদের চোখে পলক ফেববার অবকাশ নাই। টাঁসা উঠছে বাদ্যকরের মাথার উপর, ঘুরছে ফিরছে বুকে পিঠে, সামনের দিকে মাটির সঙ্গে সমান্তরাল হয়ে আসমানের উপর বন্ বন্ ক'রে ঘুরছে যেন টাঁসা।

চোখে আর দেখতে পাওয়া যায় না. এত বেগে ঘুরছে যে টাঁসা নামক যন্ত্রটি, শেষ পর্যন্ত এতগুলো লোকের সামনে হঠাৎ যেন উধাও হয়ে গেল। টাঁসা নাই, আছে শুধু ঘূর্ণায়মান বরেন দাস ; আর আছে তার দু'টি কাঠির চাঁটি-পেটা অপূর্ব এক বাদ্যলহরী। অবাক হয়ে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে আছে হাজার জনতা। বাজনা থামতেই চারিদিক থেকে করতালি বর্ষণ ক'রে অভিনন্দন জানানো হলো টাঁসা বাদককে। বলিহারি যাই বরেন দাস, বাহবা কি বাহবা ! পাড়াগাঁয়ের আজ মুখ রাখলি তুই।

শুরু হলো অপর দলের বাজনা।

ঠাকুর এসে পৌঁছে গেছেন বিভিন্ন পাড়া থেকে। এবার শুধু শ্যামচাঁদের অপেক্ষা। দূর থেকে এগিয়ে আসছে শোভাযাত্রা। চারিদিকে চাপা একটা গুঞ্জন উঠলো,—শ্যামচাঁদ আসছেন, শ্যামচাঁদ আসছেন, ওই বুঝি শ্যামচাঁদের হাওদা।

আসছেন নাকি শ্যামচাঁদ ? কিন্তু জমকালো আলো কই, চোখ ধাঁধানো গ্যাস বাতির গেট, কিম্বা অর্দ্ধচন্দ্র মই-বাতি ! ব্যাণ্ড বাজনা কি পাওয়া যায় নি ? উদ্দাম সেই হৈ-হুল্লোড় কই ?

সকলেই যেন কেমন একটু তটস্থ হয়ে উঠেছে। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের নামে প্রতিষ্ঠিত খাঁ-চৌধুরীদের গৃহ-বিগ্রহ শ্যামচাঁদ প্রভু আসছেন। আশে-পাশে কাচের ফানুসে গোটাকয়েক মোমবাতি জ্বলছে। সামান্য একটু দেশোয়ালী বাজনা বাদ্য। শোভাযাত্রার পুরোভাগে শ্যামচাঁদ পাড়ার সম্প্রদায় সংকীর্তন গাইতে গাইতে এগিয়ে আসছে। সমবেত ভক্তমণ্ডলী যুক্তকর কপালে ঠেকিয়ে মাঝে মাঝে নিজের মনেই উচ্চারণ ক'রে যাচ্ছেন,—জয় প্রভু শ্যামচাঁদ, জয় প্রভু শ্যামচাঁদ। শ্যামচাঁদের হাওদা এসে মদন-মোহনজীর সামনে দাঁড়ালো, একেবারে মুখোমুখি হয়ে। বর্ষ পরে গুরু শিষ্যে সাক্ষাৎ, মাত্র এই একটি দিনের জন্য। বর্ষে বর্ষে এই মিলন ক্ষণটি অক্ষয় হয়ে আছে আজও। কীর্তনে হোলি উৎসবের পদ চলছে ,—

"—হারিনু হারিনু শ্যাম বলে বারে বারে।
আর ফাগু দিয়ো না গো—"

ব্রজগোপিনীদের সঙ্গে হোলি খেলতে খেলতে ব্রজবিহারী শ্যামচাঁদ ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। তাই এই কাতরোক্তি—'আর ফাগু দিয়ো না গো'—। তাই দেখে সখীরা সব হেসে উঠলেন—

"—তখন করতালি দিয়া সব সখীগণ হাসে।
হো হো হারিলে বঁধু,
ব্রজনারীর সঙ্গে ফাগু খেলায়
হো হো হারিলে বঁধু।"

হোলি-শ্রান্ত শ্যামচাঁদের শিখিপুচ্ছ মাটির উপর লুটিয়ে পড়েছে :—

—"শিখিপুচ্ছ অলুইয়া পলো মহীতলে।
উড়নি বসন ভিজিল শ্রমজলে॥
বাঁশীও পলো চূড়াও পলো,
শ্যাম অঙ্গ অবশ হলো—
বাঁশীও পলো চূড়াও পলো।"

শ্যামচাঁদের এই অতিকাতর ভাব দেখে রসময়ী রাই শ্যামচাঁদকে আড়াল ক'রে দাঁড়ালেন। সখীদের বলছেন :—

—"আর ফাগু দিয়ো না গো—
বঁধু বড় কাতর
আর ফাগু দিয়ো না গো।
তোমরা এমনি ক'রে
আর ফাগু দিয়ো না গো"—

* * *

ডালি-ধরা অনুষ্ঠান শেষ হলো তার পরেই। সমাগত শোভাযাত্রীর দল একে একে আবার বিদেয় হয়ে গেল শোভাযাত্রা নিয়ে। শান্তিপুরের পথে পথে সারারাত আজ উৎসব চলবে।

গোসাঁই বাড়ী থেকে বিদেয় নিতে অনেকখানা রাত হয়ে গেল স্বপনের। কিন্তু শান্তিপুরের দোল উৎসবের যে মনোরম ও হৃদয়গ্রাহী চিত্রখানি এঁকে নিয়ে গেল মনের মধ্যে, সহজে তা ভোলবার নয়।

দোল উৎসব শেষ হলো, কিন্তু আসল কাজ এখনো বাকি। কুমারীশবাবু সজাগ হয়ে উঠলেন। নাতনী তন্দ্রার বিয়ের ব্যবস্থাটা পাকা ক'রে ফেলা দরকার। স্বপন যেখানে মত দিয়েছে সেখানে আর বিলম্বের কোন হেতু নাই। পাকা দেখার ব্যবস্থা ক'রে ফেললেন কুমারীশবাবু। পাত্র-আশীর্বাদ চুকে গেল যথারীতি দিনক্ষণ দেখে। বিবাহের দিন পর্যন্ত ধার্য হয়ে গেল ফাল্গুনের শেষের দিকে। মাঝে আর মাত্র কয়েকটি দিন বাকি।

ভবেশবাবু ও শশীমুখী দেবী যারপরনাই খুশী হয়ে উঠলেন। কুমারীশবাবুকে দিয়ে একাজটুকু শেষ করিয়ে নেওয়ার দরকার ছিলো। বৈবাহিক মহাশয়কে সপরিবারে ভবেশবাবুর পারুলিয়া বাসভবনে উপস্থিত থেকে শুভ অনুষ্ঠান সম্পন্ন করবার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ জানিয়ে বাড়ী ফিরবার জন্য প্রস্তুত হলেন ভবেশবাবু। সেই শুভদিনটির প্রতীক্ষায় এখর্ন থেকেই তাঁরা উন্মুখ হয়ে উঠেছেন।

কিন্তু তন্দ্রার হঠাৎ হলো কি আজ। দূরে দূরে সে পালিয়ে বেড়াচ্ছে কেন। পাত্র-আশীর্বাদের পর থেকে স্বপনের আর পাশ মাড়ায় নি তন্দ্রা। লজ্জা পেয়ে গেল নাকি! বাড়ী ফিরবার মুখে স্বপনের সঙ্গে এক গাড়ীতে চড়ে সারাটা পথ সে যাবে কেমন ক'রে।

চৌদ্দ

শুভলগ্ন এগিয়ে আসছে। ভবেশবাবু শান্তিপুর থেকে ফিরে এসেই চটপট বাড়ীখানা রং করিয়ে ফেললেন। আলোবাতি গেট সামিয়ানা বাজনা-বাদ্য, সব কিছু বায়না করা হয়ে গেছে। বিয়ের তিন দিন আগে থেকেই ডেকরেটর এসে লেগে পড়লো গৃহসজ্জার কাজে। ভবেশবাবুর একমাত্র দৌহিত্রী শ্রীমতী তন্দ্রার যে বিয়ে, ঘরদোর একটু ভাল ক'রেই সাজাতে হবে বৈকি। হাটবাজার গয়নাগাঁটি দানসামগ্রী যাবতীয় আয়োজন প্রায় ব্যবস্থা ক'রে ফেলেছেন ভবেশবাবু। বাকি যেগুলো রইলো—বিয়ের দিন তক এসে পড়বে কলকাতা থেকে। বিস্তারিত ফর্দ সমেত লোক রওনা হয়ে গেছে সময় থাকতে। কিছু কিছু হাটবাজার কলকাতা থেকে ত করতেই হবে।

নিধু পণ্ডিত মশায় কুমার বাজারের রোশনচৌকি বায়না ক'রে দিয়ে এলেন। কিন্তু সেই সঙ্গে তাঁর একান্ত ইচ্ছা অজয়পারের রাজা ডোমের ঢুলীর দলটাকে বায়না ক'রে ফেলা। ঢোল বাজনার যদি জমক দেখতে হয় সে ওই ডাকসাইটে রাজারামের দল। শশীমুখী দেবী সায় দিয়ে বললেন আনতেই হবে ঢোল বাজনা মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে ওটা একান্তই দরকার। অধিবাসের শুরুতেই সর্বপ্রথম ওই ঢোল-মঙ্গল অনুষ্ঠানে ওটা চাই-ই। অতএব আর কথা কি, বোঝার উপর শাকের আঁটি, ঢোল-মঙ্গলটা আর বাকি থাকে কেন। লোক রওনা হয়ে গেল অজয়পারের ঢুলীর দল বায়না করতে।

বিকেল বেলা বনমালী চৌধুরী, ওরফে পিট-সাহেব মশায়, সপরিবারে এসে পৌঁছে গেলেন ভবেশবাবুর বাসভবনে। গৃহিনী ও ছেলেমেয়েদের পৌঁছে দিয়ে গেলেন। দিন চারেকের ছুটি নিয়ে পরের দিন আবার ফিরে আসছেন তিনি। কুমারীশবাবুর স্ত্রী কন্যা পুত্রবধূরাও সন্ধ্যার গাড়ীতে নামলেন এসে, সঙ্গে শ্রীমান বিজয়। বিয়েবাড়ীর সমারোহ শুরু হয়ে গেল আজ থেকে। মাঝে আর মাত্র একটি দিন বাকি।

পুরাঙ্গনাগণ মঙ্গল ঘট রং করতে বসেছেন। বরকনের পিঁড়ি দু'খানা রং করবার ভার পড়লো কুমারীশবাবুর নাতনী নমিতার উপর। শান্তিনিকেতনে কলা বিভাগের ছাত্রী ছিলো নমিতা, অঙ্কন বিদ্যাটা ভালই জানা আছে। যাবতীয় খুঁটিনাটি শিল্পকর্মের দিকটা নমিতার হাতে গিয়ে পড়লো। ডেকরেটর সামিয়ানা খাড়া ক'রে ফেলেছে। গেটের কাজ যেটুক খালি বাকি থাকলো সকালবেলা শেষ হয়ে যাবে, গায়েহলুদ এসে পৌঁছবার আগেই।

স্বপন রায়ের বাড়ী কিন্তু বিয়েবাড়ী বলে মনেই হচ্ছে না। নিকুঞ্জ একটু নিরুৎসাহ হয়ে আছে। আত্মীয়-স্বজন বলতে স্বপনের এক দূর সম্পর্কীয় জ্ঞাতি-খুড়ো খুড়ীমাকে সঙ্গে নিয়ে কোনকরমে পৌঁছেছেন এসে। বাদবাকীরা যে কখন আসছেন—একমাত্র তাঁরাই জানেন। খুড়ো মশায় অবশ্য এসে থেকেই চটপট লেগে পড়েছেন বিয়েবাড়ীর খবরদারির কাজে। লোকটি

বেশ করিতকর্মা, এই যা একটু ভরসা নিকুঞ্জর। কিন্তু কাজ যে এখনো অনেক বাকি, কাল বাদ দিয়ে পরশুদিন বিয়ে। নিকুঞ্জ এর মধ্যে এতগুলো দিক সামলায় কেমন ক'রে। খোকাবাবুর এতটুকু চাড় নাই, বিয়েটা যেন অন্য কারো, তিনি শুধু বরযাত্রী যাবেন। বলতে গেলেই সেই এক কথা,—সব কিছু ঠিক হয়ে যাবে, মিছেমিছি তুমি ঘাবড়াচ্ছো কেন নিকুঞ্জ দা। আরে বাপু ঘাবড়াই সাধে, বিয়ে বলে কথা ; তার উপর কিনা রায়-বাড়ীর ছেলের বিয়ে, একে সামাল দেওয়া কি চাট্টিখানি কথা। নিমন্ত্রণপত্রগুলো এ পর্যন্ত ছাড়া হলো না, বিয়ে বাড়ী জমবে কেমন ক'রে।

তর তর ক'রে সিঁড়ি বেয়ে উপরের ঘরে উঠে গেল নিকুঞ্জ। কবি স্বপন রায় চেয়ার টেবিলে বসে নিশ্চিন্তে লেখাপড়া করছে। নিকুঞ্জ এগিয়ে এসে বললে,—এইটা কি তোর লেখাপড়ার সময় হলো খোকা! হাতে আর কোন কাজ নাই বুঝি।

স্বপন একটু পাশ কাটাবার অছিলায় সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলো,—বিয়ের পদ্য লিখছি নিকুঞ্জদা, এর ওর নামে গোটাকয়েক ছাড়তে হবে ত। আজ এগুলো লিখে না রাখলে সময় মত ছাপা হবে কেমন ক'রে।

নিকুঞ্জ একটু আশ্বস্ত হলো। বিয়ের পদ্য ত ছাপাতেই হবে। পুনরায় প্রশ্ন করলে নিকুঞ্জ,—কিন্তু নিমন্ত্রণ পত্রগুলো যে এখনো বিলি করা হলো না, ছাপাখানা থেকে ওগুলো আসবে কখন?

নিকুঞ্জকে ভরসা দিয়ে বললে স্বপন,—এসে যাবে কাল সকালের দিকে, বিলি হয়ে যাবে সন্ধ্যার আগেই। বিয়ে সেই পরশুদিন রাত দুটোর সময়, আজ থেকে এত তাড়া কিসের, নিকুঞ্জদা!

নিকুঞ্জ একটু গম্ভীর হয়ে বললে,—তাড়া কিসের, এতবড় একটা বিয়ে বাড়ীর ঝামেলা, সামলাবি কেমন ক'রে শুনি।

হাল্‌কা ভাবেই বলে উঠলো স্বপন,—আমাদের আবার ঝামেলা কি, ঝামেলা ত কনের বাড়ীর। দাদু সেইজন্য তৈরি হয়ে আছেন। বরেদের বাড়ীর দায়িত্ব শুধু বৌ-ভাতের দিনটা, শ' দুই তিন লোক কোনরকমে খাইয়ে দিতে পারলেই ছুটি। এ আর এমন ঝামেলা কি।

নিকুঞ্জ একটু অপ্রসন্ন হয়ে উঠলো যেন, হঠাৎ একটু চোখ তেড়ে বললে,—কি বললি খোকা, রায়-বাড়ীর ছেলের বৌ-ভাতে লোক খাওয়ানো হবে মোটে তিন শ' ! নিকুঞ্জ রক্ষিত এখনো বেঁচে আছে, না মরে গেছে ভেবেছিস।

স্বপন যেন একটা হোঁচট খেলে আচমকা। রায়-বাড়ীর হর্তাকর্তা নিকুঞ্জ রক্ষিত যে সশরীরে বেঁচে আছে এখনও—তা ত চোখের সামনেই দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। নিকুঞ্জ হঠাৎ তেতে উঠলো কেন। তাড়াতাড়ি আবার বলে উঠলো স্বপন,—তোমার ইচ্ছেটা কি খুলে একটু বল না নিকুঞ্জদা !

নিকুঞ্জ এবার সরাসরি ফতোয়া জারি করলে,—বৌ-ভাতের দিন এই বাড়ীতে হাজারের কম লোক খাওয়ানো হতেই পারে না। বরাবর যেমনটা চলে এসেছে, আজও তাই চলবে। লিষ্টি আমি তৈরি ক'রে ফেলেছি খোকা, সেই মোতাবেক নিমন্ত্রণ পত্রগুলো ছেড়ে দিয়ে আসবি।

স্বপন একটু আশস্ত হয়ে বললে,—তা বেশ ত, হাজারখানেক লোক খাওয়ালেই যদি রায়-বাড়ীর সম্মানটা বজায় থাকে, তাতেই বা কি এসে যায়। সেজন্য তুমি কিচ্ছু ভেবো না নিকুঞ্জদা, বিলকুল সব ঠিক হয়ে যাবে। বিয়ের দিন সকালবেলা উঠে দেখে নিয়ো—এবাড়ীর চেহারাখানাই পাল্টে গেছে। রায়-বাড়ীর ছেলের বিয়ে, সেকি যা-তা ক'রে সেরে দেওয়া চলে।

এবার যেন মনে মনে একটু খুশী হয়ে উঠলো নিকুঞ্জ। রায়-বাড়ীর ছেলের বিয়ে, সে কি যা-তা ক'রে সেরে দেওয়া চলে ! ঠিক কথাই বলেছে খোকা।

স্বপনের খুড়োমশায় মধ্যাহ্ন আহারের পর বেরিয়েছিলেন গায়ে হলুদের বাজার করতে। বাক্স-প্যাটরা বোঝাই ক'রে সন্ধ্যার পর বাড়ী ফিরলেন। নিকুঞ্জ আবার তাড়াতাড়ি নীচে নেমে এলো। স্বপনের খুড়ীমা বাক্স খুলে জিনিসপত্রগুলো একে একে ফর্দ দেখে মিলিয়ে নিতে লাগলেন। নিকুঞ্জ গিয়ে চটপট ভিড়ে গেল সেই সঙ্গে। এতক্ষণে সত্যি সত্যি কিছুটা ভরসা হচ্ছে নিকুঞ্জর, খোকাবাবুর আইবুড়ো নাম না ঘুচে আর যায় না। টেঁকে গেল রায়-বাড়ীর সংসারটা, এই বাড়ীতে এখন থেকে জীবন্ত একখানা মা-লক্ষীর পাজ পড়বে কি না।

শান্তিপুর থেকে ফিরে আসার পর তন্দ্রা কিন্তু ভুলেও একটিবার রায়বাড়ীর পথে আর পা বাড়ায় নি। যে বাড়ীর বধূ হয়ে যেতে হবে তাকে বরের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে, সেই ইট পাথরের বাড়ীখানা তন্দ্রার চোখে আজ স্বপ্ন হয়ে উঠেছে। এ যেন এক রহস্যপুরী, দূর থেকে অবাক হয়ে চেয়ে থাকে তন্দ্রা। মুখখানা তার রেঙে উঠে দুরুদুরু লজ্জায়। স্বপনকুমার যে বরবেশে নিতে আসবে তন্দ্রাকে, একথা কি কোনদিন ভেবেছিলো সে!

স্বপন হঠাৎ পড়ারঘরের উত্তর দিকের জানলাটা খুলে দাঁড়ায় গিয়ে দোতলার সামনেটায়। চোখোচোখি হয়ে যায়—ওবাড়ীর জানালার সামনে অবাক হয়ে এদিক পানে চেয়ে আছে তন্দ্রা, রায়-বাড়ীর ভাবীবধূ। স্বপনকে দেখেই তাড়াতাড়ি জানালাটা বন্ধ ক'রে দেয়। দু'টি বাড়ীর মাঝখানে চকিতে যেন একটা নতুন খুশির ঢেউ খেলে যায়, দু'টি মনের তটপ্রান্ত ছুঁয়ে। অবাক হয়ে ভাবতে থাকে স্বপন। এবাড়ী আজ ওবাড়ীর সঙ্গে নিবিড় বাঁধনে বাঁধা পড়ে গেল যে।

সুসজ্জিত তোরণশীর্ষে শানাই বাজছে। তন্দ্রার আজ গায়েহলুদ। রায়বাড়ী থেকে তত্ত্ব এসে পৌছলো। ভবেশবাবুর অন্তঃপুর কলমুখর। বেজে উঠলো মঙ্গল শঙ্খ, সেই সঙ্গে উলুধ্বনি চলছে। গায়েহলুদের সময় হয়ে এলো। শশীমুখী দেবী বাড়ীর অন্যান্য অন্তঃপুরিকাদের নিয়ে অনুষ্ঠানের আয়োজনে ব্যস্ত। সদর দোরে মঢকার উপর রোশনচৌকি বেজে চলেছে। তন্দ্রার আজ অধিবাস, কাল রাত্রে বিয়ে।

আসাম থেকে কয়েকদিনের ছুটি নিয়ে বাড়ী ফিরছে ব্যোমকেশ। সঙ্গে তার প্রমথেশ, মৌলং কলিয়ারির ভারপ্রাপ্ত ম্যানেজার। এক কলিয়ারিতে এক সঙ্গেই কাজ করে ওরা। নামলো এসে দু'জনেই সকালের ট্রেনে। ঝকঝকে একখানা টমটমের উপর বাক্স প্যাঁটরা চাপিয়ে নিয়ে চড়ে বসলো ব্যোমকেশ, প্রমথেশকে সঙ্গে নিয়ে। ভবেশবাবুর পাকলিয়া বাসভবন লক্ষ্য ক'রে এগিয়ে চললো গাড়ীখানা। খনি অঞ্চল রাণীগঞ্জ ছিঁড়ে এসে পড়েছে

প্রমথেশ, নতুন পাসকরা মৌলং কলিয়ারির ম্যানেজার, ব্যোমকেশ তাকে এ পর্যন্ত না টানিয়ে ছাড়লে না। নতুন দেশ, নতুন আবহাওয়া, নতুনতর পরিবেশ; ভালই লাগছে প্রমথেশের। কোচোয়ানের চাবুক খেতে খেতে এগিয়ে চললো টমটম, পিচ ঢালা পাকা রাস্তা দিয়ে।

বাড়ীর কাছাকাছি এসে দূর থেকেই ব্যোমকেশের চোখে পড়লো ভবেশবাবুর সদর দরজায় বিরাট একখানা গেট সাজানো হয়েছে। ভেসে আসছে শানাইয়ের স্বর। হ্যাঁ—শানাই-ই ত, তন্দ্রার যে কাল বিয়ে। ব্যোমকেশের চিঠি তাহলে ঠিক সময় মতই পেয়ে গেছেন এঁরা। কাজ খানিকটা এগিয়ে রেখেছেন। এতক্ষণে ব্যোমকেশ যেন একটু আশ্বস্ত হলো।

টমটম থামলো এসে ভবেশবাবুর সদর দোরে। দূর থেকে তন্দ্রার চোখে পড়েছে। ছুটতে ছুটতে শশীমুখী দেবীর সামনে গিয়ে দাঁড়ালো তন্দ্রা, তাড়াতাড়ি বলে উঠলো,—বাবা আসছেন।

শশীমুখী দেবী সচকিতে বলে উঠলেন,—কে-কে আসছেন, ব্যোমকেশ! এলো নাকি? যাক, বাঁচা গেল। চিঠিখানা তাহলে ঠিক সময় মতই পৌঁচেছে।

বাড়ীর কয়েকজন বাইরে গিয়ে ভিড় ক'রে দাঁড়ালো। ব্যোমকেশ এসে পড়েছে, সঙ্গে এক অপরিচিত ভদ্রসন্তান। হবে হয়ত ব্যোমকেশের জানা চেনা কেউ। বার-বাড়ীর লাগাও বাগানের এককোণে যে ঘরখানা বিশিষ্ট অতিথিদের জন্য সাজিয়ে গুছিয়ে রাখা হয়েছে, প্রমথেশকে স্যুটকেশ তোরঙ্গ হোল্ডলসমেত তুলে দেওয়া হলো সেই ঘরটায়। ব্যোমকেশের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো চৌধুরী সাহেবের ছেলে মণ্টু। ব্যোমকেশের পায়ের ধুলো নিয়ে বললে,—ভাল আছেন ব্যোমকেশদা!

ব্যোমকেশ অবাক হয়ে চেয়ে রইলো মণ্টুর মুখের দিকে। কে এই নবযুবক! মণ্টু আবার বলে উঠলে, চিনতে পারলেন না ত, আমি মণ্টু।

ব্যোমকেশ যেন খুশির আমেজে ফেটে পড়লো,—আরে মণ্টু নাকি, সেই হাট্টিমাটিম মণ্টুসাহেব! কতবড়টা হয়ে গেছিস, চিনবার কি উপায় আছে। চল্ চল্ বাড়ীর মধ্যে চল্।

সদর ফটকে সানাই বাজছে। ব্যোমকেশ এগিয়ে গেল অন্দরের দিকে। উঠানে এসে পা দিতেই চোখে পড়লো ব্যোমকেশের তার খুড়ীমা যোগমায়া দেবী কয়েকটা কইমাছ নিয়ে কুটতে বসেছেন। বারান্দার একপাশে বসে পান সাজছেন সুরমা দেবী, মণ্টুর মা। বারান্দার সামনে হাসি হাসি মুখ ক'রে দাঁড়িয়ে আছেন শশীমুখী দেবী। চারিদিকে লোকজন হৈ-হুল্লোড়, বিয়েবাড়ী সরগরম। তন্দ্রা গিয়ে তাড়াতাড়ি ব্যোমকেশকে প্রণাম করলে। দুচোখভরে ফ্যাল ফ্যাল ক'রে চেয়ে রইলো ব্যোমকেশ তন্দ্রার মুখের দিকে, বললে,—কত বড়টি হয়ে গেছিস রে, মা-মণি!

কত বড়টি না হয়ে আর উপায় কি-তন্দ্রার। এবার যে তার কনে-বৌ সাজবার পালা।

ব্যোমকেশ গিয়ে শশীমুখী দেবীর পায়ের ধূলো নিলে। অতিমাত্রায় খুশী হয়ে উঠলেন শশীমুখী দেবী, স্বস্তির একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, খুব সময়ে এসে পড়েছ বাবা, তুমি আমাদের দুশ্চিন্তার হাত থেকে বাঁচালে। আমার চিঠিখানা ঠিক সময় মত পেয়েছিলে ত?

ব্যোমকেশ জবাব দিলে,—আজ্ঞে না, চিঠিপত্র কই পাইনি তা! লিখেছিলেন নাকি? কিন্তু আগের সে ঠিকানায় এখন ত আমি নেই, চাকরি নিয়েছি মৌলং-এ। সে যাকগে, এদিকে সব প্রস্তুত ত!

শশীমুখী দেবী উত্তর করলেন,—প্রস্তুত না হয়ে উপায় কি বাবা, কাল যে মেয়ের বিয়ে। এইমাত্র গায়ে হলুদের তত্ত্ব এসে পৌঁছলো।

ব্যোমকেশ একটু ধাঁধাঁয় পড়লো। সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলো,—গায়ে হলুদের তত্ত্ব, সে আবার এলো কখন! গায়ে হলুদ ত বর বাড়ী থেকে আসবে।

শশীমুখী দেবী সায় দিয়ে বললেন,—তাই ত এসেছে বাবা, তত্ত্ব পাঠিয়েছে রায় বাড়ীর স্বপন। তারই সঙ্গে তন্দ্রার বিয়ে হচ্ছে কিনা।

ব্যোমকেশ হকচকিয়ে উঠলো, সে কি কথা, রায়-বাড়ীর স্বপন—সে আবার কে! এ আপনি কি বলছেন! আসাম থেকে পাত্র যে আমি সঙ্গে নিয়ে এসেছি।

চমকে উঠলেন শশীমুখী দেবী। আসাম থেকে আবার কে এলো!

পুনরায় বললো ব্যোমকেশ,—নৈকষ্য কুলীনের ছেলে, মস্তবড় মাইনিং ইঞ্জিনিয়ার। এইমাত্র তাকে বাইরের ঘরে বসিয়ে রেখে এলাম যে।

ভবেশবাবুর কানে গেছে ব্যোমকেশের কথাটা। হতভম্বের মত ঘর থেকে তিনি বেরিয়ে এসে বললেন—কি—কি বললে—কি বললে বাবাজীবন, পাত্রের কথা কি যেন বললে না! সে ত আগেই আমরা স্থির ক'রে ফেলেছি। তুমি আবার কোত্থেকে হঠাৎ ধরে নিয়ে এলে কাকে। কথাটা যে বড় গোলমেলে ঠেকছে বাবাজী!

ব্যোমকেশ জবাব দিলে,—আজ্ঞে না, গোলমেলে ঠেকবার ত কথা নয়। মাসখানেক আগেই ত আমি চিঠি লিখে আপনাদের জানিয়ে দিয়েছি—তন্থর বর ঠিক হয়ে গেছে, ফাল্গুনের সাতাশ তারিখে বিয়ে। আমরা যে আজ এই ট্রেনে এসে নামবো সে কথাও ত পরের চিঠিতে জানানো হয়েছে। পান নি সে চিঠি?

ভবেশবাবু অবাক হয়ে বললেন,—না, তোমার কোন চিঠিই পাইনি। নিজের হাতে পোষ্ট করেছিলে?

ব্যোমকেশ একটু ভেবে বললে,—আজ্ঞে না, তা অবশ্য করা হয়নি চাকর বেটাকে পাঠিয়েছিলাম ডাকঘরে চিঠি ফেলতে। তাহলে কি ডাক টিকিটের পয়সা কটাই মেরে দিলে বেটা! অসম্ভব নয় কিছু, বেটা একনম্বর শয়তান।

ভবেশবাবু একটু বিরক্তির সুরে বললেন, নিজের হাতে রেজেষ্ট্রী ক'রে পাঠাওনি কেন সে চিঠি। আমরা যে এদিকে সব কিছু ঠিক ক'রে বসে আছি, সাতাশ তারিখে মেয়ের বিয়ে।

ব্যোমকেশ জবাব দিলে,—আজ্ঞে হ্যাঁ—বিয়েটা ত ওই সাতাশ তারিখেই হচ্ছে। পাত্র আশীর্বাদের সঙ্গে সঙ্গেই দিন তারিখ আমি পাকা ক'রে ফেলেছি। কিন্তু রায়-বাড়ীর স্বপন না কি যেন একটা বললেন, তাকে ত আমি চিনি না। তন্থর বিয়ে ত হচ্ছে প্রমথেশের সঙ্গে, গায়ে হলুদের তত্ত্ব নিয়ে গেস্ট্ হাউসে এসে বসে আছে সে।

শশীমুখী দেবীর মুখখানা হঠাৎ ফ্যাকাশে হয়ে গেল। ভবেশবাবু পুনরায় বললেন,—দোলের সময় তোমার খুড়োমশায়ের বাড়ীতে বসে কথাবার্তা পাকা হয়ে গেছে, নিজে তিনি পাত্র আশীর্বাদ করেছেন। এ বিয়ে ত আর নড়চড় ত হতে পারে না।

সবই যেন গোলমেলে ঠেকছে ব্যোমকেশের কাছে। হঠাৎ যে এঁরা এমন ধারা একটা ফ্যাসাদ বাধিয়ে বসে আছেন, আদৌ সে কথা ভাবতে পারে নি ব্যোমকেশ। পুনরায় সে বলে উঠলো,—কিন্তু প্রমথেশকে যে আমি বহুকষ্টে রাজি করেছি। তাকে ত আর অসম্মান ক'রে ফিরিয়ে দেওয়া যায় না। আমার উপর বিশ্বাস ক'রে মেয়ে পর্যন্ত সে দেখতে আসে নি। তনুর তের বছর বয়সের একখানা ফটো দেখেই ও কাজটুকু শেষ করেছে।

ভবেশবাবু ঘেমে উঠলেন। এর চেয়ে অঘটন আর কি হতে পারে। ব্যোমকেশের এ হঠকরিতা মার্জনার বাইরে। কিন্তু এই গুরুতর সমস্যার সমাধান যে একটা করতেই হবে ভবেশবাবুকে। কণ্ঠে তাঁর ফুটে উঠলো মিনতির স্বর। ব্যোমকেশকে উদ্দেশ ক'রে বললেন,—তুমি আমাকে নিয়ে চল তাঁর কাছে, আমায় নিয়ে চল, সেই ভদ্রসন্তানকে সব কথা আমি বুঝিয়ে বলবো—ভুল ভ্রান্তি যেটুকখানি ঘটেছে। দরকার হয় তাঁর হাতে পায়ে ধরে ক্ষমা চাইবো আমি।

ব্যোমকেশ আপত্তি জানিয়ে বললে,—এ আপনি কি বলছেন! না—না—তার কাছে আমি আপনাকে এতখানি ছোট করতে পারবো না। আপনারা যদি নিতান্তই আমার এ ব্যবস্থা মেনে নিতে না পারেন, এখান থেকে আমাকে চলে যেতে হবে মেয়ে নিয়ে। এ ছাড়া আমার উপায় নাই।

একখানা কালবৈশাখীর বাজ হঠাৎ যেন ভেঙে পড়লো ভবেশবাবুর সামনে। হতচকিতের মত বলে উঠলেন,—কি বললে, কি বললে বাবাজীবন, মেয়ে নিয়ে চলে যাবে এখান থেকে! যাকে আমরা দীর্ঘ আঠারোটি বছর ধরে গায়ের রক্ত জল ক'রে এত বড়টি করলাম, তাকে তুমি ছোঁ মেরে কেড়ে নিয়ে যেতে চাও বিয়ের পিঁড়ি থেকে! এও তুমি মুখ ফুটে বলতে পারলে!

ক্ষোভে দুঃখে অসম্মানে, ভবেশবাবু যেন ভেঙে পড়লেন। শশীমুখী দেবী এগিয়ে এসে আর্দ্রকণ্ঠে বললেন,—চল—ও ঘরে গিয়ে বসবে চল, কথা বাড়িয়ে লাভ নাই। মেয়ের ভাল মন্দ বুঝবার অধিকার একমাত্র মেয়ের বাপের। তুমি আমি কি, কি আমরা করতে পারি তার জন্যে।

ভবেশবাবু অধৈর্য হয়ে বলে উঠলেন,—ওরে কে আছিস, শানাইটা গিয়ে বন্ধ ক'রে দিয়ে আয়, শিগ্‌গীর বন্ধ ক'রে দিয়ে আয়; এ বাড়ীতে ও শানাই আর বাজবে না।

শশীমুখী দেবীর বত্রিশ নাড়ীতে মোচড় দিয়ে উঠলো। অতি অসহায় ভাবে চোখের জল ফেলতে ফেলতে ভবেশবাবুকে ঘরের মধ্যে নিয়ে গিয়ে একটা সোফার উপরে বসিয়ে দিলেন।

ব্যোমকেশ ঠায় বসে রইলো চেয়ারের গায়ে হেলান দিয়ে, বারান্দার একপাশে। হঠাৎ যেন একটা বিপদের কালো-ছায়া ঘনিয়ে উঠলো চারিদিকে। কলমুখর বিয়ে-বাড়ী স্তব্ধ হয়ে গেল এক মুহূর্তে।

ব্যোমকেশের খুড়ীমা যোগমায়া দেবী এগিয়ে এলেন। ব্যোমকেশের পিঠের উপর হাত রেখে মৃদু কণ্ঠে বললেন,—এ নিয়ে আর পাগলামি করিস না, বাবা! এটা তোর ভুল হচ্ছে, বেশ মাথা ঠাণ্ডা ক'রে একটু ভেবে দেখ।

ব্যোমকেশ বললে,—তুমিও সেই কথাই বলছো, খুড়ীমা? কিন্তু ভুল আমি করি নি। আমার মেয়ের বিয়ের ব্যবস্থা পাকা হয়ে গেল এইখানে বসে, অথচ ঘুণাক্ষরে সে কথা আমি জানতেই পারলাম না। এ কেমন ক'রে হয় বল ত।

যোগমায়া দেবী আপতত প্রসঙ্গটা এইখানেই চেপে দিতে চাইলেন। বললেন,—থাক সে কথা, পরে হবে। এখন মুখ হাত ধুয়ে একটু কিছু মুখে দে দেখি। বিজয়কে সঙ্গে দিয়ে বাইরের ঘরে চা জল খাবার আমি পাঠিয়ে দিয়েছি। তুই বরং একটু খোঁজ-খবর নিয়ে আয়, ছেলেটির কোন অসুবিধা হচ্ছে কিনা। কিন্তু এসব কথা তাকে যেন এখন

শোনাস না। যতক্ষণ না এর একটা শেষ মীমাংসা হচ্ছে, কথাটা একটু চেপে যা।

ব্যোমকেশ বেরিয়ে গেল বাইরের দিকে। প্রমথেশ এসেই স্নানটা আগে চটপট সেরে ফেলেছে। বাইরের ঘরে চেয়ার টেবিলে বসে আরাম ক'রে চা খাচ্ছে।

বিয়ে-বাড়ী নিঝুম। স্থগিত রয়ে গেল গায়েহলুদের অনুষ্ঠান। ভবেশবাবুর সারা অন্তঃপুর প্রচণ্ড একটা আকস্মিকের ধাক্কায় হঠাৎ যেন আলোড়িত হয়ে উঠলো। তন্দ্রা গিয়ে ঘরের মধ্যে মুখ লুকিয়েছে। ঝাত্যাতাড়িত বেতস লতার মত থর থর ক'রে কাঁপছে তন্দ্রা। কাঁপছে তার সারা অন্তরখানা। তার ভবিতব্য নিয়ে এ কী এক নিষ্ঠুর খেলা শুরু করলে তার ভাগ্য বিধাতা। এর শেষ কোথায়, কে জানে এর কোথায় গিয়ে শেষ। একটা অবাঞ্ছিত সম্ভাব্যের দুঃসহ আশঙ্কা তন্দ্রার মনের মধ্যে যেন গুমরে ফিরতে লাগলো।

এ বাড়ীর চাপা গুঞ্জন কিছুক্ষণের মধ্যেই চকিতে একটা দমকা হাওয়ার মত ধাক্কা দিলে গিয়ে পাশের বাড়ীতে। মুহূর্তের মধ্যে রায়-বাড়ীর ভিতসুদ্ধ বুঝি দুলিয়ে দিয়ে গেল। কি যেন একটা গোলমাল বেধেছে, তন্দ্রার বিয়ের ব্যাপার নিয়ে। পুরোপুরি খবরটাই পাওয়া গেল ক্রমশ, ঝড় উঠেছে ভবেশবাবুর অন্তঃপুরে। আসাম থেকে নাকি হঠাৎ একটি পাত্র এসে হাজির। স্তম্ভিত হয়ে গেল স্বপন রায় সংবাদটা শুনে। এমনটা যে ঘটতে পারে, স্বপ্নেও ভাবতে পারে নি সে। কিন্তু আসলে যে ব্যাপারটা কি,—সঠিক খবর কি পাওয়া গেছে? এ যেন কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছে না স্বপন। তার মন বলছে আসতেই হবে তন্দ্রাকে এই বাড়ীর বধূ হয়ে। তন্দ্রা যে তার বাগ্‌দত্তা, না না তার চেয়েও বেশী, না এসে কি সে পারে। এর কোন ব্যতিক্রম যে কল্পনাও করতে পারে না স্বপন।

উপরের ঘরে একটা আর্মচেয়ারে হেলান দিয়ে বসে আছে স্বপন রায়, নিস্পন্দ নির্বাক। নিকুঞ্জ এসে সামনে দাঁড়ালো. চোখে মুখে তার রুদ্ধ একটা ঝড়ের সঙ্কেত। চাপা একটু উত্তেজিত কণ্ঠে বলে উঠলো নিকুঞ্জ—কনে-বাড়ীর খবর সব শুনলি ত, কর্তাবাবুর জামাই এসে বেঁকে বসেছেন। কি এখন করতে চাস?

ধীর কণ্ঠে জবাব দিলে স্বপন,—করবার ত কিছু নাই নিকুঞ্জদা. একমাত্র নীরবে অপেক্ষা করা ছাড়া।

নিকুঞ্জ বললে, কিন্তু বিয়ে যদি ওরা সত্যি সত্যি ভেঙ্গে দেয়।

তেমনি নির্লিপ্তভাবেই জবাব দিলে স্বপন.—ভেঙ্গেই যদি দেয়—যাবে ভেঙ্গে, তুমি আমি কি করতে পারি বল!

বিক্ষুব্ধ নিকুঞ্জ এবার ফেটে পড়লো রাগে,—এই কি একটা কথার মত কথা হলো খোকা! কি করতে পারি মানে! মাধবপুর মৌজার আড়াই কুড়ি লেঠেল রায়-বাড়ীর নামে আজো ওঠে বসে। কর্তাবাবুর জামাই এই নিয়ে যদি বেশী কিছু বাড়া-বাড়ি করতে যান, তা হলে কিন্তু একটাকাণ্ড না ঘটিয়ে নিকুঞ্জ রক্ষিত ক্ষান্ত হবে না, এ আমি তোকে বলে রাখলাম।

বাধা দিয়ে বললে স্বপন,—তা হয় না নিকুঞ্জ দা, এ তুমি কি বলছো! দাদুর এতে অসম্মান হবে যে।

পুনরায় বলে উঠলো নিকুঞ্জ,—কিন্তু রায়-বাড়ীর সম্মানটা সামলায় কে, বিয়ে যদি সত্যি সত্যি বন্ধ হয়ে যায়!

নিকুঞ্জকে আশ্বাস দিয়ে বললে স্বপন,—খুব সম্ভব তা হবে না, আমার দৃঢ় বিশ্বাস। এখনো ত ওঁরা আমাদের নিজের মুখে জবাব দেন নি।

—তা অবিশ্যি দেন নি। কিন্তু যে রকম গোলমেলে ব্যাপার শুনছি জবাব দিতে কতক্ষণ। মন্তব্য করলে নিকুঞ্জ।

স্বপন একটু হেসে বললে,—তাও কখনো হয়, মাঝখানে যে দাদু রয়েছেন। ও সব তুমি কিছু ভেবো না; সব কিছু ঠিক হয়ে যাবে, তুমি দেখে নিয়ো।

তাও হয়ত হতে পারে। নিকুঞ্জ কিন্তু পুরোপুরি আশ্বস্ত হতে পারলে না। স্বপনের স্তোকবাক্যে আপাতত একটু ঠাণ্ডা হলো মাত্র।

তন্দ্রার আজ অধিবাস। দেখতে দেখতে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলো। সদর ফটকের তোরণশীর্ষে আলো তবু জ্বললো না। বন্ধ হয়ে গেছে আলোকসজ্জা শানাই গেছে স্তব্ধ হয়ে। কারো মুখে এতটুকু হাসি নাই, নাই কোন আনন্দের সাড়া, কোথায় যেন উবে গেল বিয়ে-বাড়ীর সেই স্বতঃস্ফূর্ত প্রাণচাঞ্চল্য।

সকাল থেকেই বোঝাপড়া চলেছে ব্যোমকেশের সঙ্গে। হঠকারিতার বশবর্তী হয়ে সে যে কতবড় একটা বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে চলেছে, সে কথা তাকে বোঝানো হলো বহু প্রকারে। কারো কোন যুক্তিই কিন্তু মেনে নিতে পারছে না ব্যোমকেশ। সম্ভ্রান্ত বাড়ীর ছেলে প্রমথেশ, বিদ্যায় বুদ্ধিতে রূপে গুণে কোন দিক থেকেই তন্দ্রার সে অযোগ্য নয়। এমন একটি সৎপাত্র হাতে পেয়ে হাতছাড়া করতে রাজি নয় ব্যোমকেশ। বিয়ে যদি দিতে হয় তন্দ্রার, দিতে হবে প্রমথেশের সঙ্গে। তাকে অসম্মান ক'রে কিছুতেই ফিরিয়ে দেওয়া যায় না। একজন সুশিক্ষিত ভদ্রলোকের ছেলের সঙ্গে জোচ্চুরি করতে পারবে না ব্যোমকেশ। কন্যা সম্প্রদান করতেই হবে প্রমথেশের হাতে। তন্দ্রা কি এতে রাজি হবে না! সেও কি আজ ব্যোমকেশের উপর অকারণে বিরূপ হয়ে উঠলো বাড়ীর আর পাঁচজন শুভাকাঙ্ক্ষীর মতই। না—না—তা ত সে হতে পারে না, তন্দ্রা যে তার আত্মজা, হতভাগ্য ব্যোমকেশের একমাত্র মাতৃহারা সন্তান। ব্যোমকেশের এতবড় অসম্মান সে সইবে কেমন ক'রে।

তন্দ্রার মনের মধ্যে ঝড় বইছে। দুরু দুরু আশঙ্কায় কাঁপছে তার বুকখানা। সামনে পিছে দুকূলভাঙা তুফান, ঢেউয়ের পর ঢেউ এসে মাথা কুটছে পায়ের তলায়। কোন দিকে যে পা বাড়াবার ঠাঁই নাই। কোথায় যেন ভাসিয়ে নিয়ে যেতে চায় তন্দ্রাকে। কোন্ কূল ভেঙে কোথায় গিয়ে যে ঠেকবে তন্দ্রা—একমাত্র তার ভবিতব্যই জানে। কিন্তু করবার কি আছে তন্দ্রার, কতটুকু তার সাধ্য। বুকখানা যদি ফেটেও যায়, পারবে কি সে মুখ ফুটে তার মনের কথা জানাতে। বিদ্রোহ করবে নাকি তন্দ্রা? সেও কি তার পক্ষে সম্ভব!

ব্যোমকেশ অতি সন্তর্পনে চোরের মত ঢুকলো এসে তন্দ্রার ঘরে। তার পাশটিতে বসে অতি ধীর কণ্ঠে বললে,—একলাটি চুপচাপ বসে বসে কি ভাবছিস, মা!

তন্দ্রা মুখ চাইলে একটিবার ব্যোমকেশের দিকে, বললে,—কই, কিছুই ত ভাবি নি, বাবা!

ব্যোমকেশ তার ডান হাতখানা ধীরে ধীরে তন্দ্রার পিঠের উপর রেখে বললে,—আমি কি কোন অন্যায় করেছি, মা? তুই শুধু একবার মুখ ফুটে বল যে প্রমথেশের সঙ্গে তোর বিয়ের ঠিক ক'রে আমি কোন অন্যায় করি নি।

কি উত্তর দেবে তন্দ্রা! নিরবে শুধু মুখখানা নীচু ক'রে মাটির দিকে চেয়ে রইলো। ব্যোমকেশ পুনরায় বললে,—প্রমথেশের মত সুশিক্ষিত কর্মক্ষম ছেলে খুব কমই পাওয়া যায়। বহুকষ্টে আমি তাকে রাজি করেছি মা, এখন তোর যদি কোন আপত্তি না থাকে—এ শুভ কাজটুকু শেষ ক'রে দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত হতে চাই। খুলে বল তোর ইচ্ছেটা কি, লজ্জার কোন কারণ নাই, মা!

তন্দ্রা তবু নিরুত্তর। কি যেন একটা বলতে গিয়ে হঠাৎ যেন থেমে গেল। কে যেন তার কণ্ঠ চেপে ধরেছে। ব্যোমকেশ নিজেই আবার বলে উঠলো,—তুই যদি এটা নিতান্তই মেনে নিতে না পারিস, আর আমি কারো কাছে কোন অনুযোগ করবো না। রাত্রের অন্ধকারে মুখ লুকিয়ে এখান থেকে একেবারেই বিদেয় হয়ে যাব। দিনের আলোয় আর যেন আমাকে এ বাড়ীতে মুখ দেখাতে না হয়।

ব্যোমকেশের কণ্ঠস্বর কাঁপছে। তন্দ্রা যেন একটু চঞ্চল হয়ে উঠলো। পুণরায় ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলে উঠলো ব্যোমকেশ,—কিন্তু যে প্রচণ্ড আঘাত, যে অপরিমেয় অসম্মানের গ্লানি এখান থেকে আমি ব'য়ে নিয়ে যাব—তা সহ্য করবার মত শক্তি আমার নাই, সে যে আমি কিছুতেই সইতে পারবো না, মা!

একেবারে ভেঙ্গে পড়লো যে ব্যোমকেশ তার অসহায় আর্তকণ্ঠ তীরের মত যেন বিঁধতে লাগলো তন্দ্রাকে। উদ্বেল হয়ে উঠলো তন্দ্রা, করুণভাবে একটা ডাক দিলে,—বাবা!

ব্যোমকেশ ব্যথাহত কণ্ঠে আবার বলে চললো,—যেদিন থেকে তোর মাকে হারিয়েছি, সেদিন থেকেই আমার দুর্ভাগ্যের শুরু, সে দিন থেকেই আমি একা। এতবড় দুনিয়াটায় এমন কোন ঠাঁই নাই যেখানে গিয়ে একটুখানি বুকের জ্বালা জুড়োই, এমন কেউ নেই যার কাছ থেকে পেতে পারি এতটুকু সান্ত্বনা। এই ছন্নছাড়া জীবনের শেষ সম্বল, আমার একটুখানি মনের আশ্রয়, ছিলি শুধু তুই। কিন্তু তোকেও আজ আমার কাছ থেকে এরা এতখানি কেড়ে নিয়েছে, এতখানি পর ক'রে দিয়েছে, এ আমি জানতাম না, মা! একথা আমি ঘুণাক্ষরেও কোন দিন ভাবতে পারি নি।

বলতে বলতে ব্যোমকেশ যেন নেতিয়ে পড়লো অসহায় শিশুর মত। বহু সঞ্চিত চোখের জলের তপ্ত কয়েকটি ফোঁটা টস্ টস্ ক'রে ঝরে পড়লো দু'চোখ বেয়ে। লুটিয়ে পড়লো তন্দ্রা ব্যোমকেশের বুকের উপর, উদ্বেল কণ্ঠে বলে উঠলো,—আমার সামনে এমন ক'রে তুমি চোখের জল ফেলো না, বাবা!" কে বললে তুমি একা, কে বললে আমি তোমার পর হয়ে গেছি। ভুল—ভুল—মিথ্যে কথা, আমি যে তোমার সেই তন্নু, কোনদিন কি আমি তোমার পর হতে পারি বাবা!

তন্দ্রাকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ব্যোমকেশ যেন সঞ্জীবিত হয়ে উঠলো। কে বলে সে একা, একা ত সে নয়! তন্নু যে তার সমগ্র সত্ত্বা জুড়ে জেগে রয়েছে। জুড়িয়ে গেল ব্যোমকেশের বহুসঞ্চিত বুকের জ্বালা। এর বেশি আর চায় কি সে। দুনিয়ার যদি আর সকলে মুখ ফেরায়—কোন দুঃখ নাই ব্যোমকেশের, তন্নু ত তার আছে।

তন্দ্রাকে নতুন ক'রে পাওয়ার আনন্দে ব্যোমকেশ যেন বিহ্বল হয়ে পড়লো। কিন্তু সেইটাই কি যথেষ্ট, ছন্দহারা তন্দ্রার মনের গভীরে কোথায় যেন একটা কালবৈশাখীর ঝড় বয়ে চলেছে, সৃষ্টিছাড়া ব্যোমকেশের দৃষ্টি ত কই সেখান পর্যন্ত পৌঁছলো না।

অনেকখানি রাত হয়ে গেছে; অন্ধকারে মুখ ঢেকে পথে বেরুলেন ভবেশবাবু। যেতে হবে তাঁকে রায়-বাড়ী, যেতেই হবে একটিবার; যখন

হয়ত তাঁর পথ চেয়ে বসে আছে। তার সঙ্গে যে একটা শেষ বোঝাপড়া করতেই হবে ভবেশবাবুকে। পারে কি সে তন্দ্রাকে জোর ক'রে কেড়ে নিয়ে যেতে ভবেশবাবুর অন্তঃপুর থেকে? কিম্বা চুরি ক'রে? হ্যাঁ— দরকার হলে চুরি ক'রে, এর চেয়ে সেও যে অনেক ভাল। কিন্তু শালীনতায় বাধে যে, মুখ ফেরাবে সভ্যসমাজ, পন্থাটি তাই অচল। তাহলে কি তাদের অন্তরের গভীরতম সত্য এক মুহূর্তে মিথ্যে হয়ে যাবে, মিথ্যে একটা অবাঞ্ছিত আকস্মিকের চাপে। আর সেই মিথ্যের কাছে মাথা নোয়াতে হবে ভবেশবাবুকে! এ হয় না, কিছুতেই হয় না।

রায়-বাড়ীর সদর দোরে গিয়ে কড়া নাড়লেন ভবেশবাবু। মৃদুকণ্ঠে ডাক দিলেন,—নিকুঞ্জ—নিকুঞ্জ, দোরটা একটু খুলে দে বাবা!

ভিতর থেকে তাড়াতাড়ি বলে উঠলো স্বপন,—নিকুঞ্জদা, ও বাড়ীর দাদু এসেছেন, যাও—যাও—দরজাটা খুলে দাও শিগ্‌গীর।

ভবেশবাবু বাড়ী ঢুকেই ভিতর দিক থেকে দরজাটা আবার বন্ধ ক'রে দিলেন।

—পনের—

ওঁ পুণ্যাহং, ওঁ পুণ্যাহং, ওঁ পুণ্যাহম্।

আজকের এই শুভদিনটি সার্থক হোক বরবধূর জীবনে। ধন্য হোক এই মিলনোৎসব রাত্রি। ধন্য হোক এ পুণ্যলগ্ন, পুণ্য দিবস। ওঁ পুণ্যাহম্।

ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি।

মঙ্গল সূচিত হোক নবদম্পতির জীবনে। কল্যাণের দেবতা এঁদের আশীর্বাদ করুন। ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি।

ফাল্গুনী কৃষ্ণা তিথির তন্দ্রাহারা নিশীথিনী জেগে আছে পাদ্য-অর্ঘ্য মধুপর্ক সাজিয়ে। সুন্দরের সাড়া জেগেছে দিকে দিকে, ফুলে, ফুলে, লতায় পাতায়। ছোঁয়া এসে লেগেছে তার ধরিত্রীর দুরু দুরু বক্ষে।

মনে মনে প্রাণে প্রাণে তারই যে আজ আবাহন। বাসন্তী বীথিকা ফুল দিয়ে কার বাসর সাজাচ্ছে। অর্ঘ্য দিলো সে নব মিথুনের মিলন-মাল্য। মিলনোন্মুখ অধীর প্রতীক্ষায় কে যেন কার পথ চেয়ে আজ বসে আছে।

সময় হলো আবাহনের। অর্চনা করতে হবে সম্প্রদাতাকে গন্ধ পুষ্প অঙ্গুরীয় যজ্ঞোপবীত নব বস্ত্রে।

—'এতানি গন্ধপুষ্প বাসাংসি ওঁ বরায় নমঃ।'

—'ওঁ স্বস্তি।'

অর্চনা করতে হবে পাদ্য-অর্ঘ্য মধুপর্ক দিয়ে।

—'ওঁ প্রতিগৃহ্যতাম্। ওঁ প্রতিগৃহ্যতাম্। ওঁ প্রতিগৃহ্যতাম্'।

ধূপ-দীপ মাল্য-চন্দন পত্র-পুষ্প খচিত বরাঙ্গনা পরিবেষ্টিত সুসজ্জিত বিবাহমণ্ডপ। সম্মুখে সিংহাসনে নারায়ণ শীলা। এগিয়ে চললো কন্যা-সম্প্রদান অনুষ্ঠান। শাণ্ডিল্য-গোত্রীয় শাণ্ডিল্যাসিত দেবল প্রবরজ শ্রীব্যোমকেশ দেবশর্মা সম্প্রদান করলেন তাঁর কন্যারত্নকে সর্বগুণ-সমন্বিত আকাঙ্খিত যোগ্য পাত্রের হাতে।

—'শ্রীবিষ্ণু দৈবতং ভরদ্বাজ গোত্রায় ভরদ্বাজাঙ্গিরসবার্হস্পত প্রবরায় শ্রীপ্রমথেশ দেবশর্মনে বরায় তুভ্যমহং সম্প্রদদে।'

বরাসনে প্রমথেশ। হ্যাঁ—তারই হাতে সম্প্রদান করা হলো তন্দ্রাকে। অন্তর্যামী সাক্ষী ক'রে এ প্রতিগ্রহ স্বীকার করলো প্রমথেশ,—'ওঁ স্বস্তি'।

বস্ত্র-যবনিকার অন্তরালে এই রহস্যঘন মিলন-মুহূর্তে তন্দ্রা হঠাৎ থর থর ক'রে কাঁপছে কেন। শুভদৃষ্টির শুভলগ্ন যে বয়ে যায়। মালা বদল করতে হবে যে এবার তন্দ্রাকে। সোহাগ-ডোরে গাঁথা স্বপ্ন দিয়ে গড়া বহুযত্নে রচিত ওই বরমাল্যখানি নিজের হাতে তাকে দুলিয়ে দিতে হবে প্রমথেশের গলায়।

কম্পিত হাত দু'খানা ধীরে ধীরে সামনের দিকে বাড়িয়ে দিলে তন্দ্রা। ঠিক সেই মুহূর্তে অপর একগাছি মালা এসে কণ্ঠলগ্ন হলো তন্দ্রার। বরণ ক'রে নিলে ওরা পরস্পরকে। স্বীকৃত হ'য়ে গেল জীবনের অচ্ছেদ্য বন্ধন। সাক্ষী এর নারায়ণ শীলা। সাক্ষী রইলো কৃষ্ণপক্ষের ত্রয়োদশী তিথি। মনে মনে সাক্ষী রইলো স্বপ্নবিভোল দুরু দুরু দু'টি কম্পিত হৃদয়।

'ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ তৎসবিতুর্বরেণ্যং'—

হুলুধ্বনি ও শঙ্খধ্বনি সহকারে বরের উত্তরীয়-প্রান্তে বাঁধা পড়লো নববধূর পরিধেয় বস্ত্রাঞ্চল।

—'ওঁ দূর্বাপুষ্পং ফলঞ্চৈব বস্ত্রং তাম্বূলমেব চ।

এভিঃ কন্যা ময়া দত্তা, রক্ষণং পোষণং কুরু।'

কন্যার যাবতীয় দায়িত্বভার গ্রহীতার উপর ন্যস্ত ক'রে নিশ্চিন্ত হলো সম্প্রদাতা। 'রক্ষণং পোষণং কুরু'। রক্ষণ ও পোষণের ভার সে গ্রহণ করেছে। করতেই হবে গ্রহণ, দুইয়ের মধ্যে গ্রন্থি পড়ে গেল যে। এ তো শুধু বস্ত্রখণ্ডে গাঁটছড়া বাঁধা নয়, জীবনের সঙ্গে বাঁধা পড়লো জীবন। 'ওঁ কয়োগ্রর্ন্থি পততি'? 'ওঁ লক্ষীনারায়ণয়োঃ'। 'ওঁ কয়োগ্রন্থি পততি?' 'ওঁ নলদময়ন্তোঃ'। 'ওঁ কয়োগ্রর্ন্থি পততি'? 'ওঁ শ্রীপ্রমথেশ দেবশর্মণ—শ্রীতন্দ্রাদেব্যোঃ'।

এ বন্ধন যে ইহজীবনে আর শিথিল হবার নয়।

পাণিগ্রহণ মন্ত্রে প্রার্থনা জানালে প্রথমেশ—

—'ওঁ মম ব্রতে তে হৃদয়ং দধাতু,

মম চিত্তমনুচিত্তং তে অস্তু'।

পুনশ্চ উদ্ধৃত হলো উদাত্ত কণ্ঠে—

—'ওঁ যদেতৎ হৃদয়ং তব, তদস্তু হৃদয়ং মম।

যদিদং হৃদয়ং মম, তদস্তু হৃদয়ং তব'॥

আজ থেকে এ দু'টি হৃদয় মিলে মিশে এক হয়ে যাক। হে বধূ, তোমার ওই হৃদয়খানি যে আমার একমাত্র প্রার্থনা—'যদেতৎ হৃদয়ং তব তদস্তু হৃদয়ং মম'। তোমার দাক্ষিণ্যে হৃদয় আমার কানায় কানায় ভরে উঠুক।

দ্যুলোক ভূলোক অন্তরীক্ষ কান পেতে আছে। আকাশের তারায় তারায় বুঝি গুঞ্জন উঠলো। আর্যঋষির এ বৈদিক মন্ত্র এদের জীবনে সার্থক হোক।

মন্ত্রপাঠ করছে প্রমথেশ—

—'ওঁ ধ্রুবা দ্যৌঃ ধ্রুবা পৃথিবী ধ্রুবং বিশ্বমিদং জগৎ।

ধ্রুবাসঃ পর্বতা ইমে ধ্রুবা স্ত্রী পতিকূলে ইয়ম্'।

পতিকুলে এর অবাস্থিতি ধ্রুব নক্ষত্রের মত স্থির। দ্যুতি এর চির অম্লান!

সমাপ্তি হোমান্তে মঙ্গল সিন্দুর চূর্ণ কন্যার ললাটদেশে এঁকে দিলে নবারুণ লাঞ্ছন তিলক। অবগুণ্ঠনে ঢাকা পড়ে গেল সীমন্তিনী তন্দ্রার মুখচন্দ্রখানি।

দূরের পথ আসাম মুলুকে আর ফিরে যাওয়া হলো না। দাদুর বাড়ীতে ফুলশয্যা তন্দ্রার। সেই ব্যবস্থাই করা হয়েছে।

ফুলশয্যার রাত্রি। বরবধূর মিলন তিথি। নিবিড় ক'রে কাছে পাওয়া মন দেওয়া নেওয়ার পালা বুঝি শুরু হলো আজ থেকে। তন্দ্রাকে তাই মনের মত ক'রে সাজিয়ে দিয়েছে ওরা বাসকসজ্জায়। পুতুল খেলা শুরু হলো নাকি তন্দ্রার জীবনে। তন্দ্রা কি একটা প্রাণহীন জড় পদার্থ! না—না—আজ যে তার ফুলশয্যা। এর চেয়ে প্রাণচঞ্চল সজীব মুহূর্তে তন্দ্রার জীবনে আর কোন দিন এসেছে কি! তন্দ্রার যে খুশী না হয়ে উপায় নাই।

রাত জেগে বসে আছে তন্দ্রা। কেউ কোথাও আড়ি পেতে আছে নাকি! না—চলে গেছে, অনেকক্ষণ আগেই। ছিল এতক্ষণ অনেকেই। মেয়েরা এসে হৈ-হুল্লোড় ক'রে গেল মনের আনন্দে। গান গাইলো নমিতা, সেতার বাজালো দীপ্তি বৌদি, স্বপ্না এসে নূপুর পায়ে নেচে গেল। বাসর ঘরে জলসা সেদিন বেশ জমতে পারে নি, তাই ফুলশয্যার প্রথম আসরে সাধ খানিকটা মিটিয়ে গেল মেয়েরা। রঙ্গ-রস জমিয়ে গেল নতুন বরের সঙ্গে। খুশী হয়েছে প্রমথেশ। তন্দ্রাকেও সে গাইতে বললে একখানা। সে কিন্তু আর হয়ে উঠলো না। অন্যান্য মেয়েরাই আসর জমিয়ে ফেললে। নাচ গান শেষ ক'রে উঠেও গেল সব একে একে, কিছুক্ষণের মধ্যেই। ফুলশয্যার রাত্রি যে, বরবধূর আলাপ জমবে; তাই তাদের একটু সকাল সকাল অবকাশ দেওয়া হলো। কিন্তু গেল কোথায় সব দল বেঁধে! চোখে চোখে ইশারা, ঠোঁটের কোণে মুচকি হাসি, তন্দ্রার দিকে আড়চোখে চেয়ে চেয়ে এ ওর গায়ে ঢলে পড়লো যেন। প্রাণখোলা খুশির চোটে ওরাও যে আজ কামায় কামায় উথলে উঠেছে। কত কি সব রসের

কথা শুনিয়ে গেল। তন্দ্রার মনের খুশির ছোঁয়াচ ওদের মনেও রঙ ধরালো নাকি! •

কিন্তু সত্যি সত্যি কি চলে গেল ওরা। গেল হয়ত কেউ কেউ, বাকিরা সব ঘুর ঘুর করছে আশে পাশে। মেয়েরা আজ আড়ি পাতবে। ধরা পড়ে গেল দু' একটা তন্দ্রার কাছে। বলে গেল,—'এবার কিন্তু সত্যি সত্যি চললাম, ভয়ানক ঘুম পেয়ে গেছে কিনা।' তাই হয়ত হবে। তন্দ্রা কিন্তু সজাগ রইলো, জানলা দরজা ফাঁক ক'রে উঁকি-ঝুঁকি না মেরে কি ছাড়বে ওরা। আড়ি ওরা পাতবেই। তা পাড়ুক না, তন্দ্রার এত ভয়টা কিসের। আড়ি পেতে কেউ যদি একটু আনন্দ পায়, ক্ষতি কি। তন্দ্রাকেও যে আজ ঘোমটা দিয়ে আড়ি পেতে পালঙ্কের উপর চুপটি ক'রে বসে থাকতে হবে, যতক্ষণ না বর তার ঘোমটা খুলে আগে থেকে কথা কইছে। কি কথা সে বলবে, কি বলে যে সম্বোধন করবে সে আজ তন্দ্রাকে, কে জানে। বলবে হয়ত 'প্রিয়তমে,' কিম্বা হয়ত 'ওগো বধূ সুন্দরী', নাকি শুধু—'ওগো শুনছো'! যা হোক কিছু একটা বলবে, খারাপ কিছু বলবে না সে, সুশিক্ষিত বিদ্বান লোক যে। তন্দ্রাকে এবার একলাটি পেয়ে চুম্বন করবে নাকি প্রমথেশ! ঘোমটা খুলে সর্বপ্রথম পান করবে নাকি তার অধরামৃত! কে জানে, কি যে সে করবে। কিন্তু ওরা যদি কেউ দেখে ফেলে। কি সর্বনাশ, ওরা এখনো জেগে আছে নাকি!

এদিক ওদিক তাকালো একবার তন্দ্রা। দরজাটা বন্ধ আছে তো। ঘোমটার ফাঁকে চাইলে একটুখানি পালঙ্কের দিকে। একি, প্রমথেশ যে হাত পা ছড়িয়ে আরাম ক'রে শুয়ে পড়েছে। ঘুমিয়ে পড়লো নাকি? হ্যাঁ—ঘুমিয়ে পড়েছে, নিঃসাড়ে ঘুমিয়ে পড়েছে প্রমথেশ, পাশ বালিশে একটা পা চাপিয়ে। কি আশ্চর্য, ফুলশয্যার রাত্রে বধূর সঙ্গে দু'টো প্রেমালাপ না ক'রে এমনধারা কেউ সাততাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়তে পারে নাকি! অদ্ভুত লোক ত!

তন্দ্রা কি মনে মনে একটু অপ্রসন্ন হয়ে উঠলো! একটুখানি যেন কেমন ঠেকছে। কে জানে, উঠোউঠি কয়েকটা রাত জেগে ভদ্রলোক হয়ত

অতিশয় ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। আহা ঘুমোক, এই বেলা ঘুমিয়ে নিক একটুখানি।

পালঙ্কের পাশে লতাপাতা ফুল দিয়ে সাজানো কুশন চেয়ারটায় বসে বসে তন্দ্রা কিন্তু অস্বস্তি বোধ করতে লাগলো। বার থেকে কেউ উঁকি মেরে দেখে যদি। দেখতে পাবে তন্দ্রার বর এই ফুলশয্যার রাত্রে বধূর সঙ্গে আলাপ না ক'রে বেহুঁস হয়ে ঘুমুচ্ছে। কি ওরা ভাববে! ভাববে হয়ত আড়ি হ'য়ে গেল, কিম্বা হয়ত ভেবে নেবে বরের বুঝি বৌ পছন্দ হয় নি। তাই নিয়ে একটা গুঞ্জন ওঠে যদি। সে যে বড় লজ্জার কথা হবে। না—না —এ ভাবে হঠাৎ ঘুমিয়ে পড়াটা ভদ্রলোকের উচিত হয়নি, অন্তত আরো খানিকক্ষণ জেগে থাকা দরকার ছিলো। এই নিয়ে একটা কথা হলে তন্দ্রা যে লজ্জায় মরে যাবে।

ধীরে ধীরে চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লো তন্দ্রা। দোর জানালা একটু ফাঁক ক'রে এদিক ওদিক দেঁখে নিলে কেউ কোথাও উঁকি-ঝুঁকি মারছে কিনা। চোখে কিন্তু পড়লো না কেউ। পা টিপে টিপে আবার ফিরে এসে দাঁড়ালো পালঙ্কের এক পাশে। প্রমথেশ অঘোরে ঘুমুচ্ছে। শুনতে ত বেশ ভাল নয় কথাটা। এখন যা হোক কিছু একটা করা দরকার যে তন্দ্রার, অন্য কারো চোখে এ দৃশ্যটি পড়বার আগেই। পালঙ্কের ওপর একটু ঝুঁকে পড়ে প্রমথেশের কানের কাছে মৃদু কণ্ঠে একটা ডাক দিলে তন্দ্রা,—শুনছেন, দেখুন —বলি শুনছেন?

কে শুনবে। শুনবার মত অবস্থা নাই কারো। তন্দ্রা তবু চাপা গলায় তাকে শোনাবার চেষ্টা করতে লাগলো,—বলি শুনছেন, দয়া করে একটু উঠুন না। শুনতে পাচ্ছেন!

প্রমথেশের ঘুম কি একটু ফিকে হয়ে এলো। তাড়াতাড়ি আবার বলে উঠলো তন্দ্রা,—আপনি আমার গান শুনতে চেয়েছিলেন, শুনবেন এখন? গাইবো নাকি একটা?

একটা কেন, ইচ্ছে করলে ডজনখানেক গান তন্দ্রা গাইতে পারে অনায়াসে। বাধা দেবে কে, অন্তত এ ঘরের মধ্যে আপাতত তেমন কারো

গরজ দেখা যাচ্ছে না। পালঙ্কের উপর আরাম করছেন মহাতপা কুম্ভকর্ণের ভাগ্যবান এক উত্তরসাধক। মানুষ বুঝি ভাঙ-ধুতরো খেয়েও এত ঘুমোয় না। যাক, এ এক রকম ভালই হয়েছে, তন্দ্রার আর কোন দুশ্চিন্তার কারণ রইলো না।

তন্দ্রা কি এবার আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়বে। পালঙ্কের এক পাশে জায়গা আছে অনেকখানি, এক কোণে মুখ গুঁজে পড়ে থাকলে কেউ টেরও পাবে না। কিম্বা এই কুশন চেয়ারে বসে বসে সারাটা রাত জেগেও তো আজ কাটিয়ে দিতে পারে তন্দ্রা। ঘুম পেলে হাতলের উপর মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়তেও কোন অসুবিধা নাই! কিন্তু ভোরের দিকে ওঁর যদি আগে ঘুম ভেঙ্গে যায়। দেখবেন ত, দেখবেন তাঁর প্রিয়তমা বধূ তাঁর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে নিদ্রাদেবীর আরাধনা করছে কুশন চেয়ারে হেলান দিয়ে। যদি রাগ করেন ভদ্রলোক!

ভদ্রলোক! কে ভদ্রলোক! বাইরের তো কেউ নন ইনি, তন্দ্রার যে স্বামী। আজকের এই ফুলশয্যার নায়ক। শুধু নায়ক কেন—বিজয়ী বীর, তন্দ্রাকে জয় করেছেন। তন্দ্রা যে, তাঁর সেবিকা, চরণের দাসী। না—না—দাসী কেন, তাঁর হৃদয়রাজ্যে রাণীর আসন পাতা আছে যে তন্দ্রার জন্যে। সে মর্যাদার অসম্মান করবে কেমন ক'রে তন্দ্রা! সে হয় না, ওই পালঙ্কই যে আজ থেকে তার একমাত্র আশ্রয়। শয্যা গ্রহণ করতে হবে তাকে ওখানেই।

তন্দ্রার মুখখানা কি লজ্জায় রেঙে উঠলো! বুকখানা কাঁপছে কেন দুরু দুরু ক'রে। তন্দ্রার এত আশঙ্কাটা কিসের। না—না—এ কম্পন নয়, নূপুর বাজছে; তন্দ্রার মনের মধ্যে। তারই বুঝি রুমুঝুমু গুঞ্জন তন্দ্রাকে একটু দুলিয়ে দিয়ে গেল। কে যেন এসে কানের কাছে সাড়া দিয়ে গেল না, —বধূ জাগো—বধূ জাগো! ফুলশয্যার নিশুতি রাত আড়াল থেকে কথা কইছে নাকি! হাতের লোহা কঙ্কন আর সীমন্তের সিন্দুর—এরাই কি আজ ঠেলা দিয়ে জাগিয়ে দিয়ে গেল তন্দ্রাকে,—বধূ জাগো! বধূকে যে জাগতেই হবে, আজ যে তার বধূত্বের উদ্বোধন উৎসব।

বাইরের দিকে কিসের যেন একটা শব্দ হলো না ! নিজের মনেই হঠাৎ যেন চমকে উঠলো তন্দ্রা। পা টিপে টিপে এগিয়ে গেল। দরজাটা একটু ফাঁক ক'রে উঁকি মেরে দেখে নিলে। কেউ কোথাও জেগে নাই, চারিদিক নিস্তব্ধ। দোর বন্ধ ক'রে ফিরলো আবার তন্দ্রা ? দু'এক পা এগিয়ে এসেই অস্ফুটস্বরে বলে উঠল,—কে ?

কোথায় কে, কেউ না ; নিজেরই ছায়া।

ড্রেসিং টেবিলের আয়নার মধ্যে ছায়া পড়েছে তন্দ্রার। তাই দেখে সে চমকে উঠেছে। কি আশ্চর্য, এমন ভুল কেউ করে ! থমকে একটু দাঁড়ালো তন্দ্রা। অবাক হয়ে গেল আয়নায় তার নিজের ছবি দেখে। একি তার অপরূপ সাজসজ্জা। ফুলের মুকুট, ফুলের গহনা, ফুলের মালায় ঢেকে দিয়েছে তন্দ্রাকে। সেই সঙ্গে সোনা দানা হীরে মণি মুক্তা, ঝলমল করছে পা থেকে মাথা পর্যন্ত। সাজতেই হবে তন্দ্রাকে, এই রূপযৌবন আর আর সাজসজ্জার চমক দিয়ে আর একজনের মনোহরণ করতে হবে যে তাকে। তাই ত আজ এই অনঙ্গজয়ী অভিসারিকার বেশ। ঘুম থেকে ভদ্রলোককে একবার জাগালে হতো না ! তন্দ্রার দিকে দু'চোখ ভরে চেয়ে একটিবার দেখুন ত, চেয়ে দেখুন কে এক অপূর্ব এক মায়ামৃগী অন্ধকারে পথভ্রষ্ট হয়ে তার রেশমী সুতোর জালে এসে রাতারাতি কখন আটকা পড়ে গেছে। তা পড়ুক, ওঁর বৌ পছন্দ হয়েছে ত !

এগিয়ে চললো তন্দ্রা পালঙ্কের দিকে। থমকে একটু দাঁড়ালো। দক্ষিণ দিকের জানালাটা খোলা কেন ! কি ঘুরঘুটি অন্ধকার বাইরের দিকটায়। আকাশের তারাগুলো মিটিমিটি জলছে। ওরাও কি আজ আড়ি পেতে বসে আছে নাকি। মুখটিপে হাসছে যেন তন্দ্রার দিকে চেয়ে। চারিদিক নিস্তব্ধ। জেগে আছে শুধু নিশুতি রাত। অন্ধকারের বুকচিরে একফালি বিজলি বাতির আলো দূর থেকে এমন করুণ ভাবে এদিক পানে চেয়ে আছে কেন ! কিসের আলো ওটা ?

নিজের মনেই হঠাৎ যেন একবার চমকে উঠলো তন্দ্রা। আলো জলছে রায়-বাড়ীর দোতলার ঘরে। ঈষৎ উন্মুক্ত জানালার ফাঁক দিয়ে বোবা

একটা বুকচাপা আলোর উচ্ছ্বাস হত বিস্ময়ে অবাক হয়ে চেয়ে আছে যেন আকাশের দিকে উদাস একটা দৃষ্টি মেলে। কবি কি এখনো রাত জেগে কবিতা লিখছে? নতুন কোন 'অতনুর অভিশাপ', নাকি কোন 'নব মেঘদূত'! আলোটা কিন্তু দেখতে দেখতে ম্লান হয়ে গেল, অতিশয় করুণ ঠেকছে তন্দ্রার চোঁখে।

তাড়াতাড়ি দক্ষিণ দিকের জানালাটা বন্ধ করে দিলে তন্দ্রা। তার নিজের ঘরে স্পর্ধিত রঙিন আলোর চোখ-ধাঁধানো এ ঝলকানি কেন! এত আলো, এত ফুল, এত আয়োজন, এ সবই যেন আজ বাড়াবাড়ি বলে মনে হচ্ছে তন্দ্রার। দেবে নাকি তন্দ্রা আলো সবগুলো একসঙ্গে নিবিয়ে। প্রমথেশ ঘুমুচ্ছে, আলোর ত কোন দরকার নাই।

তাড়াতাড়ি আলোর সুইচ অফ করে দিলে তন্দ্রা। টলতে টলতে গিয়ে কুশন চেয়ারের উপর ধপ্ ক'রে বসে পড়লো, অন্ধকারে মুখ লুকিয়ে।

হলো কি হঠাৎ তন্দ্রার।

রাত বুঝি গভীর হয়ে এলো। তন্দ্রার আর করবার কিছু নাই। এবার চুপচাপ গিয়ে পালঙ্কের একপাশে শুয়ে পড়তে হবে। শুধু একটা কথা বারে বারে ঘুরপাক খেতে লাগলো তন্দ্রার মনের মধ্যে। কাজ যে একটু বাকি রয়ে গেল। এই ফুলশয্যার পালঙ্কের উপর রক্তমাংসের এই দেহখানা লুটিয়ে দেবার আগে কঠোর সে কর্তব্যটুকু কোন রকমে শেষ ক'রে দেওয়া যায় না! বিয়ের রাত্রে মন্ত্র পড়ে বরের সঙ্গে মালা বদল করেছে তন্দ্রা। সে মালার পবিত্রতা ক্ষুণ্ণ করবে সে কেমন ক'রে। সে ত হয় না, দ্বিচারিণী ত হতে পারবে না তন্দ্রা। কাজটুকু আজ শেষ ক'রে ফেলতেই হবে।

সুইচ টিপে আলো জ্বাললে। কোণের একটা আলমারির দেরাজ থেকে বের করলে একটা কাগজের মোড়ক। মোড়কটা অতি সন্তর্পনে খুলে ফেললে তন্দ্রা, শুকনো একগাছি মালা। পরম যত্নে রঙিন কাগজে মুড়ে দেরাজের মধ্যে চাবি দিয়ে তুলে রেখেছিল তন্দ্রা। আজ কিন্তু এর প্রয়োজন শেষ হয়ে গেছে। যখের ধনের মত বুক দিয়ে একে আঁকড়ে ধরে চেপে রাখবার আজ আর কোন অধিকার নাই তন্দ্রার। এটা ফিরিয়ে দিতে হবে।

যেতেই হবে তার কাছে একটিবার।' আর কিন্তু দেরি নয়, এই মুহূর্তে। তন্দ্রার যে ফুলশয্যার লগ্ন বয়ে যায়। চারিদিক নিঝুম হয়ে গেছে, ঘুমের কোলে ঢলে পড়েছে উৎসব-ক্লান্ত পুরী। এমন সুযোগ হয়ত আর না-ও আসতে পারে। তন্দ্রাকে বেরুতেই হবে।

শুকনো মালার মোড়কটা চেলির আঁচলে তাড়াতাড়ি বেঁধে ফেললে তন্দ্রা। তাকালে একটিবার পালঙ্কের দিকে। ঠিক আছে, সবই ঠিক আছে, সৌভাগ্য তন্দ্রার। সুইচ টিপে দিলে। অন্ধকারে আবার ঢাকা পড়ে গেল নব দম্পতির শয়ন কক্ষ। এগিয়ে চললো তন্দ্রা বুকখানা দুর দুর ক'রে কাঁপছে। সিঁড়ি বেয়ে নীচে নামলো। উঠানের এক কোণে হাই পাওয়ারের একটা বাতি জ্বলছে। বাঁ-হাতি মোড় ফিরে চোরের মত গিয়ে উঠলো তন্দ্রা খিড়কির দরজায়। বেরিয়ে গেল দোর খুলে।

মুক্ত আকাশের নীচে দাঁড়িয়ে তন্দ্রা যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচলো। নিকষ কালো রাত্রি-জননী অন্ধকারের ওড়না ঢাকা দিয়ে ধরিত্রীকে যেন বুকের কাছে ঘুম পাড়িয়ে রেখেছে। জেগে আছে শুধু তন্দ্রা। পাশের বাড়ীর দোতলার ছিটকে পড়া একফালি আলো তন্দ্রাকে যে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। এ কি নিশির ডাক! তন্দ্রাকে কিন্তু যেতেই হবে। ও বাড়ীর সদর দরজা বন্ধ হয়ে গেছে। তন্দ্রাকে তাই যেতে হবে অন্য পথ ধরে। যে পথ দিয়ে কেউ কোন দিন যায় নি, আর হয়ত কেউ কোনদিন যাবে না। ভয় পেয়ে পিছিয়ে গেলে ত চলবে না তন্দ্রার।

রায়-বাড়ীর সীমান্তে প্রাচীর বেষ্টনী। হাত বাড়িয়ে শক্ত ক'রে চেপে ধরে কোন রকমে পাঁচিলের ওপর উঠে পড়লো তন্দ্রা। ঝুপ ক'রে লাফিয়ে পড়লো নীচের দিকে। বুকখানা দুলে উঠলো, হাত পা গুলো থর থর ক'রে কাঁপছে। জোর ক'রে নিজেকে আবার কোন রকমে সামলে নিলে তন্দ্রা। আর খানিকটা এগোতেই হবে। সবুজ ঘাসের মাঠটুকু পার হয়ে আর একটা উঁচু দেওয়াল। এবার কিন্তু হাত বাড়িয়ে নাগাল পাওয়া যাবে না। তা হোক, তার ব্যবস্থাও আছে, আটকাবে না তন্দ্রার। পাঁচিলের এক কোণে ওই বাতাবি লেবুর গাছটা অন্ধকারে চোখ বুজেও যে দেখতে

পাচ্ছে তন্দ্রা। কতদিন গাছে উঠে নিজের হাতে বাতাবি লেবু পেড়ে নিয়ে গেছে। তারই একটা ডাল গিয়ে ঠেকেছে পাঁচিলের উপর। সেখান থেকে পা বাড়িয়ে বকুল গাছের নীচের ডালটা নাগাল পাওয়া যায়। সেই পথ দিয়ে নেমে গেল তন্দ্রা। ঠেকলো এসে রায়-বাড়ীর অন্দর মহলের মাটিতে। তন্দ্রা এবার ধরা পড়ে যাবে নাকি, কেউ যদি কোথাও জেগে থাকে!

জেগে নাই কেউ। রায়-বাড়ী নিঝুম। বারান্দার উপর উঠে গিয়ে সিঁড়ির দোরটায় ঈষৎ একটু ঠেলা দিলে তন্দ্রা। খুলে গেল সঙ্গে সঙ্গে, ঠেসানোই ছিলো। ভিতর দিক থেকে ছিটকিনিটা তাড়াতাড়ি এঁটে দিলে। সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেল দ্রুত। কিন্তু কয়েক পা গিয়েই ধপ্ ক'রে বসে পড়লো। তন্দ্রা বুঝি ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। আড়ষ্ট হয়ে আসছে যেন হাত-পা গুলো। এইখানে এই সিঁড়ির উপর একটু বিশ্রাম ক'রে নেবে নাকি, মুখোমুখি দেখা হওয়ার আগে। মানসিক প্রস্তুতির জন্য একটুখানি যে অবকাশ দরকার। কিন্তু সময় কোথায়, এক্ষুনি যে ফিরে যেতে হবে তন্দ্রাকে। ধড়মড়িয়ে উঠে পড়লো। দ্বিতলের বারান্দায় পা রাখলে তন্দ্রা। স্বপন রায়ের শয়নকক্ষ উন্মুক্ত। শয্যা কিন্তু খালি পড়ে আছে। পাশেই একটা আর্ম-চেয়ারে হেলান দিয়ে চোখ বুজে কি ভাবছে, যেন ধ্যানমগ্ন স্বপন রায়। ঘুমিয়ে গেছে নাকি!

দরজাটা ধীরে ধীরে ঠেসিয়ে দিলে তন্দ্রা। চাপা গলায় একটা ডাক দিলে, —স্বপনদা!

—কে?

চমকে উঠলো স্বপন। ঠোঁটের উপর আঙ্গুল দিয়ে তাড়াতাড়ি বলে উঠলো তন্দ্রা, চুপ।

কবি স্বপন রায় কি জেগে জেগে স্বপ্ন দেখছে। এই নিস্তব্ধ নিশুতি রাত্রে এমন ক'রে কে হঠাৎ তার সামনে এসে দাঁড়ালো। পুষ্প আভরণময়ী নীলোৎপল-বসনা সালঙ্কারা সীমন্তিনী কে এই অপরূপ চিত্রপটখানি! এ যে শ্যামসুখ-সোহাগিনী অভিসারিকা রাধিকার বেশ।

বিস্ময়-বিমূঢ় স্বপন হতচকিতের মত বলে উঠলো,—একি, তুমি হঠাৎ এখানে !

তন্দ্রা জবাব দিলে,—একটিবার আসতে হলো, না এসে আমার উপায় ছিলো না। কেমন ক'রে এখানে এলাম তাই ভাবছো! সে ভাবনা আমার। যে পথ দিয়ে যেমন ক'রে এসেছি, ঠিক তেমনি ক'রেই চলে যাব আমি। তোমার কোন চিন্তা নাই। কিন্তু এতখানি রাত হলো, তুমি যে এখনো শোও নি স্বপনদা, রাত জেগে বসে আছ কেন ?

এ প্রশ্নের কি উত্তর দেবে স্বপন। থাক সে সব কথা। কিন্তু এ কি অদ্ভুত খেয়াল তন্দ্রার! এতখানি দায়িত্বের বোঝা ঘাড়ে নিয়ে এই অসময়ে স্বপন রায়ের বাড়ী আসতে সাহস করলো কেমন ক'রে। আজ তন্দ্রার ফুলশয্যা না!

সময় অতি সংক্ষেপ। দরকারী কথা ক'টা তাড়াতাড়ি সেরে নিতে চায় তন্দ্রা। কণ্ঠে তার ফুটে উঠলো আর্তির স্বর, বললে,—স্বপনদা, ক্ষমা চাইবার মুখ নাই, তবু যদি পার ভুলে যেতে চেষ্টা করো আমার অসামান্য অপরাধের কথা। এ ছাড়া আমার উপায় ছিলো না, স্বপনদা ?

অসহ্য আবেগে কণ্ঠস্বর যেন রুদ্ধ হয়ে আসছে তন্দ্রার। থর থর ক'রে কাঁপছে। মূর্ছিত হয়ে পড়বে নাকি! ব্যস্ত হয়ে বলে উঠলো স্বপন,—বসে পড়—তাড়াতাড়ি ওই চেয়ারটার উপর বসে পড় তন্দ্রা, তুমি অসুস্থ।

বহু কষ্টে নিজেকে আবার সামলে নিলে তন্দ্রা, বললে,—থাক, বসবার আমার সময় নাই। যে জন্য আজ তোমার কাছে আমায় আসতে হলো—সেটুকু আমি তাড়াতাড়ি শেষ ক'রে নিই।

আঁচল থেকে কাগজের মোড়কটা খুলে বহুদিনের শুকনো সেই মালাগাছি স্বপনের সামনে তুলে ধরে বলে উঠলো তন্দ্রা,—এটা একদিন নিজের হাতে আমার গলায় পরিয়ে দিয়েছিলে। মনে পড়ে স্বপনদা!

অবাক হয়ে গেল স্বপন। সামান্য একগাছি শুকনো মালা। এইভাবে যে এতদিন কেউ জুগিয়ে রাখতে পারে, স্বপনের তা জানা ছিলো না। মনে পড়ে গেল সেদিনের সেই অমার্জনীয় হঠকারিতার কথা। কাজটা কিন্তু সত্যাই সেদিন ভাল করে নি স্বপন।

টেবিলের উপর ধীরে ধীরে মালাখানা নামিয়ে দিলে তন্দ্রা। বুকের একখানা পাঁজর যেন এই সঙ্গে খসে পড়লো। রুদ্ধ আবেগে বলে উঠলো তন্দ্রা, তোমার এ অযাচিত অমূল্য দান আমার পক্ষে গ্রহণ করা কোনমতেই সম্ভব হলো না স্বপনদা, তাই আজ এটা ফিরিয়ে দিতে হলো। এর জন্য আমায় ক্ষমা করো।

স্বপনের মনের মধ্যে কে যেন হঠাৎ তীব্র একটা কষাঘাত ক'রে গেল। কে কাকে ক্ষমা করবে, সে প্রশ্নের শেষ উত্তর কোথায়! ধীরে ধীরে বলে উঠলো স্বপন,—আগে ঠিক বুঝতে পারি নি তন্দ্রা, ভুল ক'রে সেদিন কতখানি অসম্মান তোমার আমি ক'রেছিলাম। পার যদি আমার মুখ চেয়ে ওটুকু সয়ে নিয়ো।

তন্দ্রা বললে,—সয়ে নিতে হবে কেন, ও যে আমি গায়ে মেখে নিয়েছি! একেবারে ধুয়ে মুছে ফেলা কোনদিন কি সম্ভব হবে! আচ্ছা স্বপনদা, 'বসুন্ধরা' পত্রিকায় কি যেন একটা কবিতা লিখেছিলে না, 'অতনুর অভিশাপ' —তাই না?

স্বপন বললে,—আজও সেকথা ভোল নি দেখছি।

পুনরায় বললে তন্দ্রা,—কিন্তু কেন লিখেছিলে, 'অতনুর অভিশাপ' তুমি কেন লিখেছিলে। সেই কপোতী আর বাজপাখীর কথা মনে হলে আজও আমার বুকখানা কেঁপে উঠে। কিন্তু আমাদেরই জীবনে তোমার সে 'অতনুর অভিশাপ' যে এতখানি নিষ্ঠুর ভাবে সার্থক হয়ে উঠবে, একথা কি কোনদিন ভাবতে পেরেছিলে!

স্বপন বুঝি মনে মনে একবার চমকে উঠলো। অতনুর অভিশাপ! অতনুর অভিশাপ! সত্যদ্রষ্টা হে আদিম ঋষি কবি, আজও তুমি বেঁচে আছ পৃথিবীর শেষতম কবিতায়। আজও তুমি জীবন্ত হয়ে জেগে আছ অধুনাতম মানুষের শাশ্বত জীবনকাব্যে। তোমায় নমস্কার।

ধ্যানমগ্ন কবি স্বপন রায় কি সমাধিস্থ হয়ে গেল। নির্বাক নিস্পন্দ শুধু চেয়ে আছে কার এ দু'টি অচপল আঁখির পানে দৃষ্টি মেলে। অভিশপ্তা কপোতী কি বাণবিদ্ধা হয়ে ফিরে এলো!

তন্দ্রা যেন কি ভাবছে। সচকিতে হঠাৎ বলে উঠলো,—এবার আমি যাই স্বপনদা, আর যে আমার একমুহূর্ত দাঁড়াবার সময় নেই!

তন্দ্রাচ্ছন্ন স্বপন রায় সজাগ হয়ে উঠলো। তন্দ্রা তাকে প্রণাম করছে। কি আশীর্বাদ করবে স্বপন!

যেতে হবে এবার তন্দ্রাকে, যেতেই হবে। স্বপন ধীরে ধীরে বলে উঠলো. সদর দোরটা খুলে দিয়ে আসবো?

তন্দ্রা বললে,—না, ও পথ আমার রুদ্ধ হয়ে গেছে। বকুলতলা দিয়ে আমি স্বচ্ছন্দে চলে যেতে পারবো। আমার জন্য তুমি ভেবো না স্বপনদা, এবার আমি যাই।

তন্দ্রার ভারাক্রান্ত চোখ দু'টো কি তার সঙ্গে চরম শত্রুতা না ক'রে ছাড়বে না এই বিদায় মুহূর্তে! মুখখানা নীচু ক'রে পুনরায় বলে উঠলো,—আমি চললাম—এবার আমি চললাম, স্বপনদা!

মন্ত্রমুগ্ধ স্বপন রায় রুদ্ধকণ্ঠে বললে,—এসো।

যেতে যেতে থমকে হঠাৎ ফিরে দাঁড়ালো তন্দ্রা, বললে,—এসো নয়, আজ আর এসো নয়, এবার বল যাও। আশীর্বাদ কর যেন সত্য সত্য যেতে পারি। শুধু তোমার এখান থেকেই নয়, তোমার মন থেকেও। আমার এ শেষ প্রার্থনা তুমি যেন বিফল ক'রে দিয়ো না, স্বপনদা! ভুলে যেয়ো—একেবারে ভুলে যেয়ো তন্দ্রার কথা।

সচকিতা হরিণীর মত ত্রস্তপদে স্বপনের সামনে থেকে সরে গেল তন্দ্রা। নীচে নেমে গেল। যাওয়ার পথে তার লুটিয়ে পড়লো বকুলের ঝরা পাতা। বাতাবি লেবুর শাখায় শাখায় বিষাদের কালো ছায়া কাঁপছে। শ্যামল মাঠের কোমল কচি দূর্বাদল কি এই চরণের রক্তরাগে আর কোন দিন রাঙবে না!

তন্দ্রা এসে নিশ্চিন্তে শুয়ে পড়লো ফুল-বিছানো পালঙ্কের এক পাশে। এতক্ষণে কিছুটা যেন নিশ্চিন্ত হয়েছে তন্দ্রা। আর তার কোন দুশ্চিন্তার কারণ রইলো না। কবিতীর্থে স্নান সেরে প্রাক্তনের সে প্রেত-তর্পণ ক'রে এলো যে।

একগাছি মালা। মালা নয় বিষধর ফণী। কুণ্ডলী পাকিয়ে পড়ে আছে স্বপন রায়ের সামনে। অতনুর অভিশাপ, তাই ফুল হলো কাঁটা, মালা হলো বিষধর ফণী। কাঁটা হয়ে বিঁধে এলো তন্দ্রার বুকে। ফণী হয়ে স্বপনকে আজ দংশন করছে। এত বিষ, এতখানি গরল রাখবে কোথায় স্বপন। বাসুকীর বিষে নীলকণ্ঠের কণ্ঠ শুধু নীল হয়েছিলো, আজ এই শুকনো একগাছি মালার বিষে স্বপনের যে সর্বাঙ্গ নীল হয়ে গেল। অভিশপ্ত একগাছি মালা, কি কুক্ষণেই না তন্দ্রার গলায় দুলিয়ে দিয়েছিলো স্বপন। দুলে উঠেছিলো তার কুমারী মন, দুলে উঠেছিলো দুরু দুরু একখানি পেলব বক্ষ। মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলো স্বপন, নির্লজ্জের মত নিষ্পলক নেত্রে শুধু চেয়ে ছিলো। মন তার অকস্মাৎ লুটিয়ে পড়েছিলো নিটোল একখানি তনু-দেহের তটপ্রান্তে। সে যে ঝাঁপ দিতে চেয়েছিলো তার দু'কূল-ছাপা যৌবন যমুনায়। সেদিন বুঝি অনঙ্গদেব অন্তরীক্ষে হেসেছিলেন। তাঁর তূণ থেকে যে শায়কটি এসে অকস্মাৎ বিদ্ধ ক'রে গেল স্বপনকে, সে যে একদিন অগ্নিশায়ক হ'য়ে এইভাবে তাকে বারে বারে কষাঘাত হেনে যাবে, এ কথা সে কোনদিন ভাবতে পারে নি। যৌবনের বেদীমূলে প্রেমদেবতার জাগরণী উৎসবে নিজের হাতে যে রঙমশাল সে জ্বেলেছিলো একদিন, তাই দিয়ে যে শুরু হলো জীবনের জতুগৃহ-দাহ। কিন্তু এর লেলিহান শিখা দৈবাৎ যদি পাশের বাড়ীতে আগুন ধরিয়ে দেয়! পুড়বে, একসঙ্গে হয়ত দু'জনেই পুড়বে। সে ত হয় না, কিছুতেই হয় না। স্বপন যদি জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যায়, কোন ক্ষতি নাই, দুনিয়ার তাতে কিছু এসে যায় না। কিন্তু এ আগুনের আঁচ থেকে তন্দ্রাকে যে বাঁচাতেই হবে। এখান থেকে দূরে কোথাও সরে যেতে হবে স্বপনকে। যেখানেই হোক, তন্দ্রার দৃষ্টির একেবারে বাইরে। ব্যর্থ প্রেমের এ আকাশচুম্বী মিনারের চূড়ায় ঠেকে তন্দ্রার দৃষ্টি যেন তার উন্মুক্ত দিগন্তের পথে কিছুমাত্র বাধার সৃষ্টি করতে না পারে, সে দুশ্চিন্তা যে স্বপনের।

মনের এ আগুন কিন্তু নেভাতে হবে স্বপনকে। স্মৃতির এ দাহ থেকে মুক্তি পেতে হবে তাকে। কিন্তু স্বপন যে একেবারে নিঃস্ব হয়ে গেল। কোথায় তার সান্ত্বনা, কি নিয়ে আর বাঁচবে স্বপন! তবু তাকে বাঁচতে হবে,

খুঁজে নিতে হবে নতুনতর সান্ত্বনা, খুঁজে নিতে হবে তার মনের আশ্রয়। একেবারে নিঃসম্বল ত নয় স্বপন। আছে তার বিদ্যা, তার সৃজনধর্মী প্রতিভা, আছে তার মহত্তর আদর্শের কল্পনা। আছে তার দেশ, তার সমাজ, তার বহুমুখী সংস্কৃতির বৃহত্তর ক্ষেত্র। পারবে না কি স্বপন তারই মধ্যে একটা কিছু খুঁজে নিয়ে নিঃশেষে নিজেকে তার মধ্যে ডুবিয়ে দিতে। এখান থেকে বিদায় নেবার আগে সেই সঙ্কল্পই যে মনে প্রাণে গ্রহণ করতে হবে স্বপনকে। বাধা কোথায়, কোথায় তার বন্ধন। রায়-বাড়ীর এ ভিটের মায়া কাটাতেই হবে স্বপনকে। আপাতত এ ছাড়া যে অন্য কোন পথ নাই। সমস্যা একটা নিকুঞ্জদা, স্বপনের একমাত্র বন্ধন। ভবেশবাবু সস্ত্রীক তীর্থে চলে যাচ্ছেন। নিকুঞ্জ সঙ্গী হতে চায়। সেই ভাল, সেই তার পক্ষে সব চেয়ে ভাল। স্বপনের আর দুশ্চিন্তার কোন কারণ রইলো না। একেবারে সে ভারমুক্ত।

থেকে থেকে তবু মনের মধ্যে কোথায় যেন একটা টান পড়ছে। গুমরে উঠছে যেন বুকের ভিতরটা। করুণ সুরে কোথায় যেন শাঁখ বাজছে না! এ কি স্বপনের বিদায়শঙ্খ! শাঁখ বাজছে শান্তিপুরে। ললাটে যে তার চন্দন-তিলক, স্বপনের যে পাকা দেখা। তন্দ্রা যে তার বধূ হতে চলেছে। চুরি হয়ে গেল, মাঝখান থেকে রাধারাণী চুরি হয়ে গেল। মদনমোহন, তোমার রাধারাণী চুরি হয়ে গেল যে। চুরি হয়ে গেল মূর্তিমতী একখানি জীবন্ত বিগ্রহ। ফেলে রেখে গেছে শুধু একগাছি মালা, শুকনো একগাছি মালা।

উদ্‌ভ্রান্ত একটা দৃষ্টি মেলে টেবিলের দিকে একবার তাকালো স্বপন। পড়ে আছে মালাখানা কুণ্ডলি পাকিয়ে। উদ্বেল হয়ে উঠলো কবি স্বপন রায়। বুকের পাঁজরগুলো ভেঙ্গে চুরে যেন গুঁড়ো হয়ে যেতে চায়। মুখ তুলে একবার চাইলে স্বপন সামনের দিকটায়। দেওয়ালে আঁটা বিশ্বকবির একখানি চিত্রপট। কবিগুরু দাঁড়িয়ে আছেন প্রশান্ত দৃষ্টি মেলে। স্বপনকে লক্ষ্য ক'রে কি যেন তিনি বলে উঠলেন না! চিত্রের মুখে যেন বাণী ফুটে উঠলো :

"ফুরায় যা দে রে ফুরাতে।
ছিন্ন মালার ভ্রষ্ট কুসুম ফিরে যাসনেকো কুড়াতে।"

সজাগ হয়ে উঠলো স্বপন। সঙ্গে সঙ্গে মাথাখানা তার নুয়ে পড়লো চিত্রপটের সামনে, আকুল কণ্ঠে প্রার্থনা জানালে,—তুমি আমায় আশীর্বাদ কর —আশীর্বাদ কর কবিগুরু, ছিন্নমালার ভ্রষ্ট কুসুম সুদূর পিছনে ফেলে রেখে সুমুখ পানে যেন এগিয়ে যেতে পারি। ফিরে তাকাবার লোভ কোনদিন যেন মনের মধ্যে এসে উঁকি না দেয়।

ষোল

বৎসরাধিক কাল পরের কথা। মেঘ-মেদুর এক অপস্রিয়মান অপরাহ্ণ। আনমনে বাতায়নে চেয়ে আছে তন্দ্রা। দিনান্তের শেষ দীপ্তিটুকু দিকে দিকে ম্লান হয়ে এলো। কম্পিত তরুশাখে কার বুঝি ছোঁয়া লেগেছে, স্পন্দিত কিশলয়ে কার যেন চরণের ধ্বনি। মনে মনে উদ্বেল হয়ে ওঠে তন্দ্রা। দূরের পানে দৃষ্টি মেলে অবাক হয়ে চেয়ে থাকে দক্ষিণের খোলা জানালায়। কালো মেঘে আকাশ যেন ছেয়ে আসছে, বুকে তার বিজলীর খেলা। থেকে থেকে রুদ্ধ আবেগে যেন কেঁপে কেঁপে উঠছে জলদাঙ্গ-বিহারিণী বিদ্যুৎ-বধূ। মিলনের দুঃসহ আনন্দে, হয়ত বা বিচ্ছেদের ভীরু আশঙ্কায়। হে শ্যামল স্নিগ্ধকান্তি নব জলধর, আষাঢ়ের এই ম্লান সন্ধ্যায় কোন্ বিরহীর আঁখিজল তুমি আকাশে বাতাসে ছড়িয়ে দিলে। ব্যাথা যে তার দিকে দিকে চুয়ে চুয়ে পড়ছে।

বিরহিণী যক্ষপ্রিয়া জাগো, মলিন-ধূলি-শয্যা ত্যাগ ক'রে ক্ষণেকের জন্য দাঁড়াও এসে উন্মুক্ত এই বাতায়নের পাশে। অপাঙ্গ হ'তে অপসৃত ক'রে দাও তোমার বিস্রস্ত চূর্ণ কুন্তল। দু'চোখ ভরে চেয়ে দেখ তোমারই সে দয়িতের দূত তারই বুঝি বার্তা নিয়ে চেয়ে আছে—সে কি তোমার পানে। তুমি তাকে পাদ্য-অর্ঘ্যে বরণ ক'রে নাও। জিজ্ঞাসা কর প্রবাসী তোমার প্রাণকান্তের কুশল কথা,—হে বন্ধু, সে ত ভাল আছে।

তন্দ্রার আনমনা মনখানি দেখতে দেখতে কোথায় যেন উধাও হয়ে গেল। ভুলে গেল তার গৃহসংসার। ভুলে গেল তার ঘরকন্নার কথা।

নির্নিমেষে আকাশের পানে চেয়ে চেয়ে কতক্ষণ যে এইভাবেই কেটে গেছে, তন্দ্রা এতক্ষণ টের পায় নি। পরিচারিকা পঞ্চীর মা একটা ডাক দিয়ে গেল,—সন্ধ্যে যে বয়ে গেল মা, ঠাকুর ঘরে পিদিম দেবে না!

তন্দ্রা গিয়ে তাড়াতাড়ি চুলগুলো কোন রকমে আঁচড়ে নিলে নিজের হাতেই। কলতলায় গা ধুয়ে এসে সন্ধ্যা প্রদীপ হাতে নিয়ে পূজার ঘরে ঢুকলো। আজ যে তার সাপ্তাহিক লক্ষ্মীপূজাব দিন—সে কথা তন্দ্রা ভুলেই গিয়েছিলো। গলবস্ত্র হয়ে বেদীর সামনে মাথা নোয়ালে তন্দ্রা। লক্ষ্মীর পাঁচালীখানা খুলে সুর ক'রে পাঠ আরম্ভ করলে।

জানালা বেয়ে আর এক ঝলক জলো হাওয়ার স্পর্শ তন্দ্রাকে যেন দুলিয়ে দিয়ে গেল। পুঁথির পাতায় চাপা পড়ে গেল বিনন্দ রাখালের পালা। পাঁচালীর বাকি অংশটুকু শেষ করতেও বুঝি ভুলে গেল তন্দ্রা। পাশের দেওয়াল আলমারি থেকে আর একখানি গ্রন্থ কোলের উপর টেনে নিয়ে কখন যে সে পাতা খুলে বসেছে, নিজেই হয়ত টের পায় নি। কালিদাসের অমরকাব্য মেঘদূত। কাব্য নয়, চিরবিরহীর বুকের কান্না। তন্দ্রার এক জন্মদিনের উপহার এই গ্রন্থখানি।

সন্ধ্যা কখন উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। মেঘদূত পুঁথিখানা চোখের সামনে খোলা আছে তন্দ্রার। শ্লোকে অনবদ্য পথের ছবিগুলি একে একে ভেসে উঠতে লাগলো তন্দ্রার মনের মধ্যে। তন্দ্রা বুঝি হারিয়ে ফেললে নিজেকে। রামগিরি যে অধীর প্রতীক্ষায় উন্মুখ হয়ে চেয়ে আছে অলকার পানে।

সন্ধ্যার অন্ধকার বিদীর্ণ ক'রে মোটরের হর্ণ বেজে উঠলো। সঙ্গে সঙ্গে গাড়ীখানা গিয়ে ঢুকে পড়লো গ্যারেজে। রাত্রের মত বন্ধ হয়ে গেল কোলাপসিব্‌ল্ গেট। পঞ্চীর মা আর একটিবার বাইরে থেকেই ডাক দিয়ে গেল তন্দ্রাকে, তন্দ্রার কোন সাড়া শব্দ নাই।

কতক্ষণ পরে, কে জানে সে কতক্ষণ, তন্দ্রার পিছন দিক থেকে সাড়া জেগে উঠলো,—তোমার পাঁচালি পাঠ এখনো শেষ হয় নি তন্দ্রা, অনেকখানি রাত হয়ে গেল যে!

তন্দ্রা হঠাৎ চমকে উঠলো। পুনরায় সাড়া এলো পিছন দিক থেকে,—ও মাই গড, কোথায় পাঁচালি,—এ যে একেবারে মহাকবির কাব্য! কবিবরকে ভুলতে পারো নি দেখছি।

অফিস ফেরত প্রমথেশ নিঃশব্দে এসে দাঁড়িয়ে আছে তন্দ্রার পিছনে।

তন্দ্রা মুখে একটু হাসি টেনে বললে,—এই যে তুমি এসে পড়েছো, আমায় এতক্ষণ ডাক নি কেন!

ভ্রূ দু'টো কুঞ্চিত হয়ে উঠলো প্রমথেশের, বললে—কি জানি, অজ্ঞাতে যদি ধ্যানভঙ্গের প্রত্যবায়ভাগী হতে হয়। ঠাকুর ঘরে ঢুকে লোকে ঠাকুর ধ্যান ক'রে বলেই জানা ছিলো, মা-লক্ষ্মীর বেদীর সামনে বসে ঘটা ক'রে ধূপ-দীপ জেলে তুমি যে এই ভরা সন্ধ্যায় কোন্ এক লক্ষ্মীমন্তের স্বপ্ন দেখছো জেগে জেগে, এটা ঠিক ভাবতে পারি নি। কাব্যের জোয়ারে তোমার ওই লক্ষ্মী দেবীর পেঁচা পর্যন্ত যে ভেসে গেল তন্দ্রা, ব্যাপার কি বলত!

করুণ একটা অসহায় দৃষ্টি মেলে তন্দ্রা শুধু তাকালো একবার প্রমথেশের দিকে, বললে,—ও ঘরে তুমি বসবে চল, আমি চা করে নিয়ে আসি।

প্রমথেশ জবাব দিলে,—চায়ের কথা এখন থাক, সগু সগু রসভঙ্গের কারণ ঘটতে পারে। বিশেষ ক'রে আজকের এই মেঘমেদুর সন্ধ্যায়, মন যখন পাখীর মত পাখা মেলে আকাশের পানে উধাও হয়ে ছুটে যেতে চায়—এইমাত্র ছিটে ফোঁটা একটু বৃষ্টিও হয়ে গেল বুঝি—ও হরি, তাই বলো। খোলা জানালার পাশে বসে ফুরফুরে জলো হাওয়ায় অলকদাম এলিয়ে দিয়ে মেঘদূত পড়বার এমন দুর্লভ মুহূর্তটি জীবনে কিন্তু বারে বারে আসে না, কি বল তন্দ্রা! দেখি—দেখি বইখানা একবার দেখি।

প্রমথেশের এ ব্যঙ্গোক্তি তীরের মত গিয়ে বিঁধলো যেন তন্দ্রাকে। মুখ ফুটে তার বলবার কিছু নাই। তন্দ্রার হাত থেকে বইখানা টেনে নিয়ে প্রথম পাতাটা উল্টেই আবার বলে উঠলো প্রথমেশ,—বাঃ—বেশ চমৎকার, সত্যই একখানা অপূর্ব কাব্য। শুধু কাব্যই বা বলা যায় কেন, একে এক মহাকাব্যই বলা উচিত; অন্তত তোমার দিক থেকে। অপূর্ব এর রস, অনবদ্য আবেদন, বিচিত্র এর বিষয়বস্তু; কি বল তন্দ্রা। কিন্তু তার চেয়েও অপূর্ব, তার চেয়েও

অনবদ্য বইয়ের প্রথম পাতায় লেখা ছোট্ট এই লাইন দু'টি—'তন্দ্রার জন্মদিনে। শ্রীস্বপনকুমার রায়।' নামটা কিন্তু সত্যই খুব কাব্যিক। ভদ্র লোকের খোঁজ খবর কিছু পেলে তন্দ্রা!

তন্দ্রা একটু বিস্ময়ের স্বরে বললে,—কার কথা বলছো!

—ওই যে তোমার মহাকবি গো, কবি স্বপনকুমার রায়; এই অপূর্ব কাব্যখানি যিনি তোমায় উপহার দিয়েছেন।

বিদ্রূপের স্বরে বলে উঠলো প্রমথেশ। আবার ও বললে,—স্বপনকুমারই বটে। ভদ্রকন্যা এক কুমারীর চোখে একদিন তিনি স্বপ্ন হয়ে দেখা দিয়েছিলেন। কিন্তু আজ দেখছি সেইখানেই তার শেষ নয়। পরকীয়া কুলবধূর হৃদয়কুঞ্জে আজও তিনি স্বপ্ন হয়েই মাঝে মাঝে এসে উঁকি দিয়ে যান। তোমার এই নিষ্ঠুর স্বপনবিহার কদ্দিন আর চলবে, বলতে পার তন্দ্রা!

প্রমথেশের কণ্ঠস্বর ভারি হয়ে উঠলো। তন্দ্রা একটু অনুযোগের স্বরে বললে,—তুমি আমায় এমন ক'রে খোঁটা দিয়ো না। কে কোথায় আমার জন্মদিনে কবে একখানা মেঘদূত উপহার দিয়ে গেছে, সে কথা আজও ভুলতে পারলে না!

—ভুলতেই আমি চেয়েছিলাম তন্দ্রা, তোমার অতীত জীবনের সব কিছুই আমি ভুলতে চেয়েছিলাম। কিন্তু এখন দেখছি তোমার সেটা ইচ্ছে নয়। তাই স্বপনকুমারের স্বপ্ন নিয়েই আজও তুমি –

বাধা দিয়ে বললে তন্দ্রা,—কি তুমি পাগলের মত বকছো, কি করেছে তোমার স্বপনকুমার। দাও—আমার বইখানা ফিরিয়ে দাও।

তন্দ্রা প্রায় জোর করেই প্রমথেশের হাত থেকে বইখানা টেনে নিয়ে বললে,—পাগলামি করো না, চা খাবে চল।

প্রমথেশের হাত ধরে বাইরে এসে দাঁড়ালো তন্দ্রা। পাশের ঘরে চায়ের টেবিলে বসিয়ে দিয়ে বললে,—আমি চা জলখাবার নিয়ে আসি, বসো তুমি।

থমথমে কালো মেঘে আকাশখানা ছেয়ে আছে, আবার হয়ত বৃষ্টি নামবে। তাড়াতাড়ি রান্নাঘরে গিয়ে নিজের হাতে কয়েকখানা ফিশ চপ

ভেজে নিলে তন্দ্রা। কেটলি ক'রে চায়ের জল চাপিয়ে জলখাবারের থালা নিয়ে রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এলো। চায়ের টেবিলে গিয়ে দেখে প্রমথেশ নাই। কোথাও বেরিয়ে গেলো নাকি!

বাইরের ঘরে আলো জ্বলছে। জলখাবারের থালাখানা হাতে নিয়েই এগিয়ে গেল তন্দ্রা। মাঝখানের পর্দাটা ঠেলে ঘরে ঢুকতেই চোখে পড়লো টেবিলের উপর কনুইয়ে ভর দিয়ে চুপচাপ বসে আছে প্রমথেশ। সামনে তার ছিপি খোলা হুইস্কির বোতল। হালকা একটা মদির গন্ধ সারা ঘরে ছড়িয়ে পড়েছে। কয়েক পেগ বুঝি এর মধ্যেই সারা হয়ে গেল।

একটা টিপয়ের উপর জলখাবারের থালাটা নামিয়ে প্রমথেশের পাশে গিয়ে দাঁড়ালো তন্দ্রা। বললে,—কি হচ্ছে এগুলো, আজ আবার শুরু করলে যে! তোমার এই বিদ্‌ঘুটে অভ্যাসটা কিছুতেই কি ছাড়বে না।

এক পেগ হুইস্কি ঢালতে ঢালতে জবাব দিলে প্রমথেশ,—সব কিছুই আমি ছাড়তে চেয়েছিলাম তন্দ্রা, শুধু তোমাকে বাদ দিয়ে। আসাম থেকে বিয়ের নিয়ে পালছেঁড়া নৌকোর মত প্রথম যেদিন তোমার ঘাটে এসে কাছি বাঁধলাম, সেদিন কিন্তু সত্যই আমার ধারণা হয়েছিলো যে স্বজন-বান্ধবহীন ছন্নছাড়া এই যাযাবর জীবনটারও বুঝি বিশেষ একটা মূল্য আছে। ভেবেছিলাম ভাগ্যগুণে তোমায় যখন পেলাম—

তন্দ্রা ঈষৎ ব্যঙ্গের সুরে বলে উঠলো,—ভেবেছিলে মানে, এখন আর সেকথা ভাবছো না বুঝি! নাও—এখন বন্ধ কর তোমার ওই ছাইভস্ম, জলখাবারটা খেয়ে নাও।

খাদ্যটা নিতান্তই গৌণ। পানীয়ের আকর্ষণটাই আজ মুখ্য হয়ে উঠেছে প্রমথেশের কাছে। ঢাললে আর এক পেগ। তন্দ্রা তাড়াতাড়ি তার হাত থেকে পানপাত্রটা কেড়ে নিয়ে বললে,—এইভাবে আমার চোখের সামনে দেব না তোমায় নেশা করতে। তুমি কি ভেবেছ বল ত!

এই বলে হুইস্কি সুদ্ধ গেলাসটা জোরে বাইরের দিকে ছুঁড়ে মারলে তন্দ্রা। দেওয়ালের গায়ে লেগে ঝন্ ঝন্ শব্দে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে গেল কাচের গেলাসখানা।

প্রমথেশ চোখ দু'টো বিস্ফারিত ক'রে হতাশ ভাবে বলে উঠলো,—দিলে ত—দিলে ত আমার এমন সুন্দর শৌখিন গেলাসখানা ভেঙে। কিন্তু ওটা যে আমার আসামের স্মৃতিচিহ্ন, কাজটা কি বেশ ভাল হলো তন্দ্রা!

তন্দ্রা ঈষৎ ঝঙ্কার দিয়ে বললে,—সে কৈফিয়ৎ আমার না দিলেও চলবে। এখন জলখাবারগুলো খেয়ে নাও দেখি, ফিরে এসে যেন দেখতে পাই খাবারগুলো শেষ ক'রে ফেলেছ। আমি চা নিয়ে আসছি!

এই বলে পর্দা ঠেলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল তন্দ্রা। প্রমথেশ অবাক হয়ে চেয়ে আছে তার গমনপথের দিকে দৃষ্টি মেলে। বিধাতার বিচিত্র সৃষ্টি এই রহস্যময়ী নারী। কত বিচিত্ররূপেই না এরা এসে দেখা দেয় পুরুষের জীবনে। এদের অমৃতের আস্বাদ যারা পেয়েছে অতিশয় তারা ভাগ্যবান, সন্দেহ নাই। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সে দুর্লভ বস্তুটির সন্ধান যারা পায় নি,—পেয়েছে শুধু বঞ্চনা আর আঘাত, শুধু অবিশ্বাস আর অপমান, জীবন যে তাদের কতখানি দুঁর্বহ—প্রমথেশ সেটা বোঝে। মাঝে মাঝে বিষিয়ে ওঠে মনের মধ্যেটা। মনে হয় এই আকাশচুম্বী মিথ্যের প্রাসাদ এক মুহূর্তে ভেঙ্গে চুরে গুঁড়ো ক'রে দিয়ে—

হুইস্কির বোতলটা হঠাৎ ঠোঁটের কাছে তুলে ধরলে প্রমথেশ। এক নিঃশ্বাসে সমস্তটা শুষে নেবে নাকি। কিন্তু না—বড় উগ্র, এতটা হয়ত সইবে না তার ধাতে। কুঁজোর মুখে ঢাকা দেওয়া একটা কাচের গেলাস টেনে নিয়ে আর এক পেগ তৈরি ক'রে নিলে প্রমথেশ খানিকটা সোডা মিশিয়ে।

পর্দা ঠেলে তন্দ্রা এসে ঘরে ঢুকলো। টামলারের মুখে চুমুক দিচ্ছে প্রমথেশ, বাঁ-হাতে একটা অর্দ্ধভুক্ত ফিশ চপ। চায়ের ট্রে-টা টেবিলের এক পাশে নামিয়ে রেখে অনুযোগ ক'রে বলে উঠলো তন্দ্রা,—একি, আবার তুমি শুরু করেছ। বোতলের প্রায় অর্দ্ধেকটা যে খালি, মাথায় এবার জল ঢালতে হবে ত!

প্রমথেশ বুঝি এর মধ্যেই একটু বে-এক্তিয়ার হ'য়ে পড়লো। একটু সুর টেনে বললে,—কিছু দরকার হবে না, অভ্যাসটা এমন কিছু নতুন নয়। তা ছাড়া এই তরঙ্গিণী ম-কার সাধনায় যে মহাগুরুর কাছ থেকে আমরা

দীক্ষা পেয়েছি, তাঁকে তো তুমি চেন। মানে তোমার বাবার কথা বলছি। ড্রিঙ্কের এ-বি-সি-ডি আমরা তাঁর কাছ থেকেই শিখেছি কিনা।

তন্দ্রার মুখখানা কালো হ'য়ে উঠলো। বলে চললো প্রমথেশ,—তিনি অবশ্য নিজে খুব গুণী লোক, এ বিষয়ে একেবারে ডক্টরেট, পাওয়া এম-এ, পি-আর-এস, পি-এইচ-ডি। আমার মত এক অর্বাচীন নাবালককে দয়া ক'রে যে তিনি হাতেখড়ি দিয়েছিলেন, এই আমার পরম ভাগ্য।

তন্দ্রা একটু বিরক্তির স্বরে বললে,—নেশার ঘোরে এবার আবোল তাবোল শুরু হলো ত।

প্রমথেশ বলে চললো,—আসামে যখন একসঙ্গে ছিলাম, কি আনন্দেই না দিনগুলো কেটেছে। আমরা দু'টিতে ছিলাম যেন হরিহর আত্মা, এক গেলাসের ইয়ার কিনা। তখন কি আর জানতাম যে হঠাৎ তিনি তাঁর এই মাইডিয়ার ব্রাদারটিকে সুদূর আসাম মুলুক থেকে টেনে এনে রাতারাতি শ্বশুরমশায় হয়ে বসবেন। আরে ছি ছি ছি ছি—আগে সে কথা জানলে কি আর—ওকি, তুমি লজ্জা পাচ্ছো নাকি।

তন্দ্রার মুখচোখ লাল হয়ে উঠলো। গম্ভীরভাবে বললে,—তুমি মাতাল হয়েছ, চুপচাপ এখন শুয়ে পড়; তোমার কোন কথা আর আমি শুনতে চাই না।

নেশার ঝোঁকে বলে উঠলো প্রমথেশ,—আহা একটু শোনই না, সে এক ইনটারেষ্টিং স্টোরি। আসামের মৌলং কলিয়ারিতে আমি ছিলাম ম্যানেজার, আর তোমার বাবা ছিলেন ক্যাশিয়ার, সে ত তোমরা জান। ক্যাশিয়ার বাবুর বৈঠকখানায় গান বাজনার আড্ডা বসতো রোজ সন্ধ্যাবেলা। বেশ কয়েকজন সাকরেদ তিনি জুটিয়ে নিয়েছিলেন। আমার একদিন কি খেয়াল চাপলো, হঠাৎ গিয়ে ভিড়ে গেলাম সেই গানের আড্ডায়। কৃতার্থ হয়ে গেলেন ক্যাশিয়ারবাবু, আমার মত একজন যোগ্য শিষ্য পেয়ে। কি মারাত্মক চেষ্টাই না করেছিলেন তিনি এই অভাজনকে একটুখানি গান শেখাতে।

তন্দ্রা বললে,—থাক্ ও সব কথা, এবার একটু মুখ বন্ধ কর দেখি।

গল্পটা যে এখনো শেষ হয় নি, মুখ বন্ধ করে কেমন ক'রে প্রমথেশ। পুনরায় বলে চললো,—গান কিন্তু আমার গলায় ধরা দিতে চাইলো না কিছুতেই। যেন ভাদ্র-বৌ—ছোঁয়া গেলে বুঝি গঙ্গা নাইতে হবে। তাই সামনা সামনি দেখা হলেই ছুৎ বাঁচিয়ে সরে পড়েন ঘোমটা দিয়ে। শেষ পর্যন্ত হলো না কিছু। আমার সে বিদ্যেবুদ্ধির পরিচয় তো বাসর ঘরে পেয়েছ, বিয়ের দিন রাত্রেই। কি যেন একটা গেয়েছিলাম সেদিন, সখী জাগো—সখী জাগো—এইটাই না? গাইবো একবার, শুনবে!

প্রমথেশের চোখ দু'টো ঢুল ঢুল করছে। তন্দ্রা জানে এ অবস্থায় জোর জুলুমে কোন কাজ হবে না। তাই একটু নরম সুরে বললে,—ঘরে গিয়ে শোবে চল, আজ আর কোন কথা নয়। কাল তোমার যত খুশি গান শুনিও।

প্রমথেশ ঘোর আপত্তি জানিয়ে বললে,—আরে তাও কখনো হয়, সুর এসে গেছে যে, ভাদ্র-বৌ বুঝি ঘোমটা খুললেন। শোন—শোন—

নিজের মনেই এলোমেলো সুরে গেয়ে উঠলো প্রমথেশ—

'মম যৌবন নিকুঞ্জে গাহে পাখী
সখী জাগো—সখী জাগো'—

তন্দ্রা সেইখানেই একটা সোফার উপর জোর ক'রে শুইয়ে দিলে প্রমথেশকে। চোখে মুখে জলের ঝাপটা দিয়ে মুছিয়ে দিলে মুখখানা। পাখার স্পীড খানিকটা বাড়িয়ে দিলে। প্রমথেশ বকেই চললো,—কি দরদ দিয়েই না গানখানা আমায় শিখিয়েছিলেন ওস্তাদজী, সখী জাগো—সখী জাগো। কোন্ এক রূপবতীর যৌবন নিকুঞ্জে হঠাৎ এক পাখী এসে হাজির। বুকে তার ছড়িয়ে দিলে সুরের আগুন—সখী জাগো—সখী জাগো! পাখী যে তাকে জাগাতেই এসেছে। সখী হঠাৎ জেগে উঠলো, রূপকথার রাজকন্যার মত।

প্রমথেশ অবাক হয়ে চাইলে একটিবার তন্দ্রার মুখের দিকে। ক্ষিপ্রকণ্ঠে বলে উঠলো,—কিন্তু কই, আমার সখী ত কই জাগলো না, নিঃসাড়ে সে ঘুমিয়েই রইলো। পাঠালাম আমার মনচিড়িয়াকে। তার রুদ্ধ-দ্বারে আঘাত

করতে করতে ঠোঁঠ দু'টো তার ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেল। সে কিন্তু কিছুতেই জাগলো না।

তীব্র একটা দৃষ্টি হেনে ধড়মড়িয়ে উঠে বসলো প্রমথেশ,—কিন্তু কেন জাগলো না, এত ক'রেও কেন আমি তাকে জাগাতে পারলাম না, বলতে পার তন্দ্রা।

তন্দ্রা তাড়াতাড়ি বসে পড়লো প্রমথেশের পাশে। তার হাতের উপর একখানি হাত রেখে বললে,—কে বললে সখী তোমার জাগে নি, সে যে সব সময়ই জেগে আছে। তুমি এমন ভুল করছো কেন বল ত।

প্রমথেশ বলে উঠলো,—ভুল আমি করি নি তন্দ্রা, ভুল করছো তুমি। নিজেকে আমি নিঃশেষে উজাড় ক'রে ঢেলে দিতে চেয়েছিলাম তোমার পায়ে, কিন্তু তুমি তা গ্রহণ করলে না। হয়ত তা সম্ভবও ছিলো না তোমার পক্ষে। কিন্তু সে কথা আমি জানতাম না, আদৌ আমি চিনতাম না স্বপন রায়কে।

তন্দ্রা যেন ঘেমে উঠলো। পুনরায় বলে উঠলো প্রমথেশ,—সে যে তোমার আমার মাঝখানে এতখানি ব্যবধান সৃষ্টি ক'রে রেখেছে, সে কথা আমার ঘুণাক্ষরে জানা থাকলেও এইভাবে তোমায় সাতপাকের নাগপাশে জড়িয়ে বন্দী করবার চেষ্টা আমি কিছুতেই করতাম না।

বাণবিদ্ধা হরিণীর মত চঞ্চল হয়ে উঠলো তন্দ্রা। আহত কণ্ঠে বললে,—কেন এভাবে মাঝে মাঝে তুমি কঠোর হয়ে ওঠো বল ত। সব কথাই ত তোমার কাছে আমি খুলে বলেছি,—তবু আমায় বিশ্বাস করতে পারলে না।

—সে কি, তোমাকে সে ভালবাসতো যে, তুমি তাকে ভালবাস না!

—না, আমার পক্ষে তা সম্ভব নয়, কিছুতেই সম্ভব নয়। আমি একজনের পরিণীতা বধূ, সে কথা আমি ভুলবো কেমন ক'রে।

প্রমথেশ বললে,—খুব একটা দামী কথা বলে ফেলেছো তন্দ্রা। কিন্তু মুস্কিল হয় কি জানো,—মাঝে মাঝে তুমি কেমন যেন আনমনা হয়ে ওঠো, হঠাৎ যেন কোন্ স্বপ্নরাজ্যে উধাও হয়ে যাও, সেখান থেকে তোমায় যেন আর ধরা-ছোঁয়াই যায় না। তুমি হয়ত নিজেও সে কথা জানো না, কিন্তু তোমার অবচেতন মন যে সেখানে অতিমাত্রায় সজাগ, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

প্রমথেশের কণ্ঠস্বর গাঢ় হ'য়ে উঠলো,—তাই ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে আমার অপমানিত পৌরুষ, বুকের ভেতরটা গুমরে ওঠে। মাঝে মাঝে ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন দেখি, চমকে উঠি দুঃস্বপ্ন দেখে। কি স্বপ্ন দেখি জানো?

তন্দ্রার বাক্‌শক্তি বুঝি রুদ্ধ হয়ে গেছে। প্রমথেশ নিজের মনেই বলে চললো—স্বপ্ন দেখি শ্যেন-দৃষ্টি বুভুক্ষু এক প্রেতমূর্তি তার লেলিহান জিহ্বা বিস্তার করে তোমায় যেন শতমুখে লেহন করবার জন্য তোমার আশে পাশে ছায়ামূর্তির মত ঘুরে বেড়াচ্ছে। কতবার আমি চেষ্টা করেছি দু'হাত দিয়ে গলাটা তার চেপে ধরে তার প্রেতজীবনের একেবারেই অবসান ক'রে দিই। কিন্তু পারি নি, ছায়ামূর্তি ঠিক ছায়াবাজির মতই মিলিয়ে গেছে আমার চোখের সামনে। ও কি, তুমি ভয় পাচ্ছো নাকি।

তন্দ্রা প্রশান্ত একটা দৃষ্টি মেলে চাইলে একবার প্রমথেশের দিকে, বললে,—ভয় পাব কেন, তোমার কাছে আমার ভয় কিসের।

তোমার কাছে আমার ভয় কিসের! এতখানি ভরসা, এতখানি বুকের বল সে পায় কেমন ক'রে। এও যে একটা কম হেঁয়ালি নয়।

প্রমথেশ একটু গম্ভীর হয়ে বললে,—একটা কথা জিজ্ঞাসা করবো, ঠিক মত জবাব দেবে?

তন্দ্রা সায় দিয়ে বললে,—কি জানতে চাও বল।

তির্যগ একটা দৃষ্টি হেনে বললে প্রমথেশ,—পূজোর ঘরে পাঁচালী পাঠ বন্ধ ক'রে হঠাৎ আজ এই অসময়ে কাব্য নিয়ে এত মশগুল হ'য়ে উঠলে কেন বল ত। এর মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যাটা কি, খুলে একটু বলতে পার!

ধীরকণ্ঠে একটা হতাশার সুর টেনে বললে তন্দ্রা—কি বললে তুমি খুশী হও বল, আমি তাই বলবো।

আবার সেই হেঁয়ালি। পুনরায় বলে উঠলো প্রমথেশ,—তোমার ওই মেঘদূত কাব্যখানা, তোমার চোখে ধূলোপড়া দিয়ে কি সাংঘাতিক মূল্যই যে আদায় ক'রে নিচ্ছে তোমার কাছ থেকে, ভাবতেও দুঃখ হয়। কিন্তু আমার পক্ষে এতখানা সহ্য ক'রে চলা ত আর সম্ভব নয়, তন্দ্রা! এটা তোমার জেনে রাখা ভাল।

তন্দ্রা আবার তেমনি ভাবেই বলে উঠলো,—কি আমি করতে পারি বল, কি তুমি চাও আমার কাছ থেকে ?

প্রমথেশ জবাব দিলে,—আপাতত তোমার ওই মেঘদূত পুঁথিখানা, পারবে আমায় দিতে !

—শুধু এইটুকু, এর বেশি কিছু না ! কিন্তু সেজন্য তুমি এতখানি অধৈর্ব হয়ে উঠছো কেন বল ত। তুমি বুঝি ভাবছো ওটা আমি কিছুতেই হাতছাড়া করতে পারবো না। তোমার সে ভুল আমি ভেঙ্গে দিচ্ছি, একটুখানি অপেক্ষা কর।

সঙ্গে সঙ্গে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল তন্দ্রা। বাইরেটা অন্ধকার, বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে ঘন ঘন। আলমারির চাবি খুলে তাড়াতাড়ি বইখানা বের ক'রে নিয়ে এলো। প্রমথেশের হাতে ওটা গুঁজে দিয়ে বললে,—এই নাও—এই নাও তোমার মেঘদূত, তোমার দুঃস্বপ্ন, তোমার আবোল তাবোল ছাই ভস্ম কত যেন কি সব, এই নাও ধরো।

দৃঢ়-মুষ্টিতে বইখানা চেপে ধরলে প্রমথেশ, বললে,—হাঁ—ঠিক এইটাই আমি চেয়েছিলাম। কিন্তু এটা যে তোমার অতীতের স্মৃতিচিহ্ন। এর অপমৃত্যু ঘটলে মনে তুমি ব্যথা পাবে না !

তন্দ্রা উদাস একটা দৃষ্টি মেলে বললে,—অতীতের সব স্মৃতিচিহ্নই যে চিরদিন অক্ষয় হয়ে বেঁচে থাকবে মানুষের জীবনে, এমন কোন কথা আছে কি। তার জন্য ব্যথা পাওয়ার কি আছে বল।

প্রমথেশ বললে,—কিন্তু এইটাই যে তার শেষ স্মৃতিচিহ্ন, তাই না একদিন বলেছিলো, তন্দ্রা !

তন্দ্রা নির্লিপ্ত কণ্ঠে জবাব দিলে,—তা হবে।

প্রমথেশ যেন দপ ক'রে জ্বলে উঠলো একবার বললে,—সেইজন্যই ত এটা আমার দরকার। একে আমি মহাকালের বুকে একেবারে ঘুম পাড়িয়ে দিতে চাই. চিরদিনের জন্য। সইতে পারবে ত।

তন্দ্রা কোন জবাব দিলে না প্রমথেশ নিজেই আবার বলে উঠলো,—তা যদি না পার তা হলে বুঝবো তোমার ওই পতি পরমগুরু মার্কা বাছাই

কয়া কতকগুলো মিঠে বুলি, যা দিয়ে আমায় আজ পর্যন্ত গোলক ধাঁধায় ঘুরিয়ে মারছো, সে শুধু অন্তঃসারশূন্য তোতাপাখীর বুলিমাত্র সার। আজ থেকে তা ব্যর্থ আমার কাছে। তার এতটুকু মূল্য আর আমি দিতে চাই না, কিছুতেই দিতে চাই না।

এই বলে প্রথমেশ তন্দ্রার চোখের সামনে পুঁথিখানা টুকরো টুকরো ক'রে ছিঁড়ে ফেলতে লাগলো। তন্দ্রা নির্বিকার দাঁড়িয়ে আছে জীবন্ত একটা জ্বালাময়ী দৃষ্টির সামনে।

মেঝের উপর জমে উঠলো মেঘদূতের ছেঁড়া পাতার ফালি। প্রমথেশ তন্দ্রার দিকে চাইলে একটুখানি, বললে—আজ আমরা এর বহ্ন্যুৎসব করতে চাই তন্দ্রা, পারবে সে উৎসবে যোগ দিতে!

সিগারেট কেসের উপর দেশলাইটা পড়েছিল টেবিলের একপাশে। প্রমথেশ সেটা তুলে নিয়ে তন্দ্রার সামনে এগিয়ে দিয়ে বললে,—তা যদি পার—এগিয়ে এসো, নিজের হাতে জ্বালিয়ে দাও লেলিহান অগ্নিশিখা ছেঁড়া পুঁথির পাতায়, পুড়ে সব ছাই হয়ে যাক।

তন্দ্রা হতবাক। স্তব্ধ বিস্ময়ে একদৃষ্টে শুধু চেয়ে আছে প্রমথেশের মুখের দিকে। এ ত মাতালের প্রলাপোক্তি নয়, এ যে অগ্নিগর্ভ বজ্রের কঠোর আহ্বান। তন্দ্রা কি চির অপরাধিই থেকে যাবে প্রমথেশের কাছে! পদে পদে এই দ্বিধা দ্বন্দ্ব অবিশ্বাসের অভিশাপ থেকে কোন দিন কি মুক্তি নাই তন্দ্রার!

প্রমথেশ পুনরায় বললে,—পারবে না—পারবে না তন্দ্রা, আমার হয়ে এই শেষ কাজটুকু করতে? পারবে না তুমি নিজের হাতে শেষ ক'রে দিতে?

অতি সহজ কণ্ঠে জবাব দিলে তন্দ্রা,—কেন পারবো না, এ কাজ ত শুধু একলার নয়, তোমার কাজ—সে যে আমারই কাজ। বিয়ের রাত্রে নারায়ণ শীলা সাক্ষ্য ক'রে তোমার সব কিছু যে আমি স্বীকার ক'রে নিয়েছি।

নারায়ণ শীলা! আছে নাকি তার কোন মূল্য! বিবাহের মন্ত্র, বৈদিক অনুষ্ঠান, এসব কি তন্দ্রা মনে প্রাণে বিশ্বাস ক'রে নাকি!

কাজটা কিন্তু অতিশয় নিষ্ঠুর। প্রমথেশ মুখে যা-ই বলুক মনের মধ্যে তার কোথায় যেন একটু দ্বিধা এসে উঁকি দিচ্ছে। তন্দ্রার মনের উপর এতখানি চাপ দেওয়া কি উচিত হবে প্রমথেশের।

হাতখানা বাড়িয়ে দিলে তন্দ্রা প্রমথেশের দিকে। বললে,—দাও তোমার বহ্নিশলাকা, কাজটুকু আমি শেষ ক'রে ফেলি। আর দেরি নয়, এই মুহূর্তে।

তন্দ্রা কি সত্যই প্রস্তুত? প্রমথেশ যেন দমে গেল একটুখানি কি যেন ভাবছে। হঠাৎ কি মনে ক'রে দেশলাইটা চেপে ধরলে মুঠোর মধ্যে। তন্দ্রার সামনে থেকে হাতখানা একটু সরিয়ে নিলে।

দ্বিধাগ্রস্ত প্রমথেশের হাতখানা চেপে ধরলো তন্দ্রা। বললে,—তুমি দয়া কর, এতবড় একটা অগ্নি-পরীক্ষার সুযোগ থেকে আমায় বঞ্চিত করো না, নারীত্বের চরমতম অসম্মান থেকে তুমি আমায় বাঁচাও।

শিথিল হয়ে পড়লো প্রমথেশের দৃঢ় মুষ্টি। তন্দ্রা তার হাত থেকে দেশলাইটা নিয়ে জ্বাললো একটা দীপ-শলাকা। মেঘদূতের ছেঁড়া পাতায় সঙ্গে সঙ্গে আগুন ধরিয়ে দিলে নিজের হাতে। প্রমথেশ কি হঠাৎ একটু শিউরে উঠলো?

কাগজের টুকরোগুলো একটার পর একটা হু হু করে জ্বললো। পাশের একফালি ছেঁড়া পাতায় মুক্তার মত হস্তাক্ষরে লেখা—"তন্দ্রার জন্মদিনে। শ্রীস্বপনকুমার রায়।" ওটাতেও আগুন ধরে গেল। চাপাগলায় বলে উঠলো প্রমথেশ,—পুড়ে সব ছাই হয়ে গেল, তন্দ্রা!

তন্দ্রা মুখ তুলে চাইলে একটিবার প্রমথেশের দিকে। গভীর একটা আর্তির স্বরে বললে,—তুমি খুশী হয়েছ? এবার শুধু বল আর আমায় কোনদিন এমন ক'রে কাঁদাবে না।

ব্যাথাহত বিহ্বল কণ্ঠে ফুটে উঠলো বিশ্বের আকুতি। পুনরায় বলে উঠলো তন্দ্রা,—সামনে আমাদের হোমশিখা জ্বলছে। এই আগুনের দীপ্ত-শিখায় তুমি আমায় অগ্নিশুদ্ধ ক'রে নাও। নতুন ক'রে আমায় বেঁধে নাও দৃঢ়তর বিবাহের বন্ধনে। এমন ক'রে তোমার মন থেকে আমায় দূরে সরিয়ে রেখো না, তুমি আমায় বাঁচাও।

অত্যধিক উত্তেজনায় থর থর ক'রে কাঁপছে তন্দ্রা। দৃপ্তকণ্ঠে পুনরায় বলে উঠলো প্রমথেশ,—তা হলে যে আমার সর্বশ্রেষ্ঠ প্রার্থনা মন্ত্রাঞ্জলি আর একটিবার, তোমায় স্মরণ করতে হবে তন্দ্রা! 'ধ্রুবাস্থ পতিকূলে ইয়ম্'—সে যে তুমি। তোমারই কাছে আমি প্রার্থনা জানিয়েছিলাম—'যদেতৎ হৃদয়ং তব, তদস্তু হৃদয়ং মম'। অর্থ তুমি জান। আমি চেয়েছিলাম—'মম ব্রতে তে হৃদয়ং দধাতু। মম চিত্তমনুচিত্তং তে অস্তু'। চিন্তায় ও কর্মে আমরা অভিন্ন। আজ থেকে আমাদের আর পৃথক কোন সত্তা নাই। পারবে সে কথা মনে প্রাণে স্বীকার ক'রে নিতে!

তন্দ্রা নিরুত্তর। প্রমথেশের কণ্ঠে এবার ফুটে উঠলো মিনতির স্বর, বললে,—আজও আমি সেই আকুল প্রার্থনা নিয়ে তোমার পানে চেয়ে আছি, তন্দ্রা! শুধু এইটুকু, এর বেশি কিছু না—শুধু এইটুকু—'মম ব্রতে তে হৃদয়ং দধাতু'।

অন্তর মথিত অসহ্য আবেগে তন্দ্রা যেন ভেঙে পড়লো,—ওঁ স্বস্তি! ওঁ স্বস্তি!

তোমার সব কিছু আমি স্বীকার ক'রে নিলাম।

ছিন্নমূল কদলীর মত লুটিয়ে পড়লো প্রমথেশের পায়ে।

তন্দ্রা কি মূর্ছিত হয়ে পড়েছে! আজ বুঝি জীবনের নব জাগরণ। নতুন ক'রে ফুল দিয়ে আজ বাসর সাজাবে নাকি প্রমথেশ